তাফহীমুল কুরআন

PART- 15

সাইয়েদ
আবুল আ'লা
মওদূদী
রহ.

মুহাম্মাদ

৪৭

নামকরণ

সূরার ২ নম্বর আয়াতের অংশ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান নামটি উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়া এ সূরার আরো একটি বিখ্যাত নাম "কিতাল"। এ নামটি ২০নং আয়াতের وَذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ বাক্যটি থেকে গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সূরার বিষয়বস্তু সাক্ষ দেয় যে, সূরাটি হিজরতের পরে এমন এক সময় মদীনায় নাযিল হয়েছিল যখন যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল বটে কিন্তু কার্যত যুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত দলীল–প্রমাণ পরে ৮নং টীকায় পাওয়া যাবে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

যে সময় এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল সে সময়ের পরিস্থিতি ছিল এই যে, বিশেষ করে পবিত্র মক্কা নগরীতে এবং সাধারণভাবে গোটা আরব ভূমির সর্বত্র মুসলমানদেরকে জুলুম নির্যাতনের লক্ষস্থল বানানো হচ্ছিলো এবং তাদের জীবন অত্যন্ত দুর্বিসহ করে দেয়া হয়েছিলো। মুসলমানগণ সমস্ত অঞ্চল থেকে এসে মদীনার নিরাপদ আশ্রয়ে জড়ো হয়েছিল। কিন্তু কুরাইশ গোত্রের কাফেররা এখানেও তাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিতে প্রস্তুত ছিল না। মদীনার ক্ষুদ্র জনপদটি চারদিক থেকেই কাফেরদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়েছিল। তারা এটিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। এ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের জন্য মাত্র দু'টি পথই খোলা ছিল। হয় তারা দীনে হকের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজই শুধু নয় বরং তার আনুগত্য ও অনুসরণও পরিত্যাগ করে জাহেলিয়াতের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। নয়তো জীবন বাজি রেখে প্রাণপণে লড়াই করবে এবং চিরদিনের জন্য এ বিষয়ের ফায়সালা করে দেবে যে, আরবের মাটিতে ইসলাম থাকবে না জাহেলিয়াত থাকবে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে দৃঢ় সংকল্পের পথ দেখিয়েছেন যেটি ঈমানদারদের একমাত্র পথ। তিনি সূরা হজ্জে (আয়াত ৩৯) প্রথমে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন এবং পরে সূরা বাকারায় (আয়াত ১৯০) যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন; কিন্তু সে সময় সবাই জানতো যে, এ পরিস্থিতিতে যুদ্ধের অর্থ কি? মদীনায় ঈমানদারদের

একটা ক্ষুদ্র দল ছিল যার যুদ্ধ করার মত পুরা এক হাজার যোদ্ধা সংগ্রহ করার সামর্থও ছিল না। অথচ তাদেরকেই তরবারি নিয়ে সমগ্র আরবের জাহেলিয়াতের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। তাছাড়া যে জনপদে আশ্রয়হীন ও সহায় সম্বলহীন শত শত মুহাজির এখনো পুরোপুরি পুনর্বাসিত হতে পারেনি, আরবের অধিবাসীরা চারদিক থেকে আর্থিক বয়কটের মাধ্যমে যার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং অভুক্ত থেকে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করাও যার পক্ষে কঠিন ছিল এখন তাকেই লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এহেন পরিস্থিতিতে সূরাটি নাযিল করা হয়েছিল। ঈমানদারদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা। এবং এ বিষয়ে প্রাথমিক পথনির্দেশনা দেয়াই এর আলোচ্য ও বক্তব্য। এ দিকটি বিচার করে এর নাম "সূরা কিতাল"ও রাখা হয়েছে। এতে ধারাবাহিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরার প্রথমেই বলা হয়েছে যে, এখন দু'টি দলের মধ্যে মোকাবিলা হচ্ছে। এ দু'টি দলের মধ্যে একটি দলের অবস্থান এই যে, তারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু অপর দলটির অবস্থান হলো, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে সত্য নাযিল হয়েছিল তা তারা মেনে নিয়েছে। এখন আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত হলো, প্রথমোক্ত দলটির সমস্ত চেষ্টা-সাধনা ও কাজ-কর্ম তিনি নিস্ফল করে দিয়েছেন এবং শেষোক্ত দলটির অবস্থা সংশোধন করে দিয়েছেন।

এরপর মুসলমানদের সামরিক বিষয়ে প্রাথমিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তাদেরকে আল্লাহর সাহায্য ও দিকনির্দেশনার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পথে কুরবানী পেশ করার জন্য তাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে। তাদের এ বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, ন্যায় ও সত্যের পথে তাদের প্রচেষ্টা বৃথা যাবে না। বরং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গাতেই তারা ক্রমান্বয়ে এর অধিক ভাল ফল লাভ করবে।

তারপর কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাহায্য ও দিকনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত। ঈমানদারদের বিরুদ্ধে তাদের কোন প্রচেষ্টাই কার্যকর হবে না। তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই অত্যন্ত খারাপ পরিণামের সম্মুখীন হবে। তারা আল্লাহর নবীকে মক্কা থেকে বের করে দিয়ে মনে করেছিলো যে, তারা বড় রকমের সফলতা লাভ করেছে। অথচ এ কাজ করে তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেরা নিজেদের জন্য বড় রকমের ধ্বংস ডেকে এনেছে।

এরপর মুনাফিকদের উদ্দেশ করে কথা বলা হয়েছে। যুদ্ধের নির্দেশ আসার পূর্বে এসব মুনাফিক নিজেদেরকে বড় মুসলমান বলে জাহির করতো। কিন্তু এ নির্দেশ আসার পরে তারা ঘাবড়ে গিয়ে নিজেদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ চিন্তায় কাফেরদের সাথে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেছিল যাতে তারা নিজেদেরকে যুদ্ধের বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। তাদেরকে স্পষ্টভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহ এবং তাঁর দীনের সাথে মুনাফিকীর

আচরণ করে তাদের কোন আমলই আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় না। এখানে যে মৌলিক প্রশ্নে ঈমানের দাবীদার প্রতিটি ব্যক্তির পরীক্ষা হচ্ছে তা হলো, সে ন্যায় ও সত্যের সাথে আছে না বাতিলের সাথে আছে? তার সমবেদনা ও সহানুভূতি মুসলমান ও ইসলামের প্রতি না কাফের ও কুফরীর প্রতি। সে নিজের ব্যক্তি সত্তা ও স্বার্থকেই বেশী ভালবাসে না কি যে ন্যায় ও সত্যের প্রতি ঈমান আনার দাবী সে করে তাকেই বেশী ভালবাসে? এ পরীক্ষায় যে ব্যক্তি মেকী প্রমাণিত হবে আল্লাহর কাছে তার নামায, রোযা এবং যাকাত কোন প্রতিদান লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া তো দূরের কথা সে আদৌ ঈমানদারই নয়।

অতপর মুসলমানদের উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের সংখ্যাল্পতা ও সহায় সম্বলহীনতা এবং কাফেরদের সংখ্যাধিক্য ও সহায় সম্বলের প্রাচুর্য দেখে সাহস না হারায় এবং তাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ না করে। এতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের দুঃসাহস আরো বেড়ে যাবে। বরং তারা যেন আল্লাহর ওপর নির্ভর করে বাতিলকে রুখে দাঁড়ায় এবং কুফরের এ আগ্রাসী শক্তির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আল্লাহ মুসলমানদের সাথে আছেন। তারাই বিজয়ী হবে এবং তাদের সাথে সংঘাতে কুফরী শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

সর্বশেষে মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার আহবান জানানো হয়েছে। যদিও সে সময় মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক ছিল। কিন্তু সামনে প্রশ্ন ছিল এই যে, আরবে ইসলাম এবং মুসলমানরা টিকে থাকবে কি থাকবে না। এ প্রশ্নের গুরুত্ব ও নাজুকতার দাবী ছিল এই যে, মুসলমানরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের দীনকে কুফরের আধিপত্যের হাত থেকে রক্ষা করার এবং আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য তাদের জীবন কুরবানী করবে ও যুদ্ধ প্রস্তুতিতে নিজেদের সমস্ত সহায় সম্পদ যথা সম্ভব অকৃপণভাবে কাজে লাগাবে। সুতরাং মুসলমানদের উদ্দেশ করে বলা হয়েছে যে, এ মুহূর্তে যে ব্যক্তি কৃপণতা দেখাবে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না, বরং নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করবে। আল্লাহ মানুষের মুখাপেক্ষী নন। কোন একটি দল বা গোষ্ঠী যদি তার দীনের জন্য কুরবানী পেশ করতে টালবাহানা করে তাহলে আল্লাহ তাদের অপসারণ করে অপর কোন দল বা গোষ্ঠীকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন।

আয়াত ৩৮ **সূরা মুহাম্মাদ–মাদানী** রুকু' ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ۝

যারা কুফরী করেছে[১] এবং আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিয়েছে[২] আল্লাহ তাদের সমস্ত কাজ–কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন[৩]। আর যারা ঈমান এনেছে নেক কাজ করেছে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে[৪] তা মেনে নিয়েছে—বস্তুত তা তো তাদের রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অকাট্য সত্য কথা—আল্লাহ তাদের খারাপ কাজগুলো তাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন[৫] এবং তাদের অবস্থা শুধরে দিয়েছেন।[৬] কারণ হলো, যারা কুফরী করেছে তারা বাতিলের আনুগত্য করেছে এবং ঈমান গ্রহণকারীগণ তাদের রবের পক্ষ থেকে আসা সত্যের অনুসরণ করেছে। আল্লাহ এভাবে মানুষের সঠিক মর্যাদা ও অবস্থান বলে দেন।[৭]

১. অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শিক্ষা ও পথনির্দেশনা পেশ করছেন তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে।

২. মূল আয়াতে صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বলা হয়েছে। صد শব্দটি আরবী ভাষায় সকর্মক ও অকর্মক উভয় ক্রিয়াপদ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। তাই এ আয়াতাংশের একটি অর্থ হচ্ছে, তারা নিজেরা আল্লাহর পথে আসা থেকে বিরত থেকেছে এবং আরেকটি অর্থ হচ্ছে, তারা অন্যদের আল্লাহর পথে আসতে বাধা দিয়েছে।

অন্যদের আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেয়ার বহু উপায় ও পন্থা আছে। এর একটি পন্থা হলো, জোরপূর্বক কাউকে ঈমান গ্রহণ থেকে বিরত রাখা। দ্বিতীয় পন্থা হলো ঈমান

গ্রহণকারী ব্যক্তির ওপর এমন জুলুম–নির্যাতন চালানো যে, তার পক্ষে ঈমানের ওপর টিকে থাকা এবং এরূপ ভয়ংকর পরিস্থিতিতে অন্যদের ঈমান গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়ে। তৃতীয় পন্থা হলো, সে নানা উপায়ে দীন ও দীনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে এবং হৃদয় মনে এমন সন্দেহ–সংশয় সৃষ্টি করবে যার দ্বারা মানুষ এ দীন সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করবে। এ ছাড়াও প্রত্যেক কাফের ব্যক্তিই এ অর্থে আল্লাহর দীনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যে, সে তার সন্তান–সন্ততিকে কুফরী রীতিনীতি অনুসারে লালন–পালন করে এবং এ কারণে তার ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য বাপ–দাদার ধর্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করা কঠিন হয়ে যায়। একইভাবে প্রতিটি কুফরী সমাজ আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টিকারী একটি জগদ্দল পাথরের মত। কারণ, এ সমাজ তার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দ্বারা তার সমাজ ব্যবস্থা ও রীতিনীতি এবং সংকীর্ণতা দ্বারা ন্যায় ও সত্য দীনের প্রসারের পথে বাধা সৃষ্টি করে।

৩. মূল আয়াতে أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের কাজ–কর্মকে বিপথগামী করে দিয়েছেন, পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন, ধ্বংস বা পণ্ড করে দিয়েছেন। একথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থ বহন করে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে তাদের চেষ্টা ও শ্রম সঠিক পথে ব্যয়িত হওয়ার তাওফীক ছিনিয়ে নিয়েছেন। এখন থেকে যে কাজই তারা করবে তা ভ্রান্ত উদ্দেশ্যে ভ্রান্ত পন্থায়ই করবে। আর তাদের সকল চেষ্টা–সাধনা হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীর পথেই ব্যয়িত হবে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তারা নিজেদের ধারণায় যে কাজ ভাল মনে করে আঞ্জাম দিয়ে আসছে, যেমন ঃ কা'বা ঘরের তত্তাবধান, হাজীদের খেদমত, মেহমানদের আপ্যায়ণ, আত্মীয়–স্বজনদের সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা এবং অনুরূপ আরো যেসব কাজকে আরবে ধর্মীয় সেবা এবং উন্নত নৈতিক কাজের মধ্যে গণ্য করা হতো, তা সব আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করে দিয়েছেন। তারা তার কোন প্রতিদান ও সওয়াব পাবে না। কারণ যখন তারা আল্লাহর তাওহীদ এবং শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাতের পথ অবলম্বন করতে অস্বীকৃতি জানায় আর অন্যদেরকেও এ পথে আসতে বাধা দেয় তখন তাদের কোন কাজই আল্লাহর কাছে গৃহীত হতে পারে না। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, ন্যায় ও সত্যের পথকে বন্ধ করতে এবং নিজেদের কুফর ভিত্তিক ধর্মকে আরবের বুকে জীবিত রাখার জন্য তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যে চেষ্টা–সাধনা চালাচ্ছে আল্লাহ তা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এখন তাদের সমস্ত কৌশল একটি লক্ষহীন তীরের মত প্রমাণিত হয়েছে। এসব কৌশল দ্বারা তারা কখনো নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে না।

৪. الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলার পর اٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ বলার প্রয়োজন আর থাকে না। কেননা, ঈমান আনয়ন করার মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিলকৃত শিক্ষাসমূহের প্রতি ঈমান পোষণ করা আপনা থেকেই অন্তরভুক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আলাদাভাবে বিশেষ করে এর উল্লেখ করা হয়েছে এ জন্য যে, নবী হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানোর পর কোন ব্যক্তি যতক্ষণ না তাঁকে এবং তাঁর আনিত শিক্ষাসমূহকে মেনে না নেবে ততক্ষণ আল্লাহ, আখেরাত, পূর্ববর্তী নবী–রসূল ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ সে যতই মেনে চলুক না কেন তা তার জন্য কল্যাণকর হবে না। একথাটা স্পষ্টভাবে বলা জরুরী ছিল। কারণ, হিজরতের পরে মদীনায়

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ
فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ
أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم
بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٤﴾ سَيَهْدِيهِمْ
وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾

অতএব এসব কাফেরের সাথে যখনই তোমাদের মোকাবিলা হবে তখন প্রথম কাজ হবে তাদেরকে হত্যা করা। এভাবে তোমরা যখন তাদেরকে আচ্ছামত পর্যুদস্ত করে ফেলবে তখন বেশ শক্ত করে বাঁধো। এরপর (তোমাদের ইখতিয়ার আছে) হয় অনুকম্পা দেখাও, নতুবা মুক্তিপণ গ্রহণ করো যতক্ষণ না যুদ্ধবাজরা অস্ত্র সংবরণ করে।[৮]

এটা হচ্ছে তোমাদের করণীয় কাজ। আল্লাহ চাইলে নিজেই তাদের সাথে বুঝাপড়া করতেন। কিন্তু (তিনি এ পন্থা গ্রহণ করেছেন এ জন্য) যাতে তোমাদেরকে পরস্পরের দ্বারা পরীক্ষা করেন।[৯] *আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হবে আল্লাহ কখনো তাদের আমলসমূহ ধ্বংস করবেন না।*[১০] *তিনি তাদের পথপ্রদর্শন করবেন। তাদের অবস্থা শুধরে দিবেন এবং তাদেরকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পরিচয় তিনি তাদেরকে আগেই অবহিত করেছেন।*[১১]

এমন সব লোকের সাথে আদান-প্রদান ও উঠাবসা করতে হচ্ছিলো যারা ঈমানের আর সব আবশ্যকীয় বিষয় মানলেও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিলো।

৫. এর দু'টি অর্থ ঃ একটি হচ্ছে, তাদের দ্বারা জাহেলী যুগে যে গোনাহর কাজ সংঘটিত হয়েছিল আল্লাহ তার সবই তাদের হিসেব থেকে বাদ দিয়েছেন। ঐ সব গোনাহর কাজের জন্য এখন আর তাদের কোন প্রকার জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, আকীদা, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, নৈতিক চরিত্র এবং কাজ-কর্মের যে পঙ্কিলতার মধ্যে তারা ডুবে ছিল আল্লাহ তা'আলা তা থেকে তাদেরকে মুক্ত করেছেন। এখন তাদের মন-মস্তিষ্ক পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। তাদের অভ্যাস ও আচার-আচরণ পরিবর্তিত হয়েছে এবং তাদের জীবন, চরিত্র ও কর্মকাণ্ডও পরিবর্তিত হয়েছে। এখন তাদের মধ্যে জাহেলিয়াতের পরিবর্তে আছে ঈমান এবং দুষ্কৃতির পরিবর্তে আছে সুকৃতি।

৬. একথাটিরও দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, অতীতের অবস্থা পরিবর্তিত করে আল্লাহ তাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য সঠিক পথে নিয়ে এসেছেন এবং তাদের জীবনকে সুবিন্যস্ত ও সুসজ্জিত করে দিয়েছেন। আরেকটি অর্থ হচ্ছে এখন পর্যন্ত তারা যে দুর্বল, অসহায় ও নির্যাতিত অবস্থার মধ্যে ছিল তা থেকে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বের করে এনেছেন। এখন তিনি তাদের জন্য এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যে, তারা জুলুমের শিকার হওয়ার পরিবর্তে জালেমের মোকাবিলা করবে, শাসিত হওয়ার পরিবর্তে নিজেরাই স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবন পরিচালনা করবে এবং বিজিত না হয়ে বিজয়ী হয়ে থাকবে।

৭. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ । অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা এভাবে মানুষের জন্য তাদের উদাহরণ পেশ করেন।" এটি এ আয়াতাংশের শাব্দিক অনুবাদ। কিন্তু শাব্দিক এ অনুবাদ দ্বারা এর প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট হয় না। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, এভাবে আল্লাহ তা'আলা উভয় দলকে তাদের অবস্থান সঠিকভাবে বলে দেন। তাদের একদল বাতিলের অনুসরণ করতে বদ্ধপরিকর। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের সমস্ত চেষ্টা–সাধনাকে নিষ্ফল করে দিয়েছেন। কিন্তু অপর দল ন্যায় ও সত্যের আনুগত্য গ্রহণ করেছে। তাই আল্লাহ তাদেরকে সমস্ত অকল্যাণ থেকে মুক্ত করে তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিয়েছেন।

৮. এ আয়াতের শব্দাবলী এবং যে পূর্বাপর প্রসংগে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তা থেকেও একথা স্পষ্ট জানা যায় যে, আয়াতটি যুদ্ধের নির্দেশ আসার পর কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে নাযিল হয়েছিল। "যখন কাফেরদের সাথে তোমাদের মোকাবিলা হবে" কথাটিও ইংগিত দেয় যে, তখনও মোকাবিলা হয়নি বরং মোকাবিলা হলে কি করতে হবে সে সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

যে সময় সূরা হজ্জের ৩৯ আয়াতে এবং সূরা বাকারার ১৯০ আয়াতে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং যার কারণে ভয়ে ও আতংকে মদীনার মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের লোকদের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল এই যে, মৃত্যু যেন তাদের মাথার ওপর এসে হাজির হয়েছে, ঠিক সে সময়ই যে, এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল তা এর ২০ আয়াত থেকেই প্রমাণিত হয়।

তাছাড়া সূরা আনফালের ৬৭–৬৯ আয়াতগুলো থেকেও এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, এ আয়াতটি বদর যুদ্ধের আগেই নাযিল হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

"শত্রুকে যুদ্ধে উচিত মত শিক্ষা দেয়ার আগেই নবীর হাতে তারা বন্দী হবে এমন কাজ কোন নবীর জন্য শোভনীয় নয়। তোমরা পার্থিব স্বার্থ কামনা করো। কিন্তু আল্লাহর বিচার্য বিষয় হচ্ছে আখেরাত। আল্লাহ বিজয়ী ও জ্ঞানী। আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি আগেই লিপিবদ্ধ না থাকতো তাহলে তোমরা যা নিয়েছো সে জন্যে তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হতো। সুতরাং যে অর্থ তোমরা অর্জন করেছো তা খাও। কারণ, তা হালাল ও পবিত্র।"

এ বাক্যটি এবং বিশেষ করে এর নীচে দাগ টানা বাক্যাংশ সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ ক্ষেত্রে যে কারণে তিরস্কার করা হয়েছে তা হচ্ছে বদর যুদ্ধে শত্রুদেরকে চরম শিক্ষা দেয়ার আগেই মুসলমানরা শত্রুদের লোকজনকে বন্দী করতে শুরু করেছিল। অথচ যুদ্ধের পূর্বে সূরা মুহাম্মাদে তাদেরকে যে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছিল তা হচ্ছে ঃ "তোমরা যখন তাদেরকে আচ্ছামত পদদলিত করে ফেলবে তখন

বন্দীদের শক্ত করে বাঁধবে।" তা সত্ত্বেও সূরা মুহাম্মাদে যেহেতু মুসলমানদেরকে বন্দীদের থেকে মুক্তিপণ নেয়ার অনুমতি মোটের ওপর দেয়া হয়েছিল তাই বদর যুদ্ধের বন্দীদের নিকট থেকে যে অর্থ নেয়া হয়েছিল আল্লাহ তা'আলা তা হালাল ঘোষণা করলেন এবং তা গ্রহণ করার জন্য মুসলমানদের শাস্তি দিলেন না। "যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগেই লিপিবদ্ধ না থাকতো" কথাটি স্পষ্টত এ বিষয়ের প্রতিই ইংগিত দান করে যে, এ ঘটনার পূর্বেই কুরআন মজীদে মুক্তিপণ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। একথাটিও স্পষ্ট যে, কুরআনের সূরা মুহাম্মাদ ছাড়া এমন আর কোন আয়াত নেই যেখানে এ নির্দেশ আছে। তাই একথা মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায়ান্তর নেই যে, এ আয়াতটি সূরা আনফালের পূর্বোল্লেখিত আয়াতের আগে নাযিল হয়েছিল। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন। সূরা আনফালের ব্যাখ্যা, টীকা ৪৯)

এটি কুরআন মজীদের সর্বপ্রথম আয়াত যাতে যুদ্ধের আইন-কানুন সম্পর্কে প্রাথমিক দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এ থেকে যেসব বিধি-বিধান উৎসারিত হয় এবং সে বিধি-বিধান অনুসারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা কিরাম যেভাবে আমল করেছেন এবং ফিকাহবিদগণ এ আয়াত ও সুন্নাতের আলোকে গবেষণার ভিত্তিতে যেসব হুকুম-আহকাম রচনা করেছেন তার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনীর মূল লক্ষ থাকে শত্রুর সামরিক শক্তি ধ্বংস করা যাতে তার যুদ্ধ করার ক্ষমতা না থাকে এবং যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ লক্ষ থেকে বিচ্যুত হয়ে শত্রুর লোকজনকে বন্দী করতে লেগে যাওয়া অনুচিত। শত্রু সেনাদেরকে যুদ্ধবন্দী করার প্রতি মনোযোগ দেয়া কেবল তখনই উচিত যখন শত্রুর শক্তির আচ্ছামত মূলোৎপাটন হবে এবং যুদ্ধের ময়দানে তাদের কেবল মুষ্টিমেয় কিছু লোকই অবশিষ্ট থাকবে। প্রারম্ভেই মুসলমানদেরকে এ দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছিল যাতে তারা মুক্তিপণ লাভ অথবা ক্রীতদাস সংগ্রহের লোভে পড়ে যুদ্ধের মূল লক্ষ ও উদ্দেশ্য ভুলে না বসে।

দুই ঃ যুদ্ধে যারা গ্রেফতার হবে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের ইখতিয়ার আছে। তোমরা ইচ্ছা করলে, দয়াপরবশ হয়ে তাদের মুক্তি দাও অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও। এ থেকে এ সাধারণ বিধানের উৎপত্তি হয় যে, যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা যাবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা), হাসান বাসরী, আতা এবং হাম্মাদ এ আইনটিকে অবিকল এরূপ সর্বব্যাপী ও শর্তহীন আইন হিসেবেই গ্রহণ করেছেন এবং তা যথাস্থানে সঠিকও বটে। তারা বলেন ঃ যুদ্ধরত অবস্থায় মানুষকে হত্যা করা যেতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে এবং বন্দীরা আমাদের দখলে চলে আসলে তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। ইবনে জারীর এবং আবু বকর জাস্সাস বর্ণনা করেছেন যে, হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ যুদ্ধ বন্দীদের একজনকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের (রা) হাতে দিয়ে তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলে তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং এ আয়াত পড়ে বললেন ঃ আমাদেরকে বন্দী অবস্থায় কাউকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। ইমাম মুহাম্মাদ আস সিয়ারুল কাবীর গ্রন্থেও এ বিষয়ে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমের হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে (রা) একজন যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এ যুক্তির ভিত্তিতেই সে নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করেছিলেন।

তিন ঃ কিন্তু এ আয়াতে যেহেতু হত্যা করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়নি তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর এ নির্দেশের অভিপ্রায় বুঝেছেন এই যে, যদি এমন কোন বিশেষ কারণ থাকে যার ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসক কোন বন্দী অথবা কিছু সংখ্যক বন্দীকে হত্যা করা জরুরী মনে করেন তবে তিনি তা করতে পারেন। এটা কোন স্বাভাবিক ব্যাপকভিত্তিক নিয়ম-বিধি নয়, বরং একটি ব্যতিক্রমী নিয়ম-বিধি যা কেবল অনিবার্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই কাজে লাগানো হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্য থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু উকবা ইবনে আবী মু'আইত এবং নাদর ইবনে হারেসকে হত্যা করেছিলেন। ওহুদ যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে শুধু কবি আবু আযযাকে হত্যা করেছিলেন। বনী কুরাইযা গোত্র নিজেরাই নিজেদেরকে হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের সিদ্ধান্তের ওপর সোপর্দ করেছিল এবং তাদের নিজেদের সমর্থিত বিচারকের রায় ছিল এই যে, তাদের পুরুষদের হত্যা করতে হবে, তাই তিনি তাদের হত্যা করিয়েছিলেন। খায়বার যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে শুধু কিনানা ইবনে আবীল হুকাইককে হত্যা করা হয়েছিল। কারণ, সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। মক্কা বিজয়ের পরে সমস্ত মক্কাবাসীর মধ্য থেকে শুধু কয়েকজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাদের মধ্যে যে-ই বন্দী হবে তাকেই হত্যা করতে হবে। এ কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোন যুদ্ধবন্দী হত্যা করা কখনো নবীর (সা) কর্মনীতি ছিল না। আর খোলাফায়ে রাশেদীনেরও কর্মধারা এরূপ ছিল। তাঁদের শাসন যুগেও যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করার দৃষ্টান্ত খুব কমই দেখা যায়। আর দু'একটি দৃষ্টান্ত থাকলেও নির্দিষ্ট কোন কারণে তাদের হত্যা করা হয়েছিল—কেবল যুদ্ধবন্দী হবার কারণে নয়। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযও তাঁর গোটা খিলাফত যুগে শুধু একজন যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করেছিলেন। এর কারণ ঐ ব্যক্তি মুসলমানদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছিল। এ কারণেই অধিকাংশ ফিকাহবিদ এ মত সমর্থন করেছেন যে, ইসলামী সরকার প্রয়োজন মনে করলে বন্দীদের হত্যা করতে পারেন। তবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব সরকারের। যাকে ইচ্ছা হত্যা করার অধিকার কোন সৈনিকেরই নেই। তবে বন্দী যদি পালিয়ে যাওয়ার কিংবা তার কোন প্রকার কুমতলবের আশংকা সৃষ্টি হয় তাহলে যিনি এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন তিনি তাকে হত্যা করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে ইসলামী ফিকাহবিদগণ আরো তিনটি বিষয় পরিষ্কার করে বর্ণনা করেছেন। এক, বন্দী যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে না। দুই, বন্দীকে ততক্ষণ পর্যন্ত হত্যা করা যাবে যতক্ষণ সে সরকারের হাতে থাকবে। বন্টন বা বিক্রির মাধ্যমে সে যদি অন্য কারো মালিকানাভুক্ত হয়ে যায় তাহলে আর তাকে হত্যা করা যাবে না। তিন, বন্দীকে হত্যা করতে হলে সোজাসুজি হত্যা করতে হবে। কষ্ট দিয়ে হত্যা করা যাবে না।

চার ঃ যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে সাধারণভাবে যে বিধান দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, হয় তাদের প্রতি দয়া কর নয় তো মুক্তিপণের আদান প্রদান করো।

ইহসানের মধ্যে চারটি জিনিস অন্তরভুক্ত। এক, বন্দী থাকা অবস্থায় তার সাথে ভাল আচরণ করতে হবে। দুই, হত্যা বা স্থায়ীভাবে বন্দী করার পরিবর্তে তাকে দাস বানিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। তিন, জিযিয়া আরোপ করে তাকে জিম্মী অর্থাৎ নিরাপত্তা প্রাপ্ত বানিয়ে নিতে হবে। চার, কোন বিনিময় ছাড়াই তাকে মুক্ত করে দিতে হবে।

মুক্তিপণ গ্রহণের তিনটি পন্থা আছে। এক, অর্থের বিনিময়ে মুক্তি দেয়া। দুই, মুক্তি দানের শর্ত হিসেবে বিশেষ কোন সেবা গ্রহণ করার পর মুক্তি দেয়া। তিন, শত্রুদের হাতে বন্দী নিজের লোকদের সাথে বিনিময় করা।

এসব বিবিধ পন্থা অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম বিভিন্ন সময়ে সুযোগ মত আমল করেছেন। আল্লাহর দেয়া শরীয়াতী বিধান ইসলামী সরকারকে কোন একটি মাত্র উপায় ও পন্থার অনুসরণ বাধ্যতামূলক করে দেয়নি। সরকার যখন যে উপায় ও পন্থাটিকে সর্বাধিক উপযুক্ত মনে করবে সে পন্থা অনুসারে কাজ করতে পারে।

পাঁচ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের (রা) আচরণ দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, একজন যুদ্ধবন্ধী যতক্ষণ সরকারের হাতে বন্দী থাকবে ততক্ষণ তার খাদ্য, পোশাক এবং অসুস্থ বা আহত হলে চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারের। বন্দীদের ক্ষুধার্ত ও বস্ত্রহীন রাখা কিংবা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার কোন বৈধতা ইসলামী শরীয়াতে নেই। বরং এর বিপরীত অর্থাৎ উত্তম আচরণ এবং বদান্যতামূলক ব্যবহার করার নির্দেশ যেমন দেয়া হয়েছে তেমনি নবীর বাস্তব কর্মকাণ্ডেও এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে বিভিন্ন সাহাবার পরিবারে বন্টন করে দিয়েছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, استوصوا بالاسارى خيرًا "এসব বন্দীদের সাথে ভাল আচরণ করবে।" তাদের মধ্যে একজন বন্দী ছিলেন আবু আযীয। তিনি বর্ণনা করেন ঃ "আমাকে যে আনসারদের পরিবারে রাখা হয়েছিল তারা আমাকে সকাল সন্ধ্যায় রুটি খেতে দিত। কিন্তু নিজেরা শুধু খেজুর খেয়ে থাকতো।" অন্য একজন বন্দী সুহাইল ইবনে আমর সম্পর্কে নবীকে (সা) জানানো হলো যে, সে একজন অনলবর্ষী বক্তা। সে আপনার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতো। তার দাঁত উপড়িয়ে দিন। জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ "আমি যদি তার দাঁত উপড়িয়ে দেই তাহলে নবী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ আমার দাঁত উপড়িয়ে দেবেন।" (সীরাতে ইবনে হিশাম) ইয়ামামা অঞ্চলের নেতা সুমামা ইবনে উসাল বন্দী হয়ে আসলে সে বন্দী থাকা অবধি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে তার জন্য উত্তম খাদ্য ও দুধ সরবরাহ করা হতো। (ইবনে হিশাম) সাহাবায়ে কিরামের যুগেও এ কর্মপদ্ধতি চালু ছিল। তাঁদের যুগেও যুদ্ধবন্দীদের সাথে খারাপ আচরণের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

ছয় ঃ বন্দীদের স্থায়ীভাবে বন্দী করে রাখতে হবে—এবং সরকার তাদের থেকে বাধ্যতামূলক শ্রম আদায় করতে থাকবে ইসলাম এমন ব্যবস্থা আদৌ রাখেনি। যদি তাদের সাথে অথবা তাদের জাতির সাথে যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের অথবা মুক্তিপণ আদায়ের কোন ব্যবস্থা না হয় সে ক্ষেত্রে তাদের প্রতি ইহসান করার যে পন্থা রাখা হয়েছে তা হচ্ছে, তাদেরকে দাস বানিয়ে ব্যক্তির মালিকানায় দিয়ে দিতে হবে এবং তাদের মালিকদের নির্দেশ দিতে হবে যে, তারা যেন তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেও এ নীতি অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে, সাহাবায়ে কিরামের যুগেও তা চালু ছিল এবং তা জায়েয হওয়া সম্পর্কে মুসলিম ফিকাহবিদগণ সর্বসম্মতিক্রমে মত প্রকাশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে যে বিষয়টি জানা থাকা দরকার তাহলো এই যে, বন্দী হওয়ার পূর্বেই যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং পরে কোনভাবে বন্দী

হয়েছে তাকে মুক্ত ও স্বাধীন করে দেয়া হবে। কিন্তু কেউ বন্দী হওয়ার পরে ইসলাম গ্রহণ করলে, অথবা কোন ব্যক্তির মালিকানাধীনে দিয়ে দেয়ার পরে মুসলমান হলে এভাবে ইসলাম গ্রহণ তার মুক্তির কারণ হতে পারে না। মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম এবং তিরমিযী হাদীস গ্রন্থে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত আছে যে, বনী উকাইল গোত্রের এক ব্যক্তি বন্দী হয়ে আসলো এবং বললো যে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

لَو قُلتَهَا وَاَنتَ تَملِكُ اَمرَكَ اَفلَحتَ كُلَّ الفَلَاحِ

"যখন তুমি স্বাধীন ছিলে তখন যদি একথাটি বলতে তাহলে তুমি নিসন্দেহে সফলকাম হতে।"

হযরত উমর (রা) বলেছেন :

اذا اسلم الاسير فى ايدى المسلمين فقد امن من القتل وهو رقيق –

"বন্দী যদি মুসলমানদের হাতে পড়ার পরে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা পাবে, তবে দাস থেকে যাবে।"

এরই ওপরে ভিত্তি করে মুসলিম ফিকাহবিদগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, বন্দী হওয়ার পরে ইসলাম গ্রহণকারী দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে না। (আস সিয়ারুল কাবীর, ইমাম মুহাম্মাদ) একথাটি অত্যন্ত যুক্তিসংগতও বটে। কারণ, আমাদের আইন যদি এমন হতো যে, বন্দী হওয়ার পর যে ব্যক্তিই ইসলাম গ্রহণ করবে তাকেই মুক্ত করে দেয়া হবে তাহলে কালেমা পড়ে মুক্তি লাভ করতো না এমন কোন নির্বোধ বন্দী কি পাওয়া যেতো?

সাত : ইসলামে বন্দীদের প্রতি ইহসান করার তৃতীয় যে পন্থাটি আছে তা হচ্ছে, জিযিয়া আরোপ করে তাদেরকে দারুল ইসলামের যিম্মী (নিরাপত্তা প্রদত্ত) নাগরিক বানিয়ে নেয়া। এভাবে তারা ইসলামী রাষ্ট্রে ঠিক তেমনি স্বাধীনতা নিয়ে থাকবে যেমন মুসলমানরা থাকে। ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর 'আস সিয়ারুল কাবীর' নামক গ্রন্থে লিখছেন : "যেসব ব্যক্তিকে দাস বানানো বৈধ তাদের প্রত্যেকের ওপর জিযিয়া আরোপ করে যিম্মী নাগরিক বানানোও বৈধ।" অন্য এক স্থানে লিখছেন : "তাদের ওপর জিযিয়া এবং তাদের ভূমির ওপর ভূমিকর আরোপ করে তাদেরকে প্রকৃতই স্বাধীন ও মুক্ত করে দেয়ার অধিকার মুসলমানদের শাসকের আছে।" বন্দী লোকেরা যে অঞ্চলের অধিবাসী সে অঞ্চল বিজিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত হলে সে পরিস্থিতিতে সাধারণত এ নীতি–পদ্ধতি অনুসারে কাজ করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, খায়বারের অধিবাসীদের বেলায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে শহর এলাকার বাইরে ইরাকের প্রত্যন্ত অঞ্চল বিজিত হওয়ার পর হযরত উমর (রা) ব্যাপকভাবে এ নীতি অনুসরণ করেছিলেন। আবু উবায়েদ কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থে লিখেছেন যে, ইরাক বিজিত হওয়ার পর সে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের একটি প্রতিনিধি

দল হযরত উমরের (রা) দরবারে হাজির হয়ে আবেদন জানালো যে, আমীরুল মু'মিনীন! ইতিপূর্বে ইরানবাসীরা আমাদের ঘাড়ে চেপেছিল। তারা আমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে, আমাদের সাথে অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছে এবং আমাদের ওপর নানাভাবে বাড়াবাড়ি ও জুলুম করেছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন আপনাদের পাঠালেন তখন আপনাদের আগমনে আমরা খুব খুশী হলাম এবং আপনাদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলিনি কিংবা যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করিনি। এখন আমরা শুনছি যে, আপনি আমাদের দাস বানিয়ে নিতে চাচ্ছেন। হযরত উমর (রা) জবাব দিলেন ঃ তোমাদের স্বাধীনতা আছে, তোমরা মুসলমান হয়ে যাও, কিংবা জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয়ে স্বাধীন হয়ে যাও। ঐ সব লোক জিযিয়া প্রদান করতে স্বীকৃত হন এবং তাদেরকে স্বাধীন থাকতে দেয়া হয়। উক্ত গ্রন্থেরই আরো এক স্থানে আবু উবায়েদ বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রা) হযরত আবু মূসা আশ'আরীকে লিখেন, যুদ্ধে যাদের বন্দী করা হয়েছে তাদের মধ্য থেকে কৃষকদের প্রত্যেককে ছেড়ে দাও।"

আট ঃ ইহসান করার চতুর্থ পন্থা হলো কোন প্রকার মুক্তিপণ বা বিনিময় না নিয়েই বন্দীকে ছেড়ে দেয়া। এটি একটি বিশেষ অনুকম্পা। বিশেষ কোন বন্দীর অবস্থা যখন এরূপ অনুকম্পা প্রদর্শনের দাবী করে কিংবা যদি আশা থাকে যে, এ অনুকম্পা সে বন্দীকে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবে এবং সে শত্রু না থেকে বন্ধু এবং কাফের না থেকে মু'মিন হয়ে যাবে তাহলে কেবল সে অবস্থায়ই ইসলামী সরকার তা করতে পারে। অন্যথায় এ বিষয়টি সর্বজন বিদিত যে, মুক্তিলাভ করার পর সে পুনরায় আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসবে এ জন্য শত্রু কওমের কোন ব্যক্তিকে মুক্তি দেয়া কোনক্রমেই যুক্তির দাবী হতে পারে না। এ কারণেই মুসলিম ফিকাহবিদগণ ব্যাপকভাবে এর বিরোধিতা করেছেন এবং এর বৈধতার জন্য শর্ত আরোপ করেছেন যে, যদি মুসলমানদের ইমাম বন্দীদের সবাইকে কিংবা তাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যককে ইহসান বা অনুকম্পার ভিত্তিতে ছেড়ে দেয়া যুক্তিসংগত মনে করেন তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই। (আস সিয়ারুল কাবীর) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এর প্রায় সব ক্ষেত্রেই যৌক্তিকতা ও উপকারিতার দিকটি সুস্পষ্ট।

বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে নবী (সা) বলেছেন ঃ

لو كان المطعم بن عدى حيا ثم كلمنى فى هولاء النتنى لتركتهم له -

"মুতইম ইবনে আদ্দী যদি জীবিত থাকতো আর সে এসব জঘন্য লোকগুলো সম্পর্কে আমার সাথে আলোচনা করতো তাহলে আমি তার খাতিরে এদের ছেড়ে দিতাম।" (বুখারী, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা এ জন্য বলেছিলেন যে, তিনি যে সময় তায়েফ থেকে মক্কায় ফিরেছিলেন সে সময় মুতইমই তাঁকে নিজের আশ্রয়ে নিয়েছিলেন এবং তার ছেলে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে নিজের হিফাজতে তাঁকে হারাম শরীফে নিয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি এভাবে তার ইহসানের প্রতিদান দিতে চাচ্ছিলেন।

বুখারী, মুসলিম এবং মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়ামামার নেতা সুমামা ইবনে উসাল বন্দী হয়ে আসলে নবী (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ সুমামা, তোমার বক্তব্য কি? সে বললো ঃ "আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন তাহলে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করবেন ঃ যার রক্তের কিছু মূল্য আছে, যদি আমার প্রতি ইহসান করেন তাহলে এমন এক ব্যক্তির প্রতি ইহসান করা হবে যে ইহসান স্বীকার করে। আর যদি আপনি অর্থ চান তাহলে তা আপনাকে প্রদান করা হবে।" তিনদিন পর্যন্ত তিনি তাকে একথাটিই জিজ্ঞেস করতে থাকলেন আর সে–ও একই জবাব দিতে থাকলো। অবশেষে তিনি সুমামাকে ছেড়ে দিতে আদেশ দিলেন। মুক্তি পাওয়া মাত্র সে নিকটবর্তী একটি খেজুরের বাগানে গিয়ে গোসল করে ফিরে আসলো এবং কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে বললো, আজকের দিনের আগে আমার কাছে আপনার চেয়ে কোন ব্যক্তি এবং আপনার দীনের চেয়ে কোন দীন অধিক ঘৃণিত ছিল না। কিন্তু এখন আমার কাছে আপনার চেয়ে কোন ব্যক্তি এবং আপনার দীনের চেয়ে কোন দীন অধিক প্রিয় নয়। এরপরে সে উমরা করার জন্য মক্কা গেল এবং সেখানে কুরাইশদের জানিয়ে দিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত আজকের দিনের পরে ইয়ামামা থেকে কোন শস্য তোমরা পাবে না। সে প্রকৃতপক্ষে তাই করলো। ফলে মক্কাবাসীদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আবেদন জানাতে হলো, তিনি যেন ইয়ামামা থেকে তাদের রসদ বন্ধ করিয়ে না দেন।

বনু কুরাইযার বন্দীদের মধ্য থেকে তিনি যাবীর ইবনে বাতা এবং আমর ইবনে সা'দ (অথবা ইবনে সু'দা) এর মৃত্যুদণ্ড রহিত করে দিলেন। তিনি যাবীরকে মুক্তি দিলেন এ কারণে যে, জাহেলী যুগে বুআস যুদ্ধের সময় সে হযরত সাবেত ইবনে কায়েসকে আশ্রয় দিয়েছিল। তাই তিনি তাকে সাবেতের হাতে তুলে দিলেন যাতে তিনি তাকে তাঁর প্রতি কৃত ইহসানের প্রতিদান দিতে পারেন। আর আমর ইবনে সা'দকে ছেড়েছিলেন এ জন্য যে, বনী কুরাইযা গোত্র যখন নবীর (সা) সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছিল সে সময় এ ব্যক্তিই তার গোত্রকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে নিষেধ করেছিলো। (কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়েদ)

বনী মুসতালিক যুদ্ধের পর যখন উক্ত গোত্রের বন্দীদের এনে সবার মধ্যে বন্টন করে দেয়া হলো তখন হযরত জুয়াইরিয়া যার অংশে পড়েছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার বিনিময় দিয়ে মুক্ত করলেন এবং এরপর নিজেই তাকে বিয়ে করলেন। এতে সমস্ত মুসলমান তাদের অংশের বন্দীদেরও মুক্ত করে দিলেন। কারণ, এখন তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়। এভাবে একশ'টি পরিবারের ব্যক্তিবর্গ মুক্তি লাভ করলো। (মুসনাদে আহমাদ, তাবকাতে ইবনে সা'দ, সীরাতে ইবনে হিশাম)

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মক্কার ৮০ ব্যক্তি তানয়ীমের দিকে এগিয়ে আসে এবং ফজরের নামাযের সময় তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্যাম্পে আকস্মিক আক্রমণ চালানোর সংকল্প করে। তাদের সবাইকে বন্দী করা হয়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে ছেড়ে দেন যাতে এ নাজুক পরিস্থিতিতে এ বিষয়টি যুদ্ধের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। (মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)

মক্কা বিজয়ের সময় কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত সকলকে তিনি অনুগ্রহ করে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। যাদের বাদ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যেও তিন চারজন ছাড়া কাউকে হত্যা করা হয়নি। মক্কাবাসীরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের ওপর কিভাবে জুলুম করেছিল তা আরবরা সবাই জানতো। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভ করার পর যে মহত উদারতার সাথে নবী (সা) তাদের ক্ষমা করেছিলেন তা দেখে আরববাসীরা অন্তত এতটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলো যে, তাদের মোকাবিলা কোন নিষ্ঠুর ও কঠোর হৃদয় জালেমের সাথে নয়, বরং অত্যন্ত দয়াবান ও উদার নেতার সাথে। এ কারণেই মক্কা বিজয়ের পর গোটা আরব উপদ্বীপ অনুগত হতে দু'বছর সময়ও লাগেনি।

হুনায়েন যুদ্ধের পর হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল তাদের বন্দীদের মুক্ত করার জন্য যখন হাযির হলো তখন সমস্ত বন্দীদের বন্টন করা হয়ে গিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত মুসলমানকে একত্রিত করে বললেন ঃ এরা সবাই তাওবা করে হাযির হয়েছে। আমার মত হলো তাদের বন্দীদের তাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হোক। তোমাদের মধ্যে যে তার অংশের বন্দীকে বিনিময় ছাড়াই সন্তুষ্ট চিত্তে ছেড়ে দিতে চায় সে যেন তাই করে। আর যে এর বিনিময় চায় তাকে আমি বায়তুলমালে সর্বপ্রথম যে অর্থ আমদানী হবে তা থেকে পরিশোধ করে দেব। এভাবে ছয় হাজার বন্দীকে মুক্ত করে দেয়া হলো যারা বিনিময় চেয়েছিলো সরকারের পক্ষ থেকে তাদের বিনিময় প্রদান করা হলো। (বুখারী, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ, তাবকাতে ইবনে সা'দ) এ থেকে এ বিষয়টিও জানা গেল যে, বন্টিত হওয়ার পর সরকার নিজে বন্দীদের মুক্ত করে দেয়ার অধিকার রাখে না বরং বন্দীদেরকে যেসব লোকের মালিকানায় দিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের সম্মতির ভিত্তিতে অথবা বিনিময় দিয়ে তা করা যেতে পারে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে সাহাবীদের যুগেও ইহসান করে বন্দীদের মুক্তি দান করার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হযরত আবু বকর (রা) আশয়াস ইবনে কায়েস কিন্দীকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং হযরত উমর (রা) হুরমুযানকে এবং মানাযির ও মায়সানের বন্দীদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। (কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়েদ)

নয় ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে অর্থের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি দেয়ার দৃষ্টান্ত কেবল বদর যুদ্ধের সময় দেখা যায়। সে সময় একেকজন বন্দীকে এক হাজার থেকে ৪ হাজার পর্যন্ত মুদ্রা নিয়ে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। (তাবকাতে ইবনে সা'দ, কিতাবুল আমওয়াল) সাহাবায়ে কিরামের যুগে এর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। মুসলিম ফিকাহবিদগণ ব্যাপকভাবে এরূপ করা অপছন্দ করেছেন। কারণ, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আমরা অর্থের বিনিময়ে শত্রুদের কাউকে ছেড়ে দেব আর সে পুনরায় আমাদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করবে। তবে কুরআন মজীদে যেহেতু মুক্তিপণ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সে অনুযায়ী আমল করেছেন, তাই এ কাজ একেবারে নিষিদ্ধ নয়। ইমাম মুহাম্মাদ (র) আস সিয়ারুল কাবীর গ্রন্থে বলেন ঃ "প্রয়োজন দেখা দিলে মুসলমানরা অর্থের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দিতে পারেন।"

দশ ঃ যুদ্ধবন্দীদেরকে কোন সেবা গ্রহণের বিনিময়ে মুক্তি দেয়ার দৃষ্টান্তও বদর যুদ্ধের সময় দেখা যায়। কুরাইশ বন্দীদের মধ্যে যাদের আর্থিক মুক্তিপণ দেয়ার ক্ষমতা ছিল না

তাদের মুক্তি দেয়ার জন্য নবী (সা) শর্ত আরোপ করেছিলেন যে, তারা আনসারদের দশজন করে শিশুকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেবে। (মুসনাদে আহমাদ, তাবকাতে ইবনে সা'দ, কিতাবুল আমওয়াল)

এগার ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমরা বন্দী বিনিময়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। একবার নবী (সা) হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে একটি অভিযানে পাঠালেন। এতে কয়েকজন বন্দী হয়ে আসলো। তাদের মধ্যে জনৈকা পরমা সুন্দরী নারীও ছিল। সে সালামা ইবনুল আকওয়ার অংশে পড়ে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বার বার বলে মহিলাকে চেয়ে নিলেন এবং তাকে মক্কায় পাঠিয়ে তার বিনিময়ে বহু মুসলমান বন্দীকে মুক্ত করালেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তাহাবী, কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবায়েদ, তাবকাতে ইবনে সা'দ) হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন বর্ণনা করেন ঃ একবার সাকীফ গোত্র দু'জন মুসলমানকে বন্দী করে। এর কিছুদিন পর সাকীফের মিত্র বনী উকাইলের এক ব্যক্তি মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। নবী (সা) তাকে তায়েফে পাঠিয়ে তার বিনিময়ে ঐ দু'জন মুসলমানকে মুক্ত করে আনেন। (মুসলিম, তিরমিযি, মুসনাদে আহমাদ) ফিকাহবিদদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমাদের মতে বন্দী বিনিময় জায়েয। ইমাম আবু হানীফার একটি মত হচ্ছে, বিনিময় না করা উচিত। কিন্তু তাঁরও দ্বিতীয় মত হচ্ছে বিনিময় করা যেতে পারে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, বন্দীদের যে মুসলমান হয়ে যাবে বিনিময়ের মাধ্যমে তাকে কাফেরদের হাতে তুলে দেয়া যাবে না।

এ ব্যাখ্যার দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম যুদ্ধবন্দীদের জন্য এমন একটি ব্যাপক আইন রচনা করেছে যার মধ্যে প্রত্যেক যুগে এবং সব রকম পরিস্থিতিতে এ সমস্যার মোকাবিলা করার অবকাশ আছে। যারা কুরআন মজীদের এ আয়াতটির শুধু এ সংক্ষিপ্ত অর্থ গ্রহণ করে যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে ইহসান বা অনুকম্পা করে ছেড়ে দিতে হবে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে তারা জানে না যুদ্ধবন্দী সম্পর্কিত বিষয়টির কত ভিন্ন ভিন্ন দিক থাকতে পারে এবং বিভিন্ন যুগে তা কত সমস্যা সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যতেও করতে পারে।

৯. অর্থাৎ বাতিলের পূজারীদের মাথা চূর্ণ করাই যদি আল্লাহ তা'আলার একমাত্র কাজ হতো তাহলে তা করার জন্য তিনি তোমাদের মুখাপেক্ষী হতেন না। তাঁর সৃষ্ট ভূমিকম্প বা ঝড়–তুফান চোখের পলকেই এ কাজ করতে পারতো। কিন্তু তিনি চান মানুষের মধ্যে যারা ন্যায় ও সত্যের অনুসারী তারা বাতিলের অনুসারীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হোক এবং তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুক। যাতে যার মধ্যে যে গুণাবলী আছে তা এ পরীক্ষায় সুন্দর ও পরিমার্জিত হয়ে সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং প্রত্যেকেই তার কর্মের বিচারে যে অবস্থান ও মর্যাদালাভের উপযুক্ত তাকে তা দেয়া যায়।

১০. অর্থাৎ আল্লাহর পথে কারো নিহত হওয়ার অর্থ এ নয় যে, কেউ নিহত হলেই তার ব্যক্তিগত সব কাজ–কর্মই ধ্বংস হয়ে গেল। কেউ যদি একথা মনে করে যে, শহীদদের ত্যাগ ও কুরবানী তাদের নিজেদের জন্য উপকারী নয় বরং তাদের পরে যারা এ পৃথিবীতে জীবিত থাকলো এবং তাদের ত্যাগ ও কুরবানী দ্বারা লাভবান হলো তারাই শুধু

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَٰلَهُمْ ۝٨ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ۝٩ ۞ أَفَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَٰفِرِينَ أَمْثَٰلُهَا ۝١٠ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَأَنَّ ٱلْكَٰفِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ۝١١

হে ঈমান গ্রহণকারীগণ, তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো তাহলে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন[১২] এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করে দিবেন। যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে শুধু ধ্বংস।[১৩] আল্লাহ তাদের কাজ-কর্ম পণ্ড করে দিয়েছেন। কারণ আল্লাহ যে জিনিস নাযিল করেছেন তারা সে জিনিসকে অপছন্দ করেছে।[১৪] অতএব, আল্লাহ তাদের আমলসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছেন। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে সেসব লোকের পরিণাম দেখে না, যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়েছে? আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। এসব কাফেরের জন্যও অনুরূপ পরিণাম নির্ধারিত হয়ে আছে।[১৫] এর কারণ, আল্লাহ নিজে ঈমান গ্রহণকারীদের সহযোগী ও সাহায্যকারী। কিন্তু কাফেরদের সহযোগী ও সাহায্যকারী কেউ নেই।[১৬]

কল্যাণ লাভ করলো তাহলে ভুল বুঝছে। প্রকৃত সত্য হলো যারা শাহাদাতলাভ করলো তাদের নিজেদের জন্যও এটি লোকসানের নয় লাভের বাণিজ্য।

১১. এটিই সেই মুনাফা যা আল্লাহর পথে জীবনদানকারীরা লাভ করবে তাদের তিনটি মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। এক, আল্লাহ তাদের পথপ্রদর্শন করবেন। দুই, তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেবেন। তিন, তিনি তাদেরকে সেই বেহেশতে প্রবেশ করাবেন যার সম্পর্কে তিনি পূর্বেই তাদের অবহিত করেছেন। এখানে পথপ্রদর্শনের অর্থ স্পষ্টত জান্নাতের দিকে পথপ্রদর্শন করা। অবস্থা সংশোধন করার অর্থ জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উপহার হিসেবে প্রদত্ত পোশাকে সজ্জিত করে সেখানে নিয়ে যাবেন এবং পার্থিব জীবনে যেসব কলুষ কালিমা তাদের লেগেছিল তা বিদূরিত করবেন। আর তৃতীয় মর্যাদাটির অর্থ হচ্ছে কুরআন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জবানীতে তাদেরকে ইতিপূর্বেই দুনিয়াতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴿١٢﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾

২ রুকূ'

আল্লাহ ঈমান গ্রহণকারী ও সৎকর্মশীলদের সে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বয়ে যায়। আর কাফেররা দুনিয়ার ক'দিনের জীবনের মজা লুটছে, জন্তু-জানোয়ারের মত পানাহার করছে।[১৭] *ওদের চূড়ান্ত ঠিকানা জাহান্নাম।*

হে নবী, অতীতের কত জনপদ তো তোমার সে জনপদ থেকে অধিক শক্তিশালী ছিল, যারা তোমাকে বের করে দিয়েছিল। আমি তাদের এমনভাবে ধ্বংস করেছি যে, তাদের কোন রক্ষাকারী ছিল না।[১৮]

জন্য যে জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন তা কেমন। তারা যখন সে জান্নাতে গিয়ে পৌঁছবে তখন সম্পূর্ণরূপে নিজেদের পরিচিত জিনিসের মধ্যে প্রবেশ করবে। তারা তখন জানতে পারবে, তাদেরকে যে জিনিস দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল ঠিক তাই তাদের দেয়া হয়েছে। তাতে সামান্যতম পার্থক্যও নেই।

১২. আল্লাহকে সাহায্য করার একটা সাদামাঠা অর্থ হচ্ছে তার বাণী ও বিধানকে সমুন্নত করার জন্যে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করতে হবে। কিন্তু এর একটি গূঢ় দুর্বোধ্য অর্থও আছে। আমরা ইতিপূর্বে তার ব্যাখ্যা করেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আলে ইমরানের ব্যাখ্যা, টীকা ৫০)

১৩. মূল কথাটি হলো فَتَعْسًا لَّهُمْ । تعس অর্থ হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়া।

১৪. অর্থাৎ তারা নিজেদের প্রাচীন জাহেলী ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি ও নৈতিক বিকৃতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং তাদেরকে সোজা পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ যে শিক্ষা নাযিল করেছেন তা অপছন্দ করেছে।

১৫. এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, এসব কাফেররা যে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছিল এখন যে কাফেররা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত মানছে না তাদের জন্যও ঠিক অনুরূপ শাস্তি নির্ধারিত হয়ে আছে। অন্য একটি অর্থ হচ্ছে, শুধু দুনিয়ার আযাব দ্বারাই তাদের ধ্বংসের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। আখেরাতেও তাদের জন্য এ ধ্বংস নির্ধারিত হয়ে আছে।

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُم ﴿١٤﴾ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَآ أَنْهَٰرٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَٰرٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَٰلِدٌ فِى ٱلنَّارِ وَسُقُوا۟ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿١٥﴾

এমনকি কখনো হয়, যে ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট হিদায়াতের ওপর আছে সে ঐ সব লোকের মত হবে যাদের মন্দ কাজকর্মকে সুদৃশ্য বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে গিয়েছে?[১৭] মুত্তাকীদের জন্য যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার অবস্থা এই যে, তার মধ্যে স্বচ্ছ ও নির্মল পানির নহর বইতে থাকবে।[২০] এমন সব দুধের নহর বইতে থাকবে যার স্বাদে সামান্য কোন পরিবর্তন বা বিকৃতিও আসবে না,[২১] শরাবের এমন নহর বইতে থাকবে পানকারীদের জন্য যা হবে অতীব সুস্বাদু[২২] এবং বইতে থাকবে স্বচ্ছ মধুর নহর।[২৩] এ ছাড়াও তাদের জন্য সেখানে থাকবে সব রকমের ফল এবং তাদের রবের পক্ষ থেকে থাকবে ক্ষমা।[২৪] (যে ব্যক্তি এ জান্নাত লাভ করবে সেকি) ঐ ব্যক্তির মত হতে পারে যে চিরদিন জাহান্নামে থাকবে, যাদের এমন গরম পানি পান করানো হবে যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে?

১৬. ওহুদ যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আহত হয়ে কয়েকজন সাহাবীর সাথে পাহাড়ের এক গুহায় অবস্থান করছিলেন তখন আবু সুফিয়ান চিৎকার করে বললো : لَنَا عُزَّىٰ وَلَا عُزَّىٰ لَكُمْ "আমাদের আছে উয্যা দেবতা, তোমাদের তো উয্যা নেই।" তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের বললেন : তাকে জবাব দাও اَللّٰهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَىٰ لَكُمْ "আমাদের পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী আল্লাহ কিন্তু তোমাদের কোন পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী নেই।" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ জবাবটি এ আয়াত থেকেই গৃহীত।

১৭. অর্থাৎ জীবজন্তু যেভাবে খায় অথচ আদৌ চিন্তা করে না যে, এ রিযিক কোথা থেকে এসেছে, কে তা তৈরী করেছে এবং এ রিযিকের সাথে সাথে তার ওপর

রিযিকদাতার কি কি অধিকার বর্তাচ্ছে? ঠিক তেমনি এসব লোকও শুধু খেয়ে চলেছে। চরে বেড়ানোর অধিক আর কোন জিনিসই তাদের চিন্তায় নেই।

১৮. মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে বড় দুঃখ ছিল। তিনি যখন হিজরত করতে বাধ্য হলেন তখন শহরের বাইরে গিয়ে তিনি শহরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "হে মক্কা! আল্লাহর কাছে তুমি দুনিয়ার সব শহরের চেয়ে প্রিয়। আর আল্লাহর সমস্ত শহরের মধ্যে আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসি। যদি মুশরিকরা আমাকে বের করে না দিতো তাহলে আমি কখনো তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।" এ কারণে বলা হয়েছে যে, তোমাকে বহিষ্কার করে মক্কাবাসীরা মনে করছে যে, তারা বড় রকমের সফলতা লাভ করেছে। অথচ এ আচরণের দ্বারা তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে। আয়াতটির বাচনভঙ্গি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে, তা অবশ্যম্ভাবী রূপে হিজরতের পরপরই নাযিল হয়ে থাকবে।

১৯. অর্থাৎ এটা কি কিরে সম্ভব যে, নবী এবং তাঁর অনুসারীগণ যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট ও সোজা পথ লাভ করেছেন এবং পূর্ণ দূরদৃষ্টির আলোকে তাঁরা তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তখন সেসব লোকদের সাথে চলবেন যারা পুরনো জাহেলিয়াতকে আঁকড়ে ধরে আছে, যারা নিজেদের গোমরাহীকে হিদায়াত এবং কুকর্মকে উত্তম মনে করছে এবং যারা কোন যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে নয়, বরং নিজেদের প্রবৃত্তির ইচ্ছানুসারে কোন্‌টি হক এবং কোন্‌টি বাতিল তার ফায়সালা করে থাকে। তাই এ দুই গোষ্ঠীর জীবন এখন দুনিয়াতে যেমন এক রকম হতে পারে না, তেমনি আখেরাতেও তাদের পরিণাম এক রকম হতে পারে না।

২০. মূল বাক্যাংশ হচ্ছে مَاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ । اسن বলা হয় এমন পানিকে যার স্বাদ ও বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে অথবা যার মধ্যে কোনভাবে গন্ধ সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণত পৃথিবীর সমুদ্র ও নদীর পানি ঘোলা হয়ে থাকে। তার সাথে বালু, মাটি এবং মাঝে মধ্যে নানা রকম উদ্ভিদরাজি মিশে যাওয়ার কারণে বর্ণ ও স্বাদ পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তাতে কিছু না কিছু দুর্গন্ধও সৃষ্টি হয়। তাই জান্নাতের সমুদ্র ও নদীসমূহের পানির পরিচয় দেয়া হয়েছে এই যে, তা হবে غير اسن অর্থাৎ নির্ভেজাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পানি। তার মধ্যে কোন প্রকার সংমিশ্রণ থাকবে না।

২১. মারফূ' হাদীসে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এই যে, "তা পশুর বাঁট বা স্তন থেকে নির্গত দুধ হবে না।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ দুধ ঝর্ণার আকারে মাটি থেকে বের করবেন এবং নদীর আকারে প্রবাহিত করবেন। পশুর পালান বা বাঁট থেকে দোহন করে তারপর জান্নাতের নদীসমূহে ঢেলে প্রবাহিত করা হবে এমন নয়। এ কুদরতী দুধের পরিচয়ে বলা হয়েছে, "তার স্বাদে কোন পরিবর্তন আসবে না" অর্থাৎ পশুর পালান থেকে নির্গত দুধে যে এক ধরনের গন্ধ থাকে, তার লেশমাত্রও এতে থাকবে না।

২২. মারফূ' হাদীসে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এই যে, "পদদলন বা মাড়ানো দ্বারা ঐ শরাব নির্গত হবে না" অর্থাৎ সে শরাব দুনিয়ার সাধারণ মদের মত ফল পঁচিয়ে পায়ে মাড়িয়ে নির্গত করা হবে না। বরং এটাও আল্লাহ তা'আলা ঝর্ণার আকারে সৃষ্টি করবেন এবং নদী-নালার আকারে প্রবাহিত করবেন। এর পরিচয় দিতে গিয়ে আরো বলা হয়েছে,

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾

তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা মনযোগ দিয়ে তোমার কথা শোনে এবং যখন তোমার কাছ থেকে চলে যায় তখন যাদেরকে জ্ঞানের নিয়ামত দান করা হয়েছে তাদের জিজ্ঞেস করে যে, এই মাত্র তিনি কি বললেন?[২৫] এরাই সেসব লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে গিয়েছে।[২৬]

"তা হবে পানকারীদের জন্য অতীব সুস্বাদু।" অর্থাৎ তা দুনিয়ার মদের মত তীব্র এবং গন্ধযুক্ত হবে না। দুনিয়ার মদ তো এমন যে, যত বড় অভ্যস্ত মদখোরই তা পান করুক, মুখ বিকৃত না করে পান করতে পারে না।

সূরা সাফ্‌ফাতে এর আরো পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে যে, তা পান করায় শরীরের কোন ক্ষতিও হবে না এবং বুদ্ধি বিভ্রমও ঘটবে না। (আয়াত ৪৭) সূরা ওয়াকিআতে বলা হয়েছে যে, তার কারণে মাথাও ধরবে না কিংবা ব্যক্তির বিবেকও লুপ্ত হবে না। (আয়াত ১৯) এ থেকে জানা গেল যে, তা মাদকতাপূর্ণ হবে না, বরং শুধু স্বাদ ও আনন্দই দান করবে।

২৩. মারফূ' হাদীসে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এই যে, তা মৌমাছির পেট থেকে নির্গত মধু হবে না অর্থাৎ ঐ মধুও ঝর্ণা থেকে নির্গত হবে এবং নদী–নালায় প্রবাহিত হবে। সুতরাং তার মধ্যে মোম, মৌচাকের টুকরা এবং মৃত মৌমাছির পা মিশে থাকবে না। বরং তা হবে নিখাদ ও নির্ভেজাল মধু।

২৪. জান্নাতের এসব নিয়ামতের উল্লেখের পর আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার উল্লেখ করার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, এসব নিয়ামতের চেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেবেন। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, পৃথিবীতে তাদের দ্বারা যেসব ত্রুটি–বিচ্যুতি হয়েছিল জান্নাতে তাদের সামনে কখনো তার উল্লেখ পর্যন্ত করা হবে না। বরং যাতে তারা জান্নাতে লজ্জিত না হন সে জন্য আল্লাহ তাদের ঐ সব ত্রুটি–বিচ্যুতির ওপর চিরদিনের জন্য পর্দা টেনে দেবেন।

২৫. কাফের, মুনাফিক ও আহলে কিতাবদের মধ্যকার যেসব আল্লাহদ্রোহী ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে এসে বসতো, তাঁর বাণী ও নির্দেশাবলী এবং কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ শুনতো তাদের সম্পর্কেই একথা বলা হয়েছে। নবীর (সা) পবিত্র মুখ থেকে যেসব বিষয়ে কথাবার্তা উচ্চারিত হতো তার সাথে তাদের যেহেতু

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ﴿١٨﴾ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿١٩﴾

আর যারা হিদায়াত লাভ করেছে আল্লাহ তাদেরকে আরো অধিক হিদায়াত দান করেন।[২৭] এবং তাদেরকে তাদের অংশের তাকওয়া দান করেন।[২৮] এখন কি এসব লোক শুধু কিয়ামতের জন্যই অপেক্ষা করছে যে, তা তাদের ওপর অকস্মাৎ এসে পড়ুক।[২৯] তার আলামত তো এসে গিয়েছে।[৩০] যখন কিয়ামতই এসে যাবে তখন তাদের জন্য উপদেশ গ্রহণের আর কি অবকাশ থাকবে?

অতএব, হে নবী! ভাল করে জেনে নাও, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদাতের যোগ্য নয়। নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। এবং মু'মিন নারী ও পুরুষদের জন্যও।[৩১] আল্লাহ তোমাদের তৎপরতা সম্পর্কে অবহিত এবং তোমাদের ঠিকানা সম্পর্কেও অবহিত।

দূরতম সম্পর্কও ছিল না, তাই তারা সবকিছু শুনেও যেন শুনতো না। এ কারণে বাইরে এসেই মুসলমানদের জিজ্ঞেস করতো, এই মাত্র তিনি কি যেন বল্‌ছিলেন?

২৬. তাদের অন্তরের কান যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী শোনার ব্যাপারে বধির হয়ে গিয়েছিলো। এটিই ছিল তার প্রকৃত কারণ। তারা ছিল নিজেদের প্রবৃত্তির দাস। অথচ নবী (সা) যেসব শিক্ষা পেশ করছিলেন তা ছিল তাদের প্রবৃত্তির দাবীর পরিপন্থী। তাই যদিও কোন সময় তারা নবীর (সা) মজলিসে এসে তাঁর কথা শোনার ভান করলেও আসলে তাদের ঝুলিতে কিছুই পড়তো না।

২৭. অর্থাৎ সে একই কথা যা হিদায়াত প্রাপ্ত লোকদের জন্য আরো হিদায়াতের কারণ হতো। অথচ তা শুনে কাফের ও মুনাফিকরা জিজ্ঞেস করতো যে, একটু আগে তিনি কি বলেছেন? যে মজলিস থেকে এ দুর্ভাগারা অযথা সময় নষ্ট করে উঠে যেতো, এ সৌভাগ্যবানরা সে মজলিস থেকেই জ্ঞানের এক নতুন ভাণ্ডার ভরে নিয়ে যেতো।

২৮. অর্থাৎ তারা নিজেদের মধ্যে যে তাকওয়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সে তাওফীকই দান করেন।

২৯. অর্থাৎ ন্যায় ও সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরার কাজটি তো যুক্তি–প্রমাণ, কুরআনের অলৌকিক বর্ণনা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন দ্বারা অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন পন্থায় করা

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ
وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ
إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٠﴾ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ
مَعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿٢١﴾
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ'

যারা ঈমান আনয়ন করেছে তারা বলছিলো, এমন কোন সূরা কেন নাযিল করা হয় না (যাতে যুদ্ধের নির্দেশ থাকবে)? কিন্তু যখন সুস্পষ্ট নির্দেশ সম্বলিত সূরা নাযিল করা হলো এবং তার মধ্যে যুদ্ধের কথা বলা হলো তখন তোমরা দেখলে, যাদের মনে রোগ ছিল তারা তোমার প্রতি সে ব্যক্তির মত তাকাচ্ছে যার ওপর মৃত্যু চেপে বসেছে।[৩২] তাদের এ অবস্থার জন্য আফসোস (তাদের মুখে) আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি এবং ভাল ভাল কথা। কিন্তু যখন অলংঘনীয় নির্দেশ দেয়া হলো তখন যদি তারা আল্লাহর সাথে কৃত নিজেদের অঙ্গীকারের ব্যাপারে সত্যবাদী প্রমাণিত হতো তাহলে তা তাদের জন্যই কল্যাণকর হতো। এখন তোমাদের থেকে এ ছাড়া অন্য কিছুর কি আশা করা যায় যে, তোমরা যদি ইসলাম থেকে ফিরে যাও[৩৩] তাহলে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং একে অপরের গলা কাটবে?[৩৪]

হয়েছে। এখন ঈমান আনার জন্য এসব লোক কি কিয়ামতকে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে দেখে নেয়ার অপেক্ষা করছে?

৩০. কিয়ামতের আলামত বলতে সেসব আলামতকে বুঝানো হয়েছে যা দ্বারা প্রকাশ পায় যে, এখন কিয়ামতের আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলামত হচ্ছে আল্লাহর শেষ নবীর আগমন যার পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবে না। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আনাস, হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী এবং হযরত বুরাইদা বর্ণিত হাদীসসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা অংগুলি উঠিয়ে বললেন : بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ "আমার আগমন ও কিয়ামত এ দু' অঙ্গুলির মত।" অর্থাৎ দু'টি আংগুলের মধ্যে যেমন আর কোন আংগুল নেই তেমনি আমার ও কিয়ামতের মাঝে আর কোন নবী পাঠানো হবে না। আমার পরে এখন শুধু কিয়ামতেরই আগমন ঘটবে।

৩১. ইসলাম মানুষকে যেসব নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছে তার একটি হচ্ছে বান্দা তার প্রভুর বন্দেগী ও ইবাদাত করতে এবং তাঁর দীনের জন্য জীবনপাত করতে নিজের পক্ষ থেকে যত চেষ্টা–সাধনাই করুক না কেন, তার মধ্যে এমন ধারণা কখনো আসা উচিত নয় যে, তার যা করা উচিত ছিল তা সে করেছে। তার বরং মনে করা উচিত যে, তার ওপর তার মালিকের যে দাবী ও অধিকার ছিল তা সে পালন করতে পারেনি। তার উচিত সবসময় দোষ–ত্রুটি স্বীকার করে আল্লাহর কাছে এ দোয়া করা যে, তোমার কাছে আমার যে ত্রুটি–বিচ্যুতি ও অপরাধ হয়েছে তা ক্ষমা করে দাও। "হে নবী, তোমার ত্রুটি–বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো" আল্লাহর এ আদেশের অর্থ এ নয় যে, নবী (সা) জেনে বুঝে প্রকৃতই কোন অপরাধ করেছিলেন। নাউযুবিল্লাহ! বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর সমস্ত বান্দার মধ্যে যে বান্দা তার রবের বন্দেগী বেশী করে করতেন নিজের এ কাজের জন্য তাঁর অন্তরেও গর্ব ও অহংকারের লেশমাত্র প্রবেশ করতে পারেনি। তাঁর মর্যাদাও ছিল এই যে, নিজের এ মহামূল্যবান খেদমত সত্ত্বেও তাঁর প্রভুর সামনে নিজের অপরাধ স্বীকারই করেছেন। এ অবস্থা ও মানসিকতার কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় বেশী বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আবু দাউদ, নাসায়ী এবং মুসনাদে আহমাদের বর্ণিত হাদীসে নবীর (সা) এ উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে যে, "আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে একশ' বার ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকি।"

৩২. অর্থাৎ সে সময় মুসলমানরা যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলো এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে কাফেরদের যে আচরণ ছিল তার কারণে যুদ্ধের নির্দেশ আসার পূর্বেই মুসলমানদের সাধারণ মতামত ছিল এই যে, এখন আমাদের যুদ্ধের অনুমতি পাওয়া উচিত। তারা ব্যাকুল চিত্তে আল্লাহর নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিলো এবং বার বার জানতে চাচ্ছিলো যে, এ জালেমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে লড়াই করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না কেন? কিন্তু যারা মুনাফিকীর আবরণে মুসলমানদের দলে শামিল হয়েছিল। তাদের অবস্থা ছিল মু'মিনদের অবস্থা থেকে ভিন্ন। তারা তাদের প্রাণ ও অর্থ–সম্পদকে আল্লাহ ও তাঁর দীনের চেয়ে অনেক বেশী প্রিয় মনে করতো এবং সে ক্ষেত্রে কোন রকম বিপদের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল না। যুদ্ধের নির্দেশ আসা মাত্রই তাদেরকে এবং খাঁটি ঈমানদারদেরকে বাছাই করে পরস্পর থেকে আলাদা করে দিন। এ নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তাদের ও ঈমানদারদের মধ্যে বাহ্যিক কোন পার্থক্য দেখা যেতো না। তারা এবং এরা উভয়েই নামায পড়তো। রোযা রাখতেও তাদের কোন দ্বিধা–সংকোচ ছিল না। ঠাণ্ডা প্রকৃতির ইসলাম তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু যখন ইসলামের জন্য জীবন বাজি রাখার সময় আসলো তখন তাদের মুনাফিকী প্রকাশ হয়ে পড়লো এবং ঈমানের লোক দেখানো যে মুখোশ তারা পরেছিল তা খুলে পড়লো। তাদের এ অবস্থা সূরা নিসায় এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "তোমরা কি সে লোকদের দেখেছো যাদের বলা হয়েছিলো, নিজের হাতকে সংযত রাখো, নামায কায়েম করো এবং যাকাত দাও। এখন তাদেরকে যখন যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তখন তাদের এক দলের অবস্থা এই যে, মানুষকে এমন ভয় পাচ্ছে যে ভয় আল্লাহকে করা উচিত। বরং তার চেয়েও বেশী ভয় পাচ্ছে। তারা বলছে ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে যুদ্ধের এ নির্দেশ কেন দিলে? আমাদেরকে আরো কিছু অবকাশ দিলে না কেন?" (আয়াত ৭৭)

৩৩. মূল কথাটি হলো اِنْ تَوَلَّيْتُمْ । এ বাক্যাংশের একটি অনুবাদ আমরা ওপরে করেছি। এর দ্বিতীয় অনুবাদ হচ্ছে, "যদি তোমরা মানুষের শাসক হয়ে যাও।"

৩৪. একথাটির একটি অর্থ হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ঈমানদারগণ যে মহান সংস্কারমূলক বিপ্লবের জন্য চেষ্টা–সাধনা করছেন এ সময় তোমরা যদি ইসলামের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে টালবাহানা করো এবং সে মহান সংস্কারমূলক বিপ্লবের জন্য প্রাণ ও সম্পদের বাজি ধরা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে শেষ পর্যন্ত তার পরিণাম এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, তোমরা আবার সেই জাহেলী জীবন ব্যবস্থার দিকে ফিরে যাবে যার ব্যবস্থাধীনে তোমরা শত শত বছর ধরে একে অপরের গলা কেটেছো, নিজেদের সন্তানদের পর্যন্ত জীবন্ত দাফন করেছো এবং আল্লাহর দুনিয়াকে জুলুম ও ফাসাদে ভরে তুলেছো। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমাদের জীবনাচার ও কর্মকাণ্ডের অবস্থা যখন এই যে, যে দীনের প্রতি ঈমান পোষণের কথা তোমরা স্বীকার করেছিলে তার জন্য তোমাদের মধ্যে কোন আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা নেই এবং তার জন্য কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতেও তোমরা প্রস্তুত নও। তাহলে এ নৈতিক অবস্থার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা যদি তোমাদেরকে ক্ষমতা দান করেন এবং পার্থিব সব কাজ–কর্মের দায়–দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পিত হয় তাহলে জুলুম–ফাসাদ এবং ভ্রাতৃঘাতি কাজ ছাড়া তোমাদের থেকে আর কি আশা করা যেতে পারে?

এ আয়াতটি একথাও স্পষ্ট করে দেয় যে, আয়াত ইসলামে 'আত্মীয়তার বন্ধন' ছিন্ন করা হারাম। অপরদিকে ইতিবাচক পন্থায় কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে আত্মীয়–স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহারকে বড় নেকীর কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, আল বাকারা, ৮৩; ১৭৭; আন নিসা, ৮–৩৬; আন নাহল, ৯০; বনী ইসরাইল, ২৬ এবং আন নূর, ২২ আয়াত। رحم শব্দটি আরবী ভাষায় রূপক অর্থে নৈকট্য ও আত্মীয়তা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কোন ব্যক্তির দূর ও নিকট সম্পর্কীয় সব আত্মীয়ই তার ذوى الارحام । তাদের যার সাথে যত নিকট আত্মীয়তার সম্পর্ক তার অধিকার তত বেশী এবং তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা তত বড় গোনাহ। অত্মীয়তা রক্ষা করার অর্থ হলো, আত্মীয়ের উপকার করার যতটুকু সামর্থ ব্যক্তির আছে তা করতে দ্বিধা না করা। আর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তির তার সাথে খারাপ ব্যবহার বা আচরণ করা, অথবা যে উপকার করা তার পক্ষে সম্ভব তা না করে পাশ কাটিয়ে চলা। হযরত উমর (রা) এ আয়াত থেকে প্রমাণ পেশ করে "উম্মে ওয়ালাদ" বা সন্তানের মা ক্রীতদাসীকে বিক্রি করা হারাম ঘোষণা করেছিলেন এবং সাহাবা কিরামের সবাই এতে ঐকমত্য প্রকাশ করেছিলেন। হাকেম মুসতাদরিক গ্রন্থে হযরত বুরাইদা থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, একদিন তিনি হযরত উমরের (রা) মজলিসে বসেছিলেন। হঠাৎ মহল্লার মধ্যে চেঁচামেচি শুরু হলো। জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে, এক ক্রীতদাসীকে বিক্রি করা হচ্ছে তাই তাঁর মেয়ে কাঁদছে। হযরত উমর (রা) সে মুহূর্তেই আনসার ও মুহাজিরদের একত্র করে তাদের জিজ্ঞেস করলেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন তার মধ্যে আত্মীয়তা বা রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কোন বৈধতা কি আপনারা পেয়েছেন? সবাই জবাব দিলেন, 'না।' হযরত উমর (রা) বললেন ঃ তাহলে এটা

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ
الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ
فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

আল্লাহ তা'আলা এসব লোকের ওপর লা'নত করেছেন এবং তাদেরকে অন্ধ ও বধির বানিয়ে দিয়েছেন। তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনি, নাকি তাদের মনের ওপর তালা লাগানো আছে?[৩৫] প্রকৃত ব্যাপার হলো, হিদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার পরও যারা তা থেকে ফিরে গেল শয়তান তাদের জন্য এরূপ আচরণ সহজ বানিয়ে দিয়েছে এবং মিথ্যা আশাবাদকে দীর্ঘায়িত করে রেখেছে। এ কারণেই তারা আল্লাহর নাযিলকৃত দীনকে যারা পছন্দ করে না তাদের বলেছে, কিছু ব্যাপারে আমরা তোমাদের অনুসরণ করবো।[৩৬] আল্লাহ তাদের এ সলা-পরামর্শ ভাল করেই জানেন। সে সময় কি অবস্থা হবে যখন ফেরেশতারা তাদের রূহ কবজ করবে এবং তাদের মুখ ও পিঠের ওপর আঘাত করতে করতে নিয়ে যাবে।[৩৭] এসব হওয়ার কারণ হচ্ছে, তারা এমন পন্থার অনুসরণ করেছে যা আল্লাহর অসন্তুষ্টি উৎপাদন করে এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করা পছন্দ করেনি। এ কারণে তিনি তাদের সব কাজ-কর্ম নষ্ট করে দিয়েছেন।[৩৮]

কেমন কথা যে, আপনাদের এ সমাজেই মাকে তার মেয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে? এর চেয়ে বড় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নের কাজ আর কি হতে পারে? তারপর তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। সবাই বললো ত্রুটি রোধ করার জন্য আপনার মতে যে ব্যবস্থা উপযুক্ত মনে করেন তাই গ্রহণ করুন। সুতরাং হযরত উমর (রা) গোটা ইসলামী অঞ্চলে এই সাধারণ নির্দেশ জারী করে দিলেন, যে দাসীর গর্ভে তার মালিকের ঔরসজাত সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে তাকে বিক্রি করা যাবে না। কারণ, এটা আত্মীয়তা বা রক্তের বন্ধন ছিন্ন করা। সুতরাং এ কাজ হালাল নয়।

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

৪ রুকূ'

যেসব লোকের মনে রোগ আছে তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আল্লাহ তাদের মনের ঈর্ষা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করবেন না? আমি চাইলে তাদেরকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দিতাম আর তুমি তাদের চেহারা দেখেই চিনতে পারতে। তবে তাদের বাচনভঙ্গি থেকে তুমি তাদেরকে অবশ্যই চিনে ফেলবে। আল্লাহ তোমাদের সব আমল ভাল করেই জানেন। আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবো যাতে আমি তোমাদের অবস্থা যাঁচাই করে দেখে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী এবং কে ধৈর্যশীল।

যারা কুফরী করেছে, আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে এবং তাদের সামনে সঠিক পথ স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর রসূলের সাথে বিরোধ করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং আল্লাহই তাদের সব কৃতকর্ম ধ্বংস করে দিবেন।[৩৯] হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের আমল ধ্বংস করো না।[৪০]

৩৫. অর্থাৎ হয় এসব লোক কুরআন মজীদ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে না। কিংবা চিন্তা-ভাবনা করার চেষ্টা করে কিন্তু তার শিক্ষা এবং অর্থ ও তাৎপর্য তাদের মনের গভীরে প্রবেশ করে না। কেননা, তাদের হৃদয়-মনে তালা লাগানো আছে। বলা হয়েছে, "মনের ওপরে তাদের তালা লাগানো আছে" একথার অর্থ হচ্ছে, তাদের মনে এমন তালা লাগানো আছে যা ন্যায় ও সত্যকে চিনে না এমন লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট।

৩৬. অর্থাৎ ঈমান গ্রহণ করে মুসলমানদের দলে শামিল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ভিতরে ভিতরে তারা ইসলামের শত্রুদের সাথে ষড়যন্ত্র করে এসেছে এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে যে, কিছু কিছু ব্যাপারে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করবো।

৩৭. অর্থাৎ পৃথিবীতে তারা এ কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে এ জন্য যাতে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে এবং কুফর ও ইসলামের যুদ্ধের বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর পরে আল্লাহর পাকড়াও থেকে কোথায় গিয়ে রক্ষা পাবে? সে সময় তাদের কোন কৌশলই তাদেরকে ফেরেশতাদের মারের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

যেসব আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে 'বরযখ' অর্থাৎ কবরের আযাব প্রমাণিত হয় এটি তার একটি। এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, মৃত্যুর সময় থেকেই কাফের ও মুনাফিকদের আযাব শুরু হয়ে যায়। কিয়ামতে তাদের মোকদ্দমার ফায়সালা হওয়ার পর যে শাস্তি দেয়া হবে এ আযাব তা থেকে ভিন্ন জিনিস। আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন আন নিসা, ৯৭ আয়াত; আল আনআম, ৯৩-৯৪; আল আনফাল, ৫০; আন্ নাহল, ২৮-৩২; আল মু'মিনূন। ৯৯-১০০; ইয়াসীন ২৬-২৭ এবং টীকা ২২-২৩ এবং আল মু'মিন ৪৬, টীকা ৬২ সহ।

৩৮. কাজ-কর্ম অর্থ সেসব কাজ যা তারা মুসলমান সেজে করেছে। তাদের নামায, রোযা, যাকাত মোটকথা সেসব ইবাদাত-বন্দেগী ও নেকীর কাজসমূহ যা বাহ্যিকভাবে নেকীর কাজ বলে গণ্য হতো। এসব নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে তারা মুসলমান হয়েও আল্লাহ, তার দীন এবং ইসলামী মিল্লাতের সাথে আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার আচরণ করেনি বরং শুধু নিজের পার্থিব স্বার্থের জন্য দীনের দুশমনদের সাথে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদের সুযোগ আসা মাত্রই নিজেকে বিপদ থেকে রক্ষা করার চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কুফর ও ইসলামের যুদ্ধে যে ব্যক্তির সমবেদনা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে নয়। কিংবা কুফরী ব্যবস্থা ও কাফেরদের পক্ষে আল্লাহর কাছে তার কোন আমল গ্রহণযোগ্য হওয়া তো দূরের কথা তার ঈমানই আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৯. এ আয়াতাংশের দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হলো, নিজেদের বিবেচনায় তারা যেসব কাজ-কর্মকে নেকীর কাজ মনে করে আঞ্জাম দিয়েছে আল্লাহ তা সবই ধ্বংস করে দিবেন এবং তার জন্য তারা আখেরাতেও কোন পারিশ্রমিক পাবে না। অন্য অর্থটি হচ্ছে তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দীনের পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য যেসব কৌশল অবলম্বন করছে তা সবই ব্যর্থ ও নিষ্ফল হয়ে যাবে।

৪০. অন্য কথায় আমলসমূহের কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ হওয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্যের ওপর। আনুগত্য থেকে ফিরে যাওয়ার পর কোন আমলই আর নেক আমল থাকে না। তাই এ ধরনের ব্যক্তি সে আমলের জন্য প্রতিদানলাভের উপযুক্তও হতে পারে না।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾ هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ﴿٣٨﴾

কুফর অবলম্বনকারী, আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টিকারী এবং কুফরীসহ, মৃত্যুবরণকারীকে আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না। তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং সন্ধির জন্য আহবান করো না।[৪১] তোমরাই বিজয়ী থাকবে। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। তিনি তোমাদের আমল কখনো নষ্ট করবেন না। দুনিয়ার এ জীবন তো খেল তামাশা মাত্র।[৪২] তোমরা যদি ঈমানদার হও এবং তাকওয়ার পথে চলতে থাক তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের ন্যায্য প্রতিদান অবশ্যই দিবেন। আর তিনি তোমাদের সম্পদ চাইবেন না।[৪৩] তিনি যদি কখনো তোমাদের সম্পদ চান এবং সবটাই চান তাহলে তোমরা কৃপণতা করবে এবং তিনি তোমাদের ঈর্ষা পরায়ণতা প্রকাশ করে দিবেন।[৪৪] দেখো, তোমাদেরকে আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে আহবান জানানো হচ্ছে অথচ তোমাদের মধ্যকার কিছু লোক কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করে তারা প্রকৃতপক্ষে নিজের সাথেই কৃপণতা করছে। আল্লাহ তো অভাব শূন্য। তোমরাই তার মুখাপেক্ষী। তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আল্লাহ তোমাদের স্থানে অন্য কোন জাতিকে নিয়ে আসবেন। তারা তোমাদের মত হবে না।

৪১. এখানে এ বিষয়টি মনে রাখা দরকার যে, এমন এক সময় একথাটি বলা হয়েছিল যখন মদীনার ক্ষুদ্র জনপদে মুহাজির ও আনসারদের একটি ক্ষুদ্র দল ইসলামের

পতাকা বহন করছিলো। তাদেরকে শুধু কুরাইশদের মত শক্তশালী গোত্রের মোকাবিলা করতে হচ্ছিলো না বরং গোটা আরবের কাফের ও মুশরিকদের মোকাবিলা করতে হচ্ছিলো। এমন এক পরিস্থিতিতে বলা হচ্ছে সাহস হারিয়ে এ দুশমনদের সন্ধির আহবান জানাবে না, বরং জীবন বাজি রাখার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। মুসলমানরা কোন সময়ই সন্ধির জন্য আলোচনা করবে না একথার অর্থ তা নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে এমন পরিস্থিতিতে সন্ধির আলোচনা করা ঠিক নয় যখন তার অর্থ দাঁড়াবে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করা। এবং তাতে শত্রু আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। মুসলমানদের উচিত প্রথমে নিজেদের শক্তিমত্তা দেখিয়ে দেয়া। এরপর সন্ধির জন্য আলোচনা করলে কোন ক্ষতি নেই।

৪২. অর্থাৎ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার অবস্থা কয়েকদিনের মনভুলানোর চেয়ে অধিক কিছু নয়। এখানকার সফলতা ও বিফলতা সত্যিকার ও স্থায়ী কোন কিছু নয় যা গুরুত্বের দাবী রাখে। প্রকৃত জীবন হচ্ছে আখেরাতের জীবন। সে জীবনের সফলতার জন্য মানুষের চিন্তা–ভাবনা করা উচিত। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনকাবুত, টীকা ১০২)

৪৩. অর্থাৎ তিনি অভাব শূন্য। তাঁর নিজের জন্য তোমাদের থেকে নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি যদি তোমাদেরকে তার পথে কিছু ব্যয় করতে বলেন, তা নিজের জন্য বলেন না, বরং তোমাদেরই কল্যাণের জন্য বলেন।

৪৪. অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে এত বড় পরীক্ষায় ফেলেন না যা থেকে তোমাদের দুর্বলতাই শুধু প্রকাশ পেতো।

আল ফাতহ্

৪৮

নামকরণ

সূরার একেবারে প্রথম আয়াতের إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا বাক্যাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। এটি এ সূরার শুধু নামই নয় বরং বিষয়বস্তু অনুসারে এর শিরোনামও। কেননা, আল্লাহ তা'আলা হুদাইবিয়ার সন্ধির আকারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদেরকে যে মহান বিজয় দান করেছিলেন এতে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

৬ষ্ঠ হিজরীর যুল–কা'দা মাসে মক্কার কাফেরদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনার দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন সে সময় এ সূরাটি নাযিল হয়। এ ব্যাপারে সমস্ত রেওয়ায়াত একমত।

ঐতিহাসিক পটভূমি

যেসব ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরাটি নাযিল হয়েছিল তার সূচনা হয়েছিলো এভাবে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন স্বপ্নে দেখলেন, তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে পবিত্র মক্কা নগরীতে গিয়ে উমরা আদায় করেছেন। নবীর স্বপ্ন নিছক স্বপ্ন এবং কল্পনা হতে পারে না। বরং তা এক প্রকার অহী। পরবর্তী ২৭ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজেও একথা অনুমোদন করেছেন যে, তিনিই তাঁর রসূলকে এ স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। তাই প্রকৃতপক্ষে এটি নিছক স্বপ্ন ছিল না, বরং মহান আল্লাহর ইংগিত ছিল যার অনুসরণ নবীর (সা) জন্য জরুরী ছিল।

বাহ্যিক কার্যকারণ অনুসারে এ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা কোনভাবেই সম্ভব বলে মনে হচ্ছিলো না। কাফের কুরাইশরা ৬ বছর যাবত মুসলমানদের জন্য বায়তুল্লাহর পথ বন্ধ করে রেখেছিল এবং এ পুরো সময়টাতে তারা হজ্জ ও উমরাহ আদায়ের জন্য পর্যন্ত কোন মুসলমানকে হারাম এলাকার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। তাই এখন কি করে আশা করা যায় যে, তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহাবীদের একটি দলসহ মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে? উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম সাথে নিয়ে বের হওয়ার অর্থ যুদ্ধ ডেকে আনা এবং নিরস্ত্র হয়ে যাওয়ার অর্থ নিজের ও সংগীদের জীবনকে বিপন্ন করা। এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলার ইংগিত অনুসারে কিভাবে কাজ করা যেতে পারে তা কেউই বুঝে উঠতে পারছিলো না।

কিন্তু নবীর পদমর্যাদাই এই যে, তাঁর রব তাঁকে যে নির্দেশই দান করেন তা তিনি বিনা দ্বিধায় বাস্তবায়িত করেন। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্বপ্নের কথা দ্বিধাহীন চিত্তে সাহাবীদের বললেন এবং সফরের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। আশপাশের গোত্রসমূহের মধ্যেও ব্যাপকভাবে ঘোষণা করলেন, আমরা উমরা আদায়ের জন্য যাচ্ছি। যারা আমাদের সাথে যেতে ইচ্ছুক তারা যেন এসে দলে যোগ দেয়। বাহ্যিক কার্যকারণসমূহের ওপর যাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তারা মনে করলো, এরা মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাদের কেউই তাঁর সাথে যেতে প্রস্তুত হলো না। কিন্তু যারা সত্যি সত্যিই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করতো পরিণাম সম্পর্কে তারা কোন পরোয়াই করছিলো না। তাদের জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, এটা আল্লাহ তা'আলার ইংগিত এবং তাঁর রসূল এ নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। সুতরাং এখন কোন জিনিসই আর তাদেরকে আল্লাহর রসূলকে সহযোগিতা করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম ছিল না। নবীর (সা) সাথে এ বিপজ্জনক সফরে যেতে ১৪শ' সাহাবী প্রস্তুত হলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর যুল-কা'দা মাসের প্রারম্ভে এ পবিত্র কাফেলা মদীনা থেকে যাত্রা করলো। যুল-হুলাইফাতে[১] পৌঁছে সবাই উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন। কুরবানীর জন্য ৭০টি উট সাথে নিলেন। এসব উটের গলায় কুরবানীর চিহ্ন স্বরূপ কিলাদা লটকানো ছিল।

আরবের সর্ব স্বীকৃত নিয়মানুসারে বায়তুল্লাহর যিয়ারতকারীদের জন্য মালপত্রের মধ্যে একখানা তরবারি নেয়ার অনুমতি ছিল। সুতরাং সবাই মালপত্রের মধ্যে একখানা করে তরবারি নিলেন। এ ছাড়া যুদ্ধের আর কোন উপকরণ সংগে নিলেন না। এভাবে তাঁদের এ কাফেলা লাব্বায়কা, লাব্বায়কা ধ্বনি তুলে বায়তুল্লাহ অভিমুখে যাত্রা করলো।

সে সময় মক্কা ও মদীনার মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল আরবের প্রতিটি শিশুও সে সম্পর্কে অবহিত ছিল। এই তো গত বছরই ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে কুরাইশরা বিভিন্ন আরব গোত্রের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে মদীনার ওপর চড়াও হয়েছিল যার কারণে বিখ্যাত আহযাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এত বড় একটা কাফেলা নিয়ে তাঁর রক্তের পিয়াসী শত্রুর নিজ এলাকার দিকে যাত্রা করলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই গোটা আরবের দৃষ্টি এ বিস্ময়কর সফরের প্রতি নিবদ্ধ হলো। সংগে সংগে তারা এও দেখলো যে, এ কাফেলা লড়াই করার জন্য যাত্রা করেনি। বরং পবিত্র মাসে ইহ্‌রাম বেঁধে কুরবানীর উট সাথে নিয়ে একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফের জন্য যাচ্ছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ পদক্ষেপ কুরাইশদেরকে মারাত্মক অসুবিধায় ফেলে দিল। যে পবিত্র মাসগুলোকে শতশত বছর ধরে আরবে হজ্জ ও বায়তুল্লাহর যিয়ারতের জন্য পবিত্র মনে করা হতো যুল-কা'দা মাসটি ছিল তার অন্যতম। যে কাফেলা এ পবিত্র মাসে ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জ অথবা উমরার জন্য যাত্রা করছে তাকে বাধা দেয়ার অধিকার কারো ছিল না। এমনকি কোন গোত্রের সাথে যদি তার শত্রুতা থেকে থাকে তবুও আরবের সর্বজন স্বীকৃত আইন অনুসারে সে তাকে তার এলাকা দিয়ে অতিক্রম করতেও বাধা দিতে পারে না। কুরাইশরা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লো যে, যদি তারা

১। এ স্থানটি মদীনা থেকে মক্কার পথে ৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এর বর্তমান নাম বি'রে আলী। মদীনার হাজীগণ এখান থেকেই হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে থাকেন।

মদীনার এ কাফেলার ওপর হামলা করে মক্কা প্রবেশ করতে বাধা দেয় তাহলে গোটা দেশে হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে। আরবের প্রতিটি মানুষ বলতে শুরু করবে এটা বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। আরবের সমস্ত গোত্র মনে করবে, আমরা খানায়ে কা'বার মালিক মুখতার হয়ে বসেছি। প্রতিটি গোত্রই এ ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে যে, ভবিষ্যতে কাউকে হজ্জ ও উমরা করতে দেয়া না দেয়া আমাদের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। আজ যেমন মদীনার এ যিয়ারতকারীদের বাধা দিচ্ছি তেমনি যাদের প্রতিই আমরা অসন্তুষ্ট হবো ভবিষ্যতে তাদেরকেই বায়তুল্লাহর যিয়ারত করতে বাধা দেব। এটা হবে এমন একটা ভুল যার কারণে সমগ্র আরব আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। অপরদিকে আমরা যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এত বড় কাফেলা নিয়ে নির্বিঘ্নে আমাদের শহরে প্রবেশ করতে দেই তাহলে গোটা দেশের সামনেই আমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিনষ্ট হবে। লোকজন বলবে, আমরা মুহাম্মাদের (সা) ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি। শেষ পর্যন্ত অনেক চিন্তা–ভাবনা ও বিচার–বিবেচনার পর তাদের জাহেলী আবেগ ও মানসিকতাই তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করলো এবং তারা নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য যে কোন মূল্যে এ কাফেলাকে শহরে প্রবেশ করতে না দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগেভাগেই বনী কা'ব গোত্রের এক ব্যক্তিকে গুপ্তচর হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যাতে সে যথাসময়ে তাঁকে কুরাইশদের সংকল্প ও গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত করতে থাকে। তিনি উসফান[১] নামক স্থানে পৌছলে সে এসে জানালো যে, পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে কুরাইশরা যি–তুয়ায়[২] পৌছেছে এবং তাঁর পথরোধ করার জন্য তারা খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে দুই শত অশ্বারোহী সহ কুরাউল গামীম[৩] অভিমুখে অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছে। কুরাইশদের চক্রান্ত ছিল এই যে, কোন না কোন উপায়ে নবীর (সা) সংগী–সাথীদের উত্যক্ত করে উত্তেজিত করা এবং তার পরে যুদ্ধ সংঘটিত হলে গোটা দেশে একথা প্রচার করে দেয়া যে, উমরা আদায়ের বাহানা করে এরা প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ করার জন্যই এসেছিলো এবং শুধু ধোঁকা দেয়ার জন্যই ইহ্‌রাম বেঁধেছিলো।

এ খবর পাওয়া মাত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাস্তা পরিবর্তন করলেন এবং ভীষণ কষ্ট স্বীকার করে অত্যন্ত দুর্গম একটি পথ ধরে হারাম শরীফের একেবারে প্রান্ত সীমায় অবস্থিত হুদাইবিয়ায়[৪] গিয়ে পৌছলেন। এখানে খুযা'আ গোত্রের নেতা বুদায়েল ইবনে ওয়ারকা তার গোত্রের কতিপয় লোককে সাথে নিয়ে নবীর (সা) কাছে আসলো এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলো। আপনি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন? নবী (সা) বললেন ঃ "আমরা কারো বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসিনি। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু বায়তুল্লাহর যিয়ারত ও তাওয়াফ।" তারা গিয়ে কুরাইশ নেতাদের একথাটিই জানিয়ে দিল।

১। এ স্থানটি মদীনা থেকে মক্কাগামী পথে মক্কা থেকে প্রায় দু'দিনের দূরত্বে অবস্থিত। অর্থাৎ উটের পিঠে এখান থেকে মক্কা পৌছতে দু'দিন লেগে যায়।

২। মক্কার বাইরে উসফানগামী পথের ওপর অবস্থিত একটি স্থান।

৩। উসফান থেকে মক্কা অভিমুখে আট মাইল দূরে অবস্থিত।

৪। জেদ্দা থেকে মক্কাগামী সড়কের যে স্থানে হারাম শরীফের সীমা শুরু হয়েছে এ স্থানটি ঠিক সেখানে অবস্থিত। বর্তমানে এ স্থানটির নাম শুমাইসি। মক্কা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৩ মাইল।

তারা তাদেরকে এ পরামর্শও দিল যে, তারা যেন হারামের এসব যিয়ারতকারীদের পথরোধ না করে। কিন্তু তারা তাদের জিদ বজায় রাখলো এবং নবীকে (সা) ফিরে যেতে রাজি করানোর জন্য আহাবিশদের নেতা হুলাইস ইবনে আলকামাকে তাঁর কাছে পাঠালো। কুরাইশ নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম তার কথা না মানলে সে অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসবে এবং এভাবে আহাবিশদের শক্তি তাদের পক্ষে থাকবে। কিন্তু সে এসে যখন স্বচক্ষে দেখলো, গোটা কাফেলা ইহ্রাম বেঁধে আছে, গলায় কিলাদা লটকানো কুরবানীর উটগুলো সামনেই দাঁড়িয়ে আছে এবং এ মানুষগুলো লড়াই করার জন্য নয়, বরং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করার জন্য এসেছে তখন সে নবীর (সা) সাথে কোন কথাবার্তা না বলেই মক্কায় ফিরে গিয়ে কুরাইশ নেতাদের স্পষ্ট বলে দিল যে, তারা বায়তুল্লাহর মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে তা যিয়ারত করতে এসেছে। তোমরা যদি তাদের বাধা দাও তাহলে আহাবিশরা কখনো তোমাদের সহযোগিতা করবে না। তোমরা নিষিদ্ধ বিষয়কে পদদলিত করবে আর আমরা সাহায্য–সহযোগিতা করবো এ জন্য আমরা তোমাদের সাথে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হইনি।

অতপর কুরাইশদের পক্ষ থেকে মাসউদ সাকাফী আসলো এবং সেও নিজের পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভাল–মন্দ সব দিক বুঝিয়ে তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করার সংকল্প থেকে বিরত রাখতে চাইলো। নবী (সা) বনী খুযাআ গোত্রের নেতাকে যে জওয়াব দিয়েছিলেন তাকেও সে একই জওয়াব দিলেন। অর্থাৎ আমরা লড়াই করার উদ্দেশ্যে আসিনি, বায়তুল্লাহর মর্যদা প্রদর্শনকারী হিসেবে একটি ধর্মীয় কর্তব্য পালন করার জন্য এসেছি। ফিরে গিয়ে উরওয়া কুরাইশদের বললো ঃ আমি কায়সার, কিসরা এবং নাজ্জাসীর দরবারে গিয়েছি। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি মুহাম্মাদের (সা) সংগী–সাথীদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যেমন নিবেদিত প্রাণ দেখেছি তেমন দৃশ্য বড় বড় বাদশাহর দরবারেও দেখিনি। এদের অবস্থা এই যে, মুহাম্মাদ (সা) অযু করলে তারা এক বিন্দু পানিও মাটিতে পড়তে দেয় না, সবাই তা নিজেদের শরীর ও কাপড়ে মেখে নেয়। এখন চিন্তা করে দেখ, তোমরা কার মোকাবিলা করতে যাচ্ছো?

দূতদের আসা যাওয়া ও আলাপ–আলোচনা চলাকালীন সময়ে গোপনে নবীর (সা) সেনা শিবিরে আকস্মিক হামলা চালিয়ে সাহাবীদের উত্তেজিত করা এবং যুদ্ধের অজুহাত হিসেবে কাজে লাগানো যায় তাদের দ্বারা এমন কোন কাজ করানোর জন্য কুরাইশরা বারবার চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের ধৈর্য ও সংযম এবং নবীর (সা) বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি তাদের সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। তাদের চল্লিশ পঞ্চাশজন লোকের একটি দল একদিন রাত্রিকালে এসে মুসলমানদের তাঁবুর ওপরে পাথর নিক্ষেপ ও তীর বর্ষণ করতে থাকে। সাহাবা কিরাম, তাদের সবাইকে বন্দী করে নবীর (সা) সামনে হাজির করেন। কিন্তু তিনি তাদের সবাইকে ছেড়ে দেন। অপর এক ঘটনায় ঠিক ফজর নামাযের সময় তানঈমের[১] দিক থেকে ৮০ ব্যক্তির একটি দল এসে অকস্মিকভাবে হামলা করে বসে। তাদেরকেও বন্দী করা হয়। নবী (সা) তাদেরকেও মুক্ত করে দেন। এভাবে কুরাইশরা তাদের প্রতিটি ধূর্তামি ও অপকৌশলে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে থাকে।

১। মক্কার হারাম সীমার বাইরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম, মক্কার লোকেরা সাধারনত এখানে এসে ওমরার জন্য ইহ্রাম বাঁধে এবং ফিরে গিয়ে ওমরাহ আদায় করে।

অবশেষে নবী (সা) নিজের পক্ষ থেকে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দূত হিসেবে মক্কায় পাঠান এবং তাঁর মাধ্যমে কুরাইশ নেতাদের জানিয়ে দেন যে, আমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নয়, বরং বায়তুল্লাহর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কুরবানীর পশু সংগে নিয়ে এসেছি। বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও কুরবানী করে ফিরে যাব। কিন্তু তারা এতে স্বীকৃত হলো না এবং হযরত উসমানকে মক্কাতে আটক করলো। এ সময় খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, হযরত উসমানকে (রা) হত্যা করা হয়েছে তাঁর ফিরে না আসায় মুসলমানরাও নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, খবরটা সত্য। এখন অধিক সংযম প্রদর্শনের আর কোন অবকাশ ছিল না। মক্কা প্রবেশের ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন জিনিস। সে জন্য শক্তি প্রয়োগের কোন চিন্তা আদৌ ছিল না। কিন্তু যখন দূতকে হত্যা করার ঘটনা পর্যন্ত ঘটলো তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া মুসলমানদের আর কোন উপায় থাকলো না। সুতরাং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সমস্ত সাহাবীকে একত্রিত করলেন এবং তাদের নিকট থেকে এ মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করলেন যে, আমরা এখন এখান থেকে আমৃত্যু পিছু হটবো না। অবস্থার নাজুকতা বিচার করলে যে কেউ উপলব্ধি করবেন যে, এটা কোন মামুলি বাইয়াত ছিল না। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ শত। কোন যুদ্ধ সরঞ্জামও তাদের সাথে ছিল না। নিজেদের কেন্দ্র থেকে আড়াই শত মাইল দূরে একেবারে মক্কার সীমান্তে অবস্থান করছিলেন তারা, যেখানে শত্রু তার পুরো শক্তি নিয়ে আক্রমণ করতে পারতো এবং আশপাশের সহযোগী গোত্রগুলোকে ডেকে এনে তাদের ঘিরে ফেলতে পারতো। এসব সত্ত্বেও শুধু একজন ছাড়া গোটা কাফেলার সবাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে হাত রেখে জীবনের ঝুঁকি নিতে দ্বিধাহীন চিত্তে প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদের নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমান এবং আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ হওয়ার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? এটিই ইসলামের ইতিহাসে "বাইয়াতে রিদওয়ান" নামে খ্যাত।

পরে জানা গেল যে, হযরত উসমানকে হত্যা করার খবর মিথ্যা ছিল। হযরত উসমান নিজেও ফিরে আসলেন এবং কুরাইশদের পক্ষ থেকে সন্ধির আলোচনা করার জন্য সুহাইল ইবনে আমরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলও নবীর (সা) শিবিরে এসে পৌঁছলো। নবী (সা) এবং তাঁর সংগী–সাথীদের আদৌ মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না—কুরাইশরা তাদের এ জিদ ও একগুঁয়েমী পরিত্যাগ করেছিলো। তবে নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য তারা পীড়াপীড়ি করছিলো যে, নবী (সা) এ বছর ফিরে যাবেন এবং আগামী বছর আসতে পারবেন। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর যেসব শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি পত্র লেখা হলো তা হচ্ছে ঃ

(১) উভয় পক্ষের মধ্যে দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ থাকবে এবং এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে গোপনে বা প্রকাশ্যে কোন প্রকার তৎপরতা চালাবে না।

(২) এ সময়ে কুরাইশদের কেউ তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া যদি পালিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলে যায় তাহলে তিনি তাকে ফেরত দেবেন। কিন্তু তাঁর সংগী–সাথীদের কেউ কুরাইশদের কাছে চলে গেলে তারা তাকে ফেরত পাঠাবে না।

(৩) যে কোন আরব গোত্র যে কোন পক্ষের মিত্র হয়ে এই চুক্তির অন্তরভুক্ত হতে চাইলে তার সে অধিকার থাকবে।

(৪) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বছর ফিরে যাবেন এবং আগামী বছর উমরার জন্য এসে এ শর্তে তিনদিন মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন যে, সাজ–সরঞ্জামের মধ্যে শুধু একখানা করে তরবারি ছাড়া আর কোন যুদ্ধ সরঞ্জাম সাথে আনতে পারবেন না। মক্কাবাসীরা উক্ত তিন দিন তাদের জন্য শহর খালি করে দেবে যাতে কোন প্রকার সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। কিন্তু ফিরে যাওয়ার সময় এখানকার কোন অধিবাসীকে সংগে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি তাঁর থাকবে না।

যে সময় এ সন্ধির শর্তসমূহ নির্ধারিত হচ্ছিলো তখন মুসলমানদের পুরা বাহিনী অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছিলেন। যে মহত উদ্দেশ্য সামনে রেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব শর্ত মেনে নিচ্ছিলেন তা কেউই বুঝে উঠতে পারছিলো না। এ সন্ধির ফলে যে বিরাট কল্যাণ অর্জিত হতে যাচ্ছিলো তা দেখতে পাওয়ার মত দূরদৃষ্টি কারোই ছিল না। কুরাইশদের কাফেররা একে তাদের সফলতা মনে করছিলো আর মুসলমানরা বিচলিত হচ্ছিল এই ভেবে যে, তারা নিচ হয়ে এ অবমাননাকর শর্তাবলী গ্রহণ করবে কেন? এমন কি হযরত উমরের (রা) মত গভীরদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানীজনের অবস্থা ছিল এই যে, তিনি বলেন ঃ ইসলাম গ্রহণের পরে কখনো আমার মনে কোন সন্দেহ–সংশয় সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু এ যাত্রায় আমিও তা থেকে রক্ষা পাইনি। তিনি বিচলিত হয়ে হযরত আবু বকরের (রা) কাছে গিয়ে বললেন ঃ "তিনি কি আল্লাহর রসূল নন? আমরা কি মুসলমান নই? এসব লোক কি মুশরিক নয়? এসব সত্ত্বেও আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে এ অবমাননা মেনে নেব কেন?" তিনি জবাব দিলেন ঃ "হে উমর তিনি আল্লাহর রসূল আল্লাহ কখনো তাঁকে ধ্বংস করবেন না।" এরপরও তিনি ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকেও এ প্রশ্নগুলো করলেন। হযরত আবু বকর (রা) তাঁকে যে জবাব দিয়েছিলেন নবীও (সা) তাঁকে সেরূপ জবাব দিলেন। এ সময় হযরত উমর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যে কথাবার্তা বলেছিলেন তার জন্য তিনি পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত ছিলেন। তাই তিনি অধিক পরিমাণে দান–খয়রাত এবং নফল নামায আদায় করতেন। যাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মাফ করে দেন।

এ চুক্তির দু'টি শর্ত লোকজনের কাছে সবচেয়ে বেশী অসহনীয় ও দুর্বিসহ মনে হচ্ছিলো। এক, ২ নম্বর শর্ত। এটি সম্পর্কে লোকজনের বক্তব্য হলো এটি অসম শর্ত। মক্কা থেকে পালিয়ে আসা লোকদের যদি আমরা ফিরিয়ে দেই তাহলে মদীনা থেকে পালিয়ে আসা লোকদের তারা ফিরিয়ে দেবে না কেন? এর জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ যে আমাদের এখান থেকে পালিয়ে তাদের কাছে চলে যাবে সে আমাদের কোন্ কাজে লাগবে? আল্লাহ যেন তাকে আমাদের থেকে দূরেই রাখেন। তবে যে তাদের ওখান থেকে পালিয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে তাকে যদি আমরা ফিরিয়েও দেই তাহলে তার মুক্তিলাভের অন্য কোন উপায় হয়তো আল্লাহ সৃষ্টি করে দেবেন। দ্বিতীয় যে জিনিসটি লোকজনের মনে দ্বিধা–সংশয় সৃষ্টি করছিলো সেটি ছিল সন্ধির চতুর্থ শর্ত। মুসলমানগণ মনে করছিলেন, এটি মেনে নেয়ার অর্থ হচ্ছে গোটা আরবের দৃষ্টিতে আমরা যেন ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছি। তাছাড়া এ প্রশ্নও মনে সন্দেহ সৃষ্টি করছিলো যে, নবী (সা) তো স্বপ্নে দেখেছিলেন, আমরা মক্কায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছি। অথচ এখানে আমরা তাওয়াফ

না করেই ফিরে যাওয়ার শর্ত মেনে নিচ্ছি। নবী (সা) একথাটির ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন ঃ এ বছরই তাওয়াফ করা হবে স্বপ্নে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। চুক্তির শর্ত অনুসারে এ বছর যদি না–ও হয় তাহলে আগামী বছর ইনশায়াল্লাহ্ তাওয়াফ হবে।

যে ঘটনাটি জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালার কাজ করলো তা হচ্ছে, যে সময় সন্ধি চুক্তিটি লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিলো ঠিক তখন সুহাইল ইবনে আমরের পুত্র আবু জানদাল কোন প্রকারে পালিয়ে নবীর (সা) শিবিরে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মক্কার কাফেররা তাকে বন্দী করে রেখেছিলো। এ সময় তাঁর পায়ে শিকল পরানো ছিল এবং দেহে নির্যাতনের চিহ্ন ছিল। তিনি নবীর (সা) কাছে আবেদন জানালেন, আমাকে এ অন্যায় বন্দীদশা থেকে মুক্ত করুন। এ করুণ অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা কঠিন হয়ে পড়লো। সুহাইল ইবনে আমর বললো ঃ চুক্তিপত্র লেখা শেষ না হলেও চুক্তির শর্তাবলী সম্পর্কে আপনার ও আমাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। অতএব এ ছেলেকে আমার হাতে অর্পণ করুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার যুক্তি মেনে নিলেন এবং আবু জানদালকে জালেমদের হাতে তুলে দিলেন।

সন্ধি চুক্তি শেষ করে নবী (সা) সাহাবীদের বললেন ঃ এখানেই কুরবানী করে মাথা মুড়ে ফেলো এবং ইহ্রাম শেষ করো। কিন্তু কেউ–ই তাঁর জায়গা থেকে একটুও নড়লেন না। নবী (সা) তিনবার আদেশ দিলেন কিন্তু দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও মর্মবেদনা সাহাবীদের ওপর এমন প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে, তাঁরা যার যার জায়গা হতে একটু নড়াচড়া পর্যন্ত করলেন না। নবী (সা) সাহাবীদের আদেশ দিচ্ছেন কিন্তু তাঁরা তা পালনের জন্য তৎপর হচ্ছেন না এমন ঘটনা এ একটি ক্ষেত্র ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লামের গোটা নবুওয়াত জীবনে আর কখনো ঘটেনি। এতে নবী (সা) অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। তিনি তাঁর তাঁবুতে গিয়ে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামার কাছে নিজের মনোকষ্টের কথা প্রকাশ করলেন। হযরত উম্মে সালামা বললেন, আপনি চুপচাপ গিয়ে নিজের উট কুরবানী করুন এবং ক্ষৌরকার ডেকে মাথা মুড়ে ফেলুন। তাহলে সবাই স্বতস্ফূর্তভাবে আপনাকে অনুসরণ করবে এবং বুঝবে, যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তা পরিবর্তিত হওয়ার নয়। হলোও তাই। নবীকে (সা) এরূপ করতে দেখে সবাই কুরবানী করলো, মাথা মুড়ে কিংবা চুল ছেঁটে নিল এবং ইহ্রাম থেকে বেরিয়ে আসলো। কিন্তু দুঃখ ও মর্ম যাতনায় তাদের হৃদয় চৌচির হয়ে যাচ্ছিলো।

এরপর এ কাফেলা যখন হুদাইবিয়ার সন্ধিকে নিজেদের পরাজয় ও অপমান মনে করে মদীনার দিকে ফিরে যাচ্ছিলো তখন দাজনান[১] নামক স্থানে (অথবা কারো কারো মতে কুরাউল গামীম) এ সূরাটি নাযিল হয় যা মুসলমানদের জানিয়ে দেয় যে, এ সন্ধিচুক্তি যাকে তারা পরাজয় মনে করছে তা প্রকৃতপক্ষে বিরাট বিজয়। এ সূরা নাযিল হওয়ার পর নবী (সা) মুসলমানদের একত্রিত করে বললেন ঃ আজ আমার ওপর এমন জিনিস নাযিল হয়েছে যা আমার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর চেয়েও বেশী মূল্যবান। তারপর তিনি এ সূরা তেলাওয়াত করলেন এবং বিশেষভাবে হযরত উমরকে ডেকে তা শুনালেন। কেননা, তিনিই সবচেয়ে বেশী মনোকষ্ট পেয়েছিলেন।

১। মক্কা থেকে প্রায় ২৫ মাইল দূরবর্তী একটি স্থান।

ঈমানদারগণ যদিও আল্লাহ তা'আলার এ বাণী শুনেই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। তবুও খুব বেশী সময় যেতে না যেতেই এ চুক্তির সুফলসমূহ এক এক করে প্রকাশ পেতে থাকলো এবং এ চুক্তি যে সত্যিই একটা বিরাট বিজয় সে ব্যাপারে আর কারো মনে কোন সন্দেহ থাকলো না।

এক ঃ এ চুক্তির মাধ্যমে আরবে প্রথমবারের মত ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নেয়া হলো। এর পূর্ব পর্যন্ত আরবদের দৃষ্টিতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সংগী–সাথীগণের মর্যাদা ছিল শুধু কুরাইশ ও আরব গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী একটি গোষ্ঠী হিসেবে তারা তাদের সমাজচ্যুত (Out law) বলেই মনে করতো। এখন তাঁর সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে কুরাইশরা নিজেরাই ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত এলাকার ওপর তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মেনে নিল এবং এ দু'টি রাজনৈতিক শক্তির যার সাথে ইচ্ছা মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পথ খুলে দিল।

দুই ঃ কুরাইশরা এ যাবত ইসলামকে ধর্মহীনতা বলে আখ্যায়িত করে আসছিলো। কিন্তু মুসলমানদের জন্য বায়তুল্লাহর যিয়ারতের অধিকার মেনে নিয়ে তারা আপনা থেকেই যেন একথাও মেনে নিল যে, ইসলাম কোন ধর্মহীনতা নয়, বরং আরবে স্বীকৃত ধর্মসমূহের একটি এবং অন্যান্য আরবদের মত এ ধর্মের অনুসারীরাও হজ্জ ও উমরার অনুষ্ঠানসমূহ পালনের অধিকার রাখে। কুরাইশদের অপপ্রচারের ফলে আরবের মানুষের মনে ইসলামের বিরুদ্ধে যে ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিলো এতে সে ঘৃণাও অনেকটা হ্রাস পেল।

তিন ঃ দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হওয়ার ফলে মুসলমানগণ নিরাপত্তা ও শান্তিলাভ করলেন এবং গোটা আরবের আনাচে কানাচে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এত দ্রুত ইসলামের প্রচার চালালেন যে, হুদাইবিয়ার সন্ধি পরবর্তী দু' বছরে যত লোক মুসলমান হলো সন্ধি পূর্ববর্তী পুরো ১৯ বছরেও তা হয়নি। সন্ধির সময় যেখানে নবীর (সা) সাথে মাত্র ১৪ শত লোক ছিলেন। সেখানে মাত্র দুই বছর পরেই কুরাইশদের চুক্তিভঙ্গের ফলে নবী (সা) যখন মক্কায় অভিযান চালান তখন দশ হাজার সৈনিকের এক বিশাল বাহিনী তাঁর সাথে ছিল। এটা ছিল হুদাইবিয়ার সন্ধির সুফল।

চার ঃ কুরাইশদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অধিকারভুক্ত এলাকায় ইসলামী সরকারকে সুদৃঢ় করার এবং ইসলামী আইন–কানুন চালু করে মুসলিম সমাজকে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতি হিসেবে দাঁড় করানোর সুযোগ লাভ করেন। এটিই সেই মহান নিয়ামত যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়েদার ৩ আয়াতে বলেছেন ঃ "আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের জন্য আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের দীন হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করলাম।" (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা মায়েদার ভূমিকা এবং টীকা ১৫)

পাঁচ ঃ কুরাইশদের সাথে সন্ধি হয়ে যাওয়ার পর দক্ষিণ দিক থেকে শান্তি লাভের এ সুফলও পাওয়া গেল যে, মুসলমানগণ উত্তর ও মধ্য আরবের সমস্ত বিরোধী শক্তিকে অতি সহজেই বশীভূত করে নেয়। হুদাইবিয়ার সন্ধির মাত্র তিন মাস পরেই ইহুদীদের সবচেয়ে বড় দুর্গ খায়বার বিজিত হয় এবং তারপর ফাদাক, ওয়াদিউল কুরা, তায়মা ও তাবুকের

মত ইহুদী জনপদও একের পর এক মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। তারপর মধ্য আরবের যেসব গোত্র ইহুদী ও কুরাইশদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছিলো তার সবগুলোই এক এক করে মুসলমানদের শাসনাধীন হয়ে পড়ে। হুদাইবিয়ার সন্ধি এভাবে মাত্র দু' বছরের মধ্যে আরবে শক্তির ভারসাম্য এতটা পাল্টে দেয় যে, কুরাইশ এবং মুশরিকদের শক্তি অবদমিত হয়ে পড়ে এবং ইসলামের বিজয় নিশ্চিত হয়ে যায়।

যে সন্ধিচুক্তিকে মুসলমানগণ তাদের ব্যর্থতা আর কুরাইশরা তাদের সফলতা মনে করছিলো সে সন্ধিচুক্তি থেকেই তারা এসব সুফল ও কল্যাণ লাভ করে। এ সন্ধিচুক্তির যে বিষয়টি মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে বেশী অপছন্দনীয় ছিল এবং কুরাইশরা তাদের বড় বিজয় বলে মনে করেছিলো তা হচ্ছে, মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের ফিরিয়ে দেয়া হবে কিন্তু মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কায় গমনকারীদের ফিরিয়ে দেয়া হবে না। কিন্তু অল্প কিছুদিন যেতে না যেতেই এ ব্যাপারটিও কুরাইশদের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ালো এবং অভিজ্ঞতার আলোকে জানা গেল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি কি কি সুফল দেখে এ শর্তটি মেনে নিয়েছিল। সন্ধির কিছুদিন পরেই মক্কার একজন মুসলমান আবু বাসীর কুরাইশদের বন্দীত্ব থেকে পালিয়ে মদীনায় চলে আসেন। কুরাইশরা তাকে ফেরত দেয়ার দাবী জানালো এবং নবীও (সা) চুক্তি অনুযায়ী মক্কা থেকে যারা তাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে এসেছিলো তাদের কাছে হস্তান্তর করলেন। কিন্তু মক্কা যাওয়ার পথে সে আবার তাদের বন্দীত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে এবং লোহিত সাগরের যে পথ ধরে কুরাইশদের বাণিজ্য বহর যাতায়াত করতো সে পথের একটি স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এরপর থেকে যে মুসলমানই কুরাইশদের বন্দীত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করার সুযোগ করতে পারতো সে-ই মদীনায় যাওয়ার পরিবর্তে আবু বাসীরের আশ্রয়ে চলে যেতো। এভাবে সেখানে ৭০ জনের সমাবেশ ঘটে এবং তারা কুরাইশদের কাফেলার ওপর বারবার অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে তাদের অবস্থা শোচনীয় করে তোলে। অবশেষে তাদেরকে মদীনায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কুরাইশরা নিজেরাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আহবান জানায়। এভাবে হুদায়বিয়ার চুক্তির ঐ শর্তটি আপনা থেকেই রহিত হয়ে যায়।

এ ঐতিহাসিক পটভূমি সামনে রেখে সূরাটি অধ্যয়ন করলে তা ভালভাবে বোধগম্য হতে পারে।

আয়াত ২৯ **সূরা আল ফাতহ্—মাদানী** রুকূ' ৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۝

হে নবী, আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি[১] যাতে আল্লাহ তোমার আগের ও পরের সব ক্রটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেন,[২] তোমার জন্য তাঁর নিয়ামতকে পূর্ণত্ব দান করেন,[৩] তোমাকে সরল সহজ পথ দেখিয়ে দেন[৪] এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে সাহায্য করেন।[৫]

১. হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে বিজয়ের এ সুসংবাদ শুনানো হলে লোকজন বিস্মিত হলো এই ভেবে যে, এ সন্ধিকে বিজয় বলা যায় কি করে? ঈমানের ভিত্তিতে আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেয়া ভিন্ন কথা। কিন্তু তাকে বিজয় বলাটা কারোরই বোধগম্য হচ্ছিলো না। এ আয়াতটি শুনে হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্লাহর রসূল, এটা কি বিজয়? নবী (সা) বললেন : হাঁ (ইবনে জারীর)। অন্য একজন সাহাবীও নবীর (সা) কাছে এসে একই প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : اى والذى نفس محمد بيده انه لفتح সেই মহান সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মাদের (সা) প্রাণ, এটা অবশ্যই বিজয়। (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ) মদীনায় ফেরার পর আরো এক ব্যক্তি তার সংগীকে বললো, "এটা কেমন বিজয়? বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে আমাদের বাধা দেয়া হয়েছে, আমাদের কুরবানীর উটগুলোও আর সামনে অগ্রসর হতে পারেনি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুদাইবিয়াতেই থামতে হয়েছে এবং এ সন্ধির ফলেই আমাদের দু' মজলুম ভাই আবু জানদাল ও আবু বাসীরকে জালেমদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।" একথাটি নবী (সা)—এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন : এটি অত্যন্ত ভুল কথা। প্রকৃতপক্ষে এটা বিরাট বিজয়। তোমরা একেবারে মুশরিকদের বাড়ীর দরজায় গিয়ে হাজির হয়েছিলে এবং তারা আগামী বছর উমরা করতে দেয়ার প্রস্তাব দিয়ে তোমাদের ফিরে যেতে সম্মত করেছিল। যুদ্ধ বন্ধ করা এবং সন্ধি করার জন্য তারা নিজেরাই ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। অথচ তাদের মনে তোমাদের প্রতি যে শত্রুতা রয়েছে তা অজানা নয়। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয় দান করেছেন। সেদিনের কথা কি ভুলে গেলে উহুদে যেদিন তোমরা

ছুটে পালাচ্ছিলে আর আমি পশ্চাত দিক থেকে চিৎকার করে তোমাদের ডাকছিলাম? সেদিনের কথা কি ভুলে গেলে যেদিন আহযাবের যুদ্ধে শত্রুরা সব দিক থেকে চড়াও হয়েছিল এবং তোমাদের শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল? (বায়হাকীতে উরওয়া ইবনে যুবায়েরের বর্ণনা) কিন্তু এ সন্ধি যে প্রকৃতই বিজয় তা কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রকাশ পেতে থাকলো এবং সব শ্রেণীর মানুষের কাছে একথা পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রকৃতপক্ষে হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকেই ইসলামের বিজয়ের সূচনা হয়েছিলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ এবং হযরত বারা ইবনে আযেব এ তিন সাহাবী থেকে প্রায় একই অর্থে একটি কথা বর্ণিত হয়েছে যে, লোকেরা মক্কা বিজয়কেই প্রকৃত বিজয় বলে থাকে। কিন্তু আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই প্রকৃত বিজয় মনে করি। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর)

২. যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে একথাটি বলা হয়েছে তা মনে রাখলে স্পষ্ট বুঝা যায়, ইসলামের সাফল্য ও বিজয়ের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে মুসলমানগণ বিগত ১৯ বছর ধরে যে চেষ্টা-সাধনা করে আসছিলেন তার মধ্যে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা রয়ে গিয়েছিলো এখানে সেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে। এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি কি তা কোন মানুষের জানা নেই। বরং মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি এ চেষ্টা-সাধনার মধ্যে কোন ত্রুটি ও অপক্কতা খুঁজে পেতে একেবারেই অক্ষম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে পূর্ণতার যে অতি উচ্চ মানদণ্ড রয়েছে তার বিচারে ঐ চেষ্টা-সাধনার মধ্যে এমন কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল যার কারণে মুসলমানগণ আরবের মুশরিকদের বিরুদ্ধে এত দ্রুত চূড়ান্ত বিজয় লাভ করতে পারতেন না। আল্লাহ তা'আলার বাণীর তাৎপর্য হচ্ছে, তোমরা যদি ঐ সব ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে চেষ্টা-সাধনা করতে তাহলে আরব বিজিত হতে আরো দীর্ঘ সময় দরকার হতো। কিন্তু এসব দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে কেবল নিজের মেহেরবানী দ্বারা আমি তোমাদের অপূর্ণতা দূর করেছি এবং হুদাইবিয়া নামক স্থানে তোমাদের জন্য সে বিজয় ও সফলতার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছি যা স্বাভাবিকভাবে তোমাদের প্রচেষ্টা দ্বারা অর্জিত হতো না।

এখানে একথাটিও ভালভাবে উপলব্ধি করা দরকার যে, কোন লক্ষ ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে দল চেষ্টা-সাধনা চালাচ্ছে তার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য সে দলের নেতাকে সম্বোধন করা হয়। তার অর্থ এ নয় যে, ঐ সব ত্রুটি ও দুর্বলতা উক্ত নেতার ব্যক্তিগত ত্রুটি ও দুর্বলতা। গোটা দল সম্মিলিতভাবে যে চেষ্টা-সাধনা চালায় ঐ সব ত্রুটি ও দুর্বলতা সে দলের সম্মিলিত চেষ্টা-সাধনার। কিন্তু নেতাকে সম্বোধন করে বলা হয়, আপনার কাজে এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্তমান।

তা সত্ত্বেও যেহেতু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্বাপর সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাই সাধারণভাবে এ শব্দগুলো থেকে এ বিষয়টিও বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর রসূলের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি (যা কেবল তাঁর উচ্চ মর্যাদার বিচারে ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল) ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম যখন নবীকে (সা) ইবাদাতের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক রকমের কষ্ট করতে দেখতেন তখন বলতেন, আপনার পূর্বাপর সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতিই তো ক্ষমা করা হয়েছে। তারপরও আপনি এত কষ্ট

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ۭ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ④

তিনিই তো সে সত্তা যিনি মু'মিনদের মনে প্রশান্তি নাযিল করেছেন[৬] যাতে তারা নিজেদের ঈমান আরো বাড়িয়ে নেয়।[৭] আসমান ও যমীনের সমস্ত বাহিনী আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। তিনি মহাজ্ঞানী ও কৌশলী।[৮]

করেন কেন? জবাবে নবী (সা) বলতেন : اَفَلَا اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا "আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দাও হবো না?" (আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

৩. নিয়ামতকে পূর্ণতা দানের অর্থ হচ্ছে মুসলমানরা স্বস্থানে সব রকম ভয়-ভীতি, বাধা-বিপত্তি এবং বাইরের সব রকম হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থেকে পুরোপুরি ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ইসলামী আইন-কানুন অনুসারে জীবন যাপনের স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানকে উঁচু করে তুলে ধরার শক্তি লাভ করবে। কুফর ও পাপাচারের আধিপত্য যা আল্লাহর দাসত্বের পথে বাধা এবং আল্লাহর বিধানকে সমুন্নত করার প্রচেষ্টায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তা ঈমানদারদের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ। কুরআন এ বিপদকেই ফিতনা বলে আখ্যায়িত করে। এ ফিতনা থেকে মুক্তি পেয়ে যখন তারা এমন একটি শান্তির আবাস লাভ করে যেখানে আল্লাহর দীন পূর্ণরূপে হুবহু বাস্তবায়িত হতে পারে এবং সাথে সাথে এমন উপায়-উপকরণও লাভ করে যার দ্বারা আল্লাহর যমীনে কুফর ও পাপাচারের স্থানে ঈমান ও তাকওয়ার শাসন চালু করতে পারে তখন তা হয় তাদের জন্য আল্লাহর নিয়ামতের পরিপূর্ণতা দান। মুসলমানরা যেহেতু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমেই আল্লাহর এ নিয়ামত লাভ করেছিলো, তাই আল্লাহ তা'আলা নবীকে (সা) সম্বোধন করেই বলেছেন : আমি তোমার জন্য আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণতা দান করতে চাচ্ছিলাম, আর সে জন্যই তোমাকে এ বিজয় দান করেছি।

৪. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সোজা পথ দেখানোর অর্থ এখানে তাঁকে বিজয় ও সাফল্যের পথ দেখনো। অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা হুদাইবিয়া নামক স্থানে সন্ধিচুক্তি করিয়ে নবীকে (সা) ইসলামের বিরুদ্ধে বাধাদানকারী শক্তিসমূহকে পরাভূত করার পথ সহজ করে দিয়েছেন এবং সে জন্য কৌশল শিখিয়ে দিয়েছেন।

৫. আরেকটি অনুবাদ এও হতে পারে যে, "তোমাকে অভূতপূর্ব বা বিরল সাহায্য দান করেছেন।" মূল আয়াতে نَصْرًا عَزِيْزًا ব্যবহৃত হয়েছে। "عَزِيْزٌ" শব্দের অর্থ যেমন পরাক্রমশালী তেমনি নজীরবিহীন, অতুলনীয় এবং বিরলও। প্রথম অর্থের বিচারে এ আয়াতাংশের তাৎপর্য হচ্ছে, এ সন্ধির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবীকে (সা) যে সাহায্য করেছেন তার কারণে তাঁর শত্রুরা অক্ষম হয়ে পড়বে। দ্বিতীয় অর্থটির বিচারে এর তাৎপর্য হচ্ছে, মানুষ বাহ্যত যে জিনিসটিকে শুধু একটি সন্ধিচুক্তি হিসেবে দেখছিলো—তাও

আবার অবদমিত হয়ে মেনে নেয়া সন্ধি—তা-ই একটি চূড়ান্ত বিজয়ে রূপান্তরিত হবে, কাউকে সাহায্য করার এমন অদ্ভুত পন্থা খুব কমই গ্রহণ করা হয়েছে।

৬. سكينة আরবী ভাষায় স্থিরতা, প্রশান্তি ও দৃঢ় চিত্ততাকে বুঝায়। এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের অন্তরে তা নাযিল করাকে হুদাইবিয়ায় ইসলাম ও মুসলমানগণ যে বিজয় লাভ করেছিলেন তার গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সে সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলেই বুঝা যায় তা কি ধরনের প্রশান্তি ছিল যা ঐ পুরো সময়টা ধরেই মুসলমানদের হৃদয় মনে অবতীর্ণ করা হয়েছিল আর কিভাবে তা এ বিজয়ের কারণ হয়েছিল। যে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরা আদায়ের জন্য মক্কা শরীফ যাওয়ার সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন মুসলমানগণ যদি সে সময় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন এবং মুনাফিকদের মত মনে করতেন যে, এতো স্পষ্টত মৃত্যুর মুখের মধ্যে চলে যাওয়া কিংবা পথে যখন খবর পাওয়া গেল কাফের কুরাইশরা যুদ্ধ করতে সংকল্প করেছে তখন যদি মুসলমানরা হতবুদ্ধি ও অস্থির হয়ে পড়তেন যে, যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ছাড়াই কিভাবে আমরা শত্রুর মোকাবিলা করবো আর এ কারণে তাদের মধ্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হতো তাহলে হুদাইবিয়াতে যে ফলাফল অর্জিত হয়েছিল তা কখনো অর্জিত হতো না। তাছাড়া কাফেররা হুদাইবিয়ায় যখন মুসলমানদের অগ্রসর হতে বাধা দিয়েছিল, যখন আকস্মিক হামলা চালিয়ে এবং রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করে করে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিল, যখন হযরত 'উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতলাভের খবর পাওয়া গিয়েছিল, যখন আবু জানদাল অত্যাচারিতের মূর্ত ছবি হয়ে মুসলমানদের জনসমাবেশের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তখন যদি মুসলমানগণ উত্তেজিত হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শৃংখলা ও সংযম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা নষ্ট করতেন তাহলে সবকিছুই ভণ্ডুল হয়ে যেতো। সবচেয়ে বড় কথা হলো, মুসলমানদের গোটা সংগঠনের কাছে সন্ধিচুক্তির যেসব শর্ত অত্যন্ত অপছন্দনীয় ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তা মেনে নিয়েই চুক্তি সম্পাদন করতে যাচ্ছিলেন তখন যদি সাহাবীগণ নবীর (সা) নির্দেশ অমান্য করে বসতেন তাহলে হুদাইবিয়ার এ বিরাট বিজয় বিরাট পরাজয়ে রূপান্তরিত হতো। এসব নাজুক মুহূর্তে রসূলের নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শন সম্পর্কে, ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে এবং নিজেদের আদর্শিক কর্ম-তৎপরতার ন্যায় ও সত্য হওয়া সম্পর্কে মুসলমানদের মনে যে পূর্ণ আস্থা ও প্রশান্তি ছিল তা সরাসরি আল্লাহর মেহেরবানী। এ কারণে তারা ধীর স্থির মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে যাই ঘটুক না কেন তা সবই শিরধার্য। এ কারণে তারা ভয়-ভীতি, অস্থিরতা, উস্কানি এবং নৈরাশ্য সবকিছু থেকে মুক্ত ছিলেন। এর কল্যাণেই তাঁদের শিবিরে পূর্ণ শৃংখলা ও সংযম বজায় ছিল এবং সন্ধির শর্তসমূহ সম্পর্কে অত্যন্ত মনোক্ষুণ্ন হওয়া সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্ত অবনত মস্তকে মেনে নিয়েছিলেন। এটাই সেই প্রশান্তি যা আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের মনে নাযিল করেছিলেন। এর কল্যাণেই উমরা আদায়ের সেই বিপদসংকুল উদ্যোগটি সর্বোত্তম সাফল্যের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

৭. অর্থাৎ তাদের যে ঈমান এ অভিযানের পূর্বে ছিল, তার সাথে আরো ঈমান তারা অর্জন করলো এ কারণে যে, এ অভিযান চলাকালে একের পর এক যত পরীক্ষা এসেছে তার প্রত্যেকটিতে তারা নিষ্ঠা, তাকওয়া ও আনুগত্যের নীতির ওপর দৃঢ়পদ থেকেছে।

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٥﴾ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۖ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٧﴾

(এ কাজ তিনি এ জন্য করেছেন) যাতে ঈমানদার নারী ও পুরুষদেরকে[৯] চিরদিন অবস্থানের জন্য এমন জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তাদের মন্দ কর্মসমূহ দূর করবেন।[১০] এটা আল্লাহর কাছে বড় সফলতা। আর যেসব মুনাফিক নারী ও পুরুষ এবং মুশরিক নারী ও পুরুষ আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে[১১] তাদের শাস্তি দেবেন। তারা নিজেরাই অকল্যাণের চক্রে পড়ে গিয়েছে।[১২] আল্লাহর গযব পড়েছে তাদের ওপর তিনি লা'নত করেছেন তাদেরকে এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন—যা অত্যন্ত জঘন্য জায়গা। আসমান ও যমীনের সকল বাহিনী আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। তিনি মহাজ্ঞানী ও কৌশলী।[১৩]

যেসব আয়াত থেকে বুঝা যায় ঈমান কোন স্থির, জড় ও অপরিবর্তনীয় অবস্থার নাম নয়। বরং ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধি ও ওঠানামা আছে, এ আয়াতটি তার একটি। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে মু'মিনের জীবনের পদে পদে এমন সব পরীক্ষা আসে যখন তাকে এ সিদ্ধান্তকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় যে, আল্লাহর দীনের জন্য সে তার জান–মাল, আবেগ-অনুভূতি, আশা–আকাংখা, সময়, আরাম–আয়েশ এবং স্বার্থ কুরবানী করতে প্রস্তুত আছে কিনা। এরূপ প্রতিটি পরীক্ষার সময় যদি সে কুরবানী ও ত্যাগের পথ অনুসরণ করে তাহলে তার ঈমান উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তার ঈমান থমকে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত এমন এক সময়ও আসে যখন তার ঈমানের প্রাথমিক পুঁজিও সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে যা নিয়ে সে ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করেছিল। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনফাল, টীকা ২; আল আহযাব, টীকা ৩৮)

৮. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে এমন বাহিনী আছে, যার সাহায্যে তিনি যখন ইচ্ছা কাফেরদের ধ্বংস করে দিতে পারেন। কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইচ্ছা করেই

তিনি ঈমানদারদের ওপরে এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যাতে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে চেষ্টা–সাধনা ও দ্বন্দ্ব–সংঘাতে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করেন। এ কাজের দ্বারাই তাদের মর্যাদা উন্নত এবং আখেরাতের সাফল্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়। পরের আয়াত এ কথারই প্রতিধ্বনি করছে।

৯. কুরআন মজীদে সাধারণত ঈমানদারদের পুরস্কারের উল্লেখ সামষ্টিকভাবে করা হয়ে থাকে। নারী ও পুরুষের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয় না। কিন্তু এখানে একত্রে উল্লেখ করলে যেহেতু এরূপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারতো যে, এ পুরস্কার হয়তো শুধু পুরুষদের জন্যই। তাই আল্লাহ তা'আলা মু'মিন নারীদের সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তারাও মু'মিন পুরুষদের সাথে এ পুরস্কারে সমভাবে অংশীদার। এর কারণ স্পষ্ট। যেসব দীনদার ও আল্লাহভীরু মহিলা তাদের স্বামী, পুত্র, ভাই ও পিতাকে এ বিপজ্জনক সফরে যেতে বাধা দেয়া এবং মাতম ও বিলাপ করে নিরুৎসাহিত করার পরিবর্তে সাহস যুগিয়েছেন, যারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের বাড়ীঘর ও সন্তান-সন্ততি, তাদের সহায়–সম্পদ, তাদের সম্ভ্রম এবং তাদের সন্তানদের সংরক্ষক হয়ে এ ব্যাপারে তাদেরকে দুশ্চিন্তা মুক্ত রেখেছেন। একযোগে চৌদ্দশ' সাহাবীর চলে যাওয়ার পর আশেপাশের কাফের ও মুনাফিকরা শহরের ওপর আক্রমণ করে না বসে এ আশংকায় যারা কান্নাকাটি ও চিৎকার শুরু করে দেয়নি তারা বাড়ীতে অবস্থান করা সত্ত্বেও সওয়াব ও পুরস্কারের ক্ষেত্রে তারা যে তাদের পুরুষদের সাথে সমান অংশীদার হবেন—এটাই স্বাভাবিক।

১০. অর্থাৎ মানবিক দুর্বলতার কারণে যে ত্রুটি–বিচ্যুতিই তাদের দ্বারা হয়েছে তা মাফ করে দেবেন, জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে ঐ সব ত্রুটি–বিচ্যুতির সব রকম প্রভাব থেকে তাদের পবিত্র করবেন এবং এমনভাবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে যে, তাদের দেহে কোন কালিমা থাকবে না যার কারণে সেখানে তাদেরকে লজ্জিত হতে হবে।

১১. এ যাত্রায় মদীনার আশেপাশের মুনাফিকদের ধারণা ছিল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথীগণ এ সফর থেকে জীবিত ফিরে আসতে পারবেন না। পরবর্তী ১২ আয়াতে একথাটিই বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া মক্কার মুশরিক এবং তাদের সহযোগী কাফেররা মনে করেছিল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সংগীগণকে উমরা আদায় করা থেকে বিরত রেখে তারা তাঁকে পরাজিত ও অপমানিত করতে সক্ষম হয়েছে। ঐ দু'টি গোষ্ঠীর এসব চিন্তার মূলে প্রকৃতপক্ষে যে জিনিসটি কার্যকর ছিল তাহলো আল্লাহ সম্পর্কে তাদের এই কুধারণা যে, তিনি তাঁর নবীকে সাহায্য করবেন না এবং হক ও বাতিলের এ সংঘাতে হকের আওয়াজকে অবদমিত করার অবাধ সুযোগ দেবেন।

১২. অর্থাৎ যে মন্দ পরিণাম থেকে তারা রক্ষা পেতে চাচ্ছিল এবং যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা এসব কৌশল অবলম্বন করেছিল তারা নিজেরাই সে ফাঁদে আটকা পড়েছে। তাদের সেসব কৌশলই তাদের মন্দ পরিণাম ত্বরান্বিত করার কারণ হয়েছে।

১৩. এ কথাটিকে এখানে আরেকটি উদ্দেশ্যে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। ৪ নম্বর আয়াতে কথাটি যে উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল তা হচ্ছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর অতি প্রাকৃতিক বাহনীকে কাজে লাগানোর পরিবর্তে মু'মিনদের

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

হে নবী, আমি তোমাকে সাক্ষ্যদানকারী,১৪ সুসংবাদদানকারী এবং সতর্ককারী১৫ হিসেবে পাঠিয়েছি— যাতে হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন, তাঁকে সাহায্য কর তাঁর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা দেখাও এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর।১৬

হে নবী যারা তোমার হাতে বাইয়াত করছিলো প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর কাছেই বাইয়াত করছিলো।১৭ তাদের হাতের ওপর ছিল আল্লাহর হাত।১৮ যে এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার অশুভ পরিণাম তার নিজের ওপরেই বর্তাবে। আর যে আল্লাহর সাথে কৃত এ প্রতিশ্রুতি পালন করবে,১৯ আল্লাহ অচিরেই তাকে বড় পুরস্কার দান করবেন।

দ্বারাই তা করিয়েছেন। কারণ, তিনি মু'মিনদের পুরস্কৃত করতে চাচ্ছিলেন। আর এখানে এ বিষয়টিকে পুনরায় বর্ণনা করেছেন এ জন্য যে, আল্লাহ যাকে শাস্তি দিতে চান তার মূলোৎপাটনের জন্য তিনি নিজের সৈন্যবাহিনীর মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। কারো এ ক্ষমতা নেই যে, নিজের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার জোরে তাঁর শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারে।

১৪. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (র) شاهد শব্দের অনুবাদ করেছেন اظهار حق كننده সত্য প্রকাশকারনী এবং অন্যান্য অনুবাদকগণ অনুবাদ করেছেন "সাক্ষ্যদানকারী"। শাহাদাত শব্দটি এ দু'টি অর্থই বহন করে। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহযাবের তাফসীর, টীকা ৮২।

১৫. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহযাবের তাফসীর, টীকা ৮৩।

১৬. কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, تُعَزِّرُوهُ ও تُوَقِّرُوهُ শব্দ দু'টির ه সর্বনাম দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং تُسَبِّحُوهُ শব্দের ه সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, "তোমরা রসূলকে সহযোগিতা দান করো এবং তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দেখাও আর সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো।" কিন্তু একই বাক্যের মধ্যে সর্বনামসমূহ দ্বারা কোন ইংগিত ছাড়াই দু'টি আলাদা সত্তাকে বুঝানো হবে তা সঠিক হতে পারে না।

এ কারণে আরেক দল মুফাস্সিরের মতে সবগুলো সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকেই বুঝানো হয়েছে। তাঁদের মতে বাক্যের অর্থ হচ্ছে, "তোমরা আল্লাহর সাথে থাকো, তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দেখাও এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো।"

সকাল ও সন্ধ্যায় পবিত্রতা বর্ণনা করার অর্থ শুধু সকাল ও সন্ধ্যাই নয়, বরং সর্বক্ষণ পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকা। এটা ঠিক তেমনি, যেমন আমরা বলে থাকি অমুক জিনিসটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জুড়ে প্রসিদ্ধ। এর অর্থ এ নয় যে, শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষই বিষয়টি জানে, বরং এর অর্থ হচ্ছে সারা পৃথিবীতেই তা পরিচিত ও আলোচিত।

১৭. পবিত্র মক্কা নগরীতে হযরত উসমানের (রা) শহীদ হয়ে যাওয়ার খবর শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম থেকে হুদাইবিয়া নামক স্থানে যে বাইয়াত নিয়েছিলেন সেই বাইয়াতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক বর্ণনা অনুসারে এ মর্মে বাইয়াত নেয়া হয়েছিলো যে, আমরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবো না। প্রথম মতটি হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে আর দ্বিতীয়টি বর্ণিত হয়েছে হযরত ইবনে উমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ এবং মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে। দু'টিরই প্রতিপাদ্য বিষয় এক। সাহাবীগণ এ সংকল্প নিয়ে রসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা সবাই এখানে এ মুহূর্তেই কুরাইশদের সাথে বুঝাপড়া করবেন, এমনকি পরিণামে সবাই নিহত হলেও। প্রকৃতই হযরত উসমান শহীদ হয়েছেন না জীবিত আছেন এ ক্ষেত্রে তা যেহেতু নিশ্চিত জানা ছিল না তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পক্ষ থেকে নিজের একহাত অন্য হাতের ওপর রেখে বাইয়াত করলেন। এভাবে হযরত উসমান (রা) এ অসাধারণ মর্যাদা লাভ করলেন যে, নবী (সা) নিজের পবিত্র হাতকে তাঁর হাতের স্থলাভিষিক্ত করে তাঁকে বাইয়াতে অংশীদার করলেন। হযরত উসমানের (রা) পক্ষ থেকে নবীর (সা) নিজের বাইয়াত করার অনিবার্য অর্থ হলো তাঁর প্রতি নবীর (সা) এ মর্মে পূর্ণ আস্থা ছিল যে, তিনি যদি উপস্থিত থাকতেন তাহলে অবশ্যই বাইয়াত করতেন।

১৮. অর্থাৎ সে সময় লোকেরা যে হাতে বাইয়াত করছিলো তা ব্যক্তি রসূলের হাত ছিল না, আল্লাহর প্রতিনিধির হাত ছিল এবং রসূলের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথে এ বাইয়াত অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো।

১৯. এখানে একটি অতি সূক্ষ্ম বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। আরবী ভাষার সাধারণ নিয়ম অনুসারে এখানে عَهَدَ عَلَيْهِ اللّٰهَ পড়া উচিত ছিল। কিন্তু এ সাধারণ নিয়ম পরিত্যাগ করে এখানে عَلَيْهُ اللّٰهَ পড়া হয়ে থাকে। আল্লামা আলূসী অস্বাভাবিকভাবে এ اعراب দেয়ার দু'টি কারণ বর্ণনা করেছেন। একটি হচ্ছে, এ বিশেষ ক্ষেত্রে যে মহান সত্তার সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হচ্ছিলো তাঁর মর্যাদা ও জাঁকজমক প্রকাশ উদ্দেশ্য। তাই এখানে عليه এর পরিবর্তে عليه -ই বেশী উপযুক্ত। অপরটি হচ্ছে عليه এর ہ সর্বনাম প্রকৃতপক্ষে هو এর স্থলাভিষিক্ত। আর এর মূল اعراب পেশ; যের নয়। তাই এর মূল اعراب চুক্তি পূরণের বিষয়ের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾

২ রুকূ'

হে নবী (সা)! বদ্দু আরবদের[২০] মধ্যে যাদেরকে পিছনে ছেড়ে যাওয়া হয়েছিল এখন তারা এসে অবশ্যই তোমাকে বলবে ঃ "আমাদেরকে আমাদের ধন–মাল ও সন্তান–সন্ততিদের চিন্তা–ই ব্যস্ত রেখেছিল, আপনি আমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন।" এ লোকেরা নিজেদের মুখে সেসব কথা বলছে যা তাদের অন্তরে থাকে না।[২১] তাদেরকে বলো ঠিক আছে। ইহাই যদি সত্য হয়ে থাকে তা হলে তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালাকে কার্যকর হওয়া থেকে বাধাদানের সামান্য ক্ষমতা কি কারো আছে যদি তিনি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চান; অথবা চান কোন কল্যাণ দান করতে? তোমাদের কাজ–কর্ম সম্পর্কে তো আল্লাহই ভালভাবে অবহিত[২২] (কিন্তু আসল কথা তো তা নয় যা তোমরা বলছো); বরং তোমরা মনে করে নিয়েছ যে, রসূল ও মু'মিনগণ নিজেদের ঘরে কখনই ফিরতে পারবে না। এ খেয়ালটা তোমাদের অন্তরে খুব ভাল লেগেছিল[২৩] এবং তোমরা খুবই খারাব ধারণা মনে স্থান দিয়েছো, আসলে তোমরা খুবই খারাপ মন–মানসিকতার লোক।[২৪]

২০. এটা মদীনার আশেপাশের সেসব লোকদের কথা যাদেরকে উমরা যাত্রার প্রস্তুতিকালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে রওনা হবার আহবান জানিয়েছিলেন। কিন্তু ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও তারা বাড়ী ছেড়ে শুধু এ কারণে বের হয়নি যে, নিজেদের প্রাণ ছিল তাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, এরা ছিল আসলাম, মুযাইনা, জুহাইনা, গিফার, আশজা', দীল প্রভৃতি গোত্রের লোক।

২১. এর দু'টি অর্থ। একটি হচ্ছে তোমার মদীনায় পৌঁছার পর এসব লোক এখন তোমার উমরা যাত্রায় শরীক না হওয়ার যে অজুহাত পেশ করবে তা হবে একটি মিথ্যা

وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٤﴾ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি যারা ঈমান আনেনি এমন কাফেরদের জন্য আমরা দাউ দাউ করে জ্বলা অগ্নি কুণ্ডলি তৈরী করে রেখেছি।[২৫] *আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর বাদশাহীর (প্রভুত্ব ও প্রশাসন ক্ষমতা) একচ্ছত্র মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আল্লাহ–ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।*[২৬]

তোমরা যখন গনীমাতের মাল লাভ করার জন্য যেতে থাকবে তখন এ পিছনে রেখে যাওয়া লোকেরা তোমাকে অবশ্যই বলবে যে, আমাদেরকেও তোমাদের সাথে যেতে দাও।[২৭] *এরা আল্লাহর ফরমান পরিবর্তন করে দিতে চায়।*[২৮] *এদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও ঃ 'তোমরা কখনই আমাদের সাথে যেতে পারো না, আল্লাহ তো আগেই একথা বলে দিয়েছেন।'*[২৯] *এরা বলবেঃ "না, তোমরাই বরং আমাদের প্রতি হিংসা পোষণ কর।" (অথচ এটা কোন হিংসার কথা নয়) আসলে এরা সঠিক কথা খুব কমই বুঝে।*

বাহানা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে কি কারণে তারা যায়নি তা তারা খুব ভাল করেই জানে। অপরটি হচ্ছে, আল্লাহর রসূলের কাছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করা মৌখিক জমা খরচ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে তারা যেমন নিজেদের এ আচরণের জন্য লজ্জিত নয়, তেমনি তাদের এ অনুভূতিও নেই যে, আল্লাহর রসূলকে সহযোগিতা না করে তারা কোন গোনাহর কাজ করেছে। এমনকি তাদের অন্তরে ক্ষমা লাভের কোন আকাংখাও নেই। নিজেরা কিন্তু মনে করে যে, এ বিপজ্জনক সফরে না গিয়ে তারা যারপর নেই বুদ্ধিমত্তার কাজ করেছে। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ক্ষমার পরোয়াই যদি তারা করতো তাহলে বাড়ীতে বসে থাকতে পারতো না।

২২. অর্থাৎ তোমাদের আমলের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহর যে জ্ঞান, সে জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি ফায়সালা করবেন। তোমাদের আমল যদি শাস্তি পাওয়ার মত হয় আর আমি তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করি তাহলেও আমার এ দোয়া আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবে না। আর তোমাদের আমল যদি শাস্তি পাওয়ার মত না হয় আর আমি তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া না করি তাহলে আমার দোয়া না করায় তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আমার নয় আল্লাহর। কারো মুখের কথা তাকে প্রতারিত করতে পারে না। তাই আমি যদি তোমাদের বাহ্যিক কথাবার্তাকে সত্য বলে স্বীকার করেও নেই এবং তার ভিত্তিতে তোমাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়াও করি তাতেও কোন ফায়দা নেই।

২৩. অর্থাৎ তোমরা এই ভেবে খুশী হয়েছো যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহায্যকারী ঈমানদারগণ যে বিপদের মুখে এগিয়ে যাচ্ছেন তা থেকে তোমরা নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছো। তোমাদের মতে এটা ছিল খুবই বুদ্ধিমত্তার কাজ। তাছাড়া একথা ভেবে খুশী হতে তোমাদের একটুও লজ্জা বোধ হলো না যে, রসূল ও ঈমানদারগণ এমন এক অভিযানে যাচ্ছেন যা থেকে জীবিত আর ফিরে আসতে পারবেন না। ঈমানের দাবীদার হয়েও তোমরা এতে উদ্বিগ্ন হলে না। বরং নিজেদের এ আচরণ তোমাদের এতই ভাল মনে হলো যে, তোমরা অন্তত রসূলের সাথে এ বিপদের মধ্যে নিজেদেরকে নিক্ষেপ করোনি।

২৪. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে كُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا । بُور শব্দটি بائر শব্দের বহুবচন। بائر শব্দের দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে পাপী ও বিকৃত ব্যক্তি যে কোন ভাল কাজের যোগ্য নয়, যার উদ্দেশ্য অসৎ ও বিকৃত। অপরটি হচ্ছে, ধ্বংসকারী, মন্দ পরিণাম এবং ধ্বংসের পথগামী।

২৫. আল্লাহ এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় এমন সব মানুষকে কাফের ও ঈমানহীন বলে আখ্যায়িত করছেন যারা আল্লাহ ও তাঁর দীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ নয় এবং পরীক্ষার সময় দীনের জন্য নিজের প্রাণ, সম্পদ ও স্বার্থের ঝুঁকি এড়িয়ে চলে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, এটা এমন কুফরী নয় যার ভিত্তিতে এ পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে ইসলাম থেকে খারিজ বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এটা বরং এমন ধরনের কুফরী যার কারণে সে আখেরাতে বেঈমান বলে ঘোষিত হবে। এর প্রমাণ ঃ এ আয়াত নাযিলের পরেও যাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসব লোককে ইসলাম থেকে খারিজ ঘোষণা করেননি কিংবা কাফেরদের সাথে যে ধরনের আচরণ করা যায় সে রকম আচরণও করেননি।

২৬. ওপরে উল্লেখিত চরম সাবধান বাণীর পর আল্লাহর 'গাফুর' (ক্ষমাশীল) ও 'রাহীম' (পরম দয়ালু) হওয়ার উল্লেখের মধ্যে উপদেশের একটি সূক্ষ্ম দিক বিদ্যমান। এর অর্থ হচ্ছে, এখনো যদি তোমরা নিজেদের অসৎ ও নিষ্ঠাহীন আচরণ পরিত্যাগ করে সৎ ও নিষ্ঠার পথে আস তাহলে দেখবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি তোমাদের অতীত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন এবং নিজেদের নিষ্ঠার কারণে তোমরা যে আচরণ পাওয়ার যোগ্য হবে ভবিষ্যতে তিনি তোমাদের সাথে সে আচরণই করবেন।

২৭. অর্থাৎ অচিরেই এমন সময় আসছে যখন এসব লোক—যারা আজ তোমার সংগে এ বিপজ্জনক অভিযানে অংশ গ্রহণ এড়িয়ে গেল—তোমাকে এমন এক অভিযানে যেতে দেখবে যাতে তারা সহজ বিজয় এবং প্রচুর গনীমতের সম্পদ হস্তগত হচ্ছে বলে মনে করবে। তখন তারা নিজেরাই দৌড়ে এসে বলবে, আমাদেরকেও সাথে নিয়ে চলুন। বস্তুত হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তির তিন মাস পরই সে সুযোগ আসলো যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে অতি সহজেই তা দখল করে নিলেন। সে সময় প্রত্যেকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো, কুরাইশদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর এখন শুধু খায়বারই নয়, তায়মা, ফাদাক, ওয়াদিউল কুরা এবং উত্তর হিজাযের অন্য সব ইহুদীও মুসলমানদের শক্তির মোকাবিলা করতে পারবে না। এসব জনপদ এখন পাকা ফলের মত সহজেই মুসলমানদের দখলে চলে আসবে। তাই আল্লাহ তা'আলা এসব আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আগেই এ মর্মে সতর্ক করে দিলেন যে, মদীনার আশেপাশের সুযোগ সন্ধানী লোকেরা এসব সহজ বিজয় অর্জিত হতে দেখে তাতে ভাগ বসানোর জন্য এসে হাজির হবে। কিন্তু তুমি তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেবে যে, তোমাদেরকে এতে ভাগ বসানোর সুযোগ কখনো দেয়া হবে না। এটা তাদের প্রাপ্য যারা বিপদ-মুসিবতের মোকাবিলায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে এসেছিলো।

২৮. আল্লাহর ফরমান অর্থ খায়বার অভিযানে নবীর (সা) সাথে কেবল তাদেরকেই যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে যারা হুদাইবিয়া অভিযানেও তাঁর সাথে গিয়েছিলেন এবং বাইয়াতে রিদওয়ানেও তাঁর সাথে শরীক হয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা খাইবারের গনীমতের সম্পদ তাদের জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। পরবর্তী ১৮ আয়াতে এ বিষয়টিই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

২৯. "আল্লাহ পূর্বেই একথা বলেছেন," কথাটি দ্বারা লোকের মনে এ মর্মে একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, এ আয়াতের আগে এ বিষয়বস্তু সম্বলিত আরো কোন নির্দেশ নাযিল হয়ে থাকবে। এখানে সে দিকেই ইংগিত দেয়া হয়েছে। আর যেহেতু এ সূরার মধ্যে এ বিষয় সম্বলিত কোন নির্দেশ এর আগে পাওয়া যায় না। তাই তারা কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে তা অনুসন্ধান করতে শুরু করে এবং সূরা তাওবার ৮৪ আয়াত তারা পেয়ে যায় যাতে আরেকটি প্রসংগে এ একই বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ আয়াত এ ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। কারণ, ঐ আয়াত তাবুক যুদ্ধের প্রসংগে নাযিল হয়েছিলো। আর তা নাযিল হয়েছিলো সূরা ফাতহ্ নাযিল হওয়ার তিন বছর পর। প্রকৃত ব্যাপার হলো, এ আয়াতটিতে এ সূরারই ১৮ ও ১৯ আয়াতের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। আর "ইতিপূর্বেই আল্লাহ বলেছেন" কথাটির অর্থ এ আয়াতের পূর্বে বলা নয়, বরং পেছনে রেখে যাওয়া লোকদের সাথে এ কথাবার্তা হতে যাচ্ছিল—যে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আগেই দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে—খায়বার অভিযানে যাওয়ার সময়। অথচ সম্পূর্ণ সূরাটির—যার মধ্যে ১৮ ও ১৯ আয়াত আছে—তার তিন মাস পূর্বে হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে নাযিল হয়েছিলো। বক্তব্যের ধারা যদি পাঠক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে বুঝতে পারবেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে তাঁর রসূলকে এই বলে নির্দেশনা দিচ্ছেন যে, তোমার মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর পিছনে থেকে

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾ لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

এ পিছনে রেখে যাওয়া বদ্দু আরবদেরকে বলে দাও ঃ "খুব শীঘ্রই তোমাদেরকে এমন সব লোকের সাথে লড়াই করার জন্য ডাকা হবে যারা বড়ই শক্তি সম্পন্ন।" তোমাদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে, কিংবা তারা অনুগত হয়ে যাবে।[৩০] *সে সময় তোমরা জিহাদের নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম সওয়াব দিবেন। আর যদি তোমরা পিছনে হটে যাও যেমন পূর্বে হটে গিয়েছিলে, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি দেবেন। যদি অন্ধ, পংগু ও রোগাক্রান্ত লোক জিহাদে না আসে তাহলে কোন দোষ নেই।*[৩১] *যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে সেসব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যেসবের নিম্নদেশে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবহমান থাকবে। আর যে মুখ ফিরিয়ে থাকবে আল্লাহ তাকে মর্মান্তিক আযাব দেবেন।*

যাওয়া এসব লোক যখন তোমার কাছে এসে এসব ওজর পেশ করবে তখন তাদেরকে এ জবাব দিবে এবং খায়বার অভিযানে যাত্রাকালে যখন তারা তোমার সাথে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করবে তখন তাদের একথা বলবে।

৩০. মূল আয়াতে ব্যবহৃত বাক্যাংশ হচ্ছে أَوْ يُسْلِمُونَ । এর দু'টি অর্থ হতে পারে এবং এখানে দু'টি অর্থই উদ্দেশ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। অপর অর্থটি হচ্ছে, তারা ইসলামী সরকারের বশ্যতা স্বীকার করবে।

৩১. অর্থাৎ জিহাদে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তির সামনে প্রকৃতই কোন ওজর প্রতিবন্ধক হবে তার কোন দোষ নেই। কিন্তু সুঠাম ও সবলদেহী মানুষ যদি ছল–ছুতার ভিত্তিতে বিরত থাকে তাহলে তাকে আল্লাহ ও তাঁর দীনের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান বলে স্বীকার করা যায় না। তাকে এ সুযোগও দেয়া যায় না যে, সে মুসলিম সমাজের অন্তরভুক্ত

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ
مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾ وَمَغَانِمَ
كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً
تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ
آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾

৩ রুকূ'

আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে তোমার কাছে বাইয়াত করছিলো।[৩২] তিনি তাদের মনের অবস্থা জানতেন। তাই তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করেছেন,[৩৩] পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে আশু বিজয় দান করেছেন এবং প্রচুর গনীমতের সম্পদ দান করেছেন যা তারা অচিরেই লাভ করবে।[৩৪] আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। আল্লাহ তোমাদেরকে অঢেল গনীমতের সম্পদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যা তোমরা লাভ করবে।[৩৫] তিনি তোমাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে এ বিজয় দিয়েছেন[৩৬] এবং তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষের হাত উত্তোলনকে থামিয়ে দিয়েছেন[৩৭] যাতে মু'মিনদের জন্য তা একটি নিদর্শন হয়ে থাকে।[৩৮] আর আল্লাহ তোমাদেরকে সোজা পথের হিদায়াত দান করেন।[৩৯]

হওয়ার সমস্ত সুযোগ–সুবিধা ভোগ করবে, কিন্তু যখন ইসলামের জন্য কুরবানী পেশ করার সময় আসবে তখন নিজের জান ও মালের নিরাপত্তার চিন্তায় বিভোর হবে।

এখানে জেনে নেয়া দরকার যে, শরীয়াতে যাদেরকে জিহাদে অংশ গ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে তারা দু' ধরনের মানুষ। এক, যারা দৈহিকভাবে যুদ্ধের উপযুক্ত নয়। যেমন ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বালক, নারী, পাগল, অন্ধ, সামরিক সেবা দিতে অক্ষম এমন রোগগ্রস্ত লোক এবং হাত পা অকেজো হওয়ার কারণে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে অক্ষম ব্যক্তিরা। দুই, অন্য কিছু যুক্তিসংগত কারণে যাদের পক্ষে জিহাদে অংশ গ্রহণ কঠিন। যেমন ঃ ক্রীতদাস, কিংবা এমন লোক যারা যুদ্ধে অংশ নিতে প্রস্তুত, কিন্তু যুদ্ধাস্ত্র এবং অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় উপায়–উপকরণ সংগ্রহ করতে অক্ষম। অথবা এমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, অতি সত্বর যার ঋণ পরিশোধ করা দরকার এবং ঋণদাতা যাকে অবকাশ দিচ্ছে না। অথবা এমন ব্যক্তি যার পিতা–মাতা বা তাদের কোন একজন জীবিত আছে এবং তারা তার সেবা–যত্নের মুখাপেক্ষী। এ ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন যে,

পিতা–মাতা যদি মুসলমান হয় তাহলে তাদের অনুমতি ছাড়া সন্তানের জিহাদে যাওয়া উচিত নয়। তবে তারা যদি কাফের হয়, তাহলে তাদের বাধা দেয়ায় কারো জিহাদ থেকে বিরত থাকা জায়েয নয়।

৩২. হুদাইবিয়া নামক স্থানে সাহাবায়ে কিরামের কাছে যে বাইয়াত নেয়া হয়েছিল এখানে পুনরায় তার উল্লেখ করা হচ্ছে। এ বাইয়াতকে "বাইয়াতে রিদওয়ান" বলা হয়ে থাকে। কারণ, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ দান করেছেন যে, যারা এ ভয়ংকর পরিস্থিতিতে জীবন বাজি রাখতে সামান্য দ্বিধাও করেনি এবং রসূলের হাতে হাত দিয়ে জীবনপাত করার বাইয়াত করে ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করেছে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। সময়টি ছিল এমন যে, মুসলমানগণ শুধুমাত্র একখানা করে তরবারি নিয়ে এসেছিলেন এবং সংখ্যায় ছিলেন মাত্র চৌদ্দ শ'। তাদের পরিধানেও সামরিক পোশাক ছিল না বরং ইহ্‌রামের চাদর বাঁধা ছিল। নিজেদের সামরিক কেন্দ্র (মদীনা) থেকে আড়াই শ' মাইল এবং শত্রুদের দূর্গ থেকে মাত্র ১৩ মাইল দূরে ছিল যেখান থেকে শত্রুরা সব রকমের সাহায্য লাভ করতে পারতো। আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর দীনের প্রতি এ মানুষগুলোর মনে যদি আন্তরিকতার সামান্য ঘাটতিও থাকতো তাহলে তারা এ চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিত্যাগ করে চলে যেতো এবং ইসলাম বাতিলের সাথে লড়াইয়ে চিরদিনের জন্য হেরে যেতো। আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা ছাড়া বাইরের এমন কোন চাপ তাদের ওপর ছিল না যা তাদেরকে এ বাইয়াত গ্রহণে বাধ্য করতে পারতো। আল্লাহর দীনের জন্য সবকিছু করতে সে মুহূর্তেই তাদের প্রস্তুত হয়ে যাওয়া স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, তাঁরা তাঁদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী ও আন্তরিক এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে পূর্ণতার স্তরে উন্নীত। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে সন্তুষ্টির এ সনদ দান করেছেন। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার পর কেউ যদি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় কিংবা তাদেরকে তিরস্কার করার সাহস করে তাহলে তাদের বুঝাপড়া তাদের সাথে নয়, আল্লাহর সাথে। এ ক্ষেত্রে যারা বলে, যে সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে সন্তুষ্টির এ সনদ দান করেছিলেন তখন তাঁরা আন্তরিক ছিলেন ঠিকই, কিন্তু পরে তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য হারিয়ে ফেলেছেন, তারা সম্ভবত আল্লাহ সম্পর্কে এ কুধারণা পোষণ করে যে, এ আয়াত নাযিল করার সময় তিনি তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতেন না। তাই শুধু সে সময়কার অবস্থা দেখে তিনি তাদেরকে এ সনদপত্র দিয়ে ফেলেছেন। আর সম্ভবত এ নাজানার কারণেই তাঁর পবিত্র কিতাবেও তা অন্তরভুক্ত করেছেন যাতে পরে যখন এরা অবিশ্বাসী হয়ে যাবে তখনো দুনিয়ার মানুষ তাদের সম্পর্কে এ আয়াত পড়তে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার 'গায়েবী ইলম' সম্পর্কে বাহবা দিতে থাকে যিনি (নাউযুবিল্লাহ) ঐ অবিশ্বাসীদেরকে সন্তুষ্টির এ সনদপত্র দান করেছিলেন।

যে গাছের নিচে এ বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়েছিলো সেটি সম্পর্কে হযরত ইবনে উমরের আযাদকৃত ক্রীতদাস নাফে'র এ বর্ণনাটি সাধারণভাবে ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে যে, লোকজন সেখানে গিয়ে নামায পড়তে শুরু করেছিলো। বিষয়টি জানতে পেরে হযরত উমর (রা) লোকদের তিরস্কার করেন এবং গাছটি কাটিয়ে ফেলেন। (তবকাতে ইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০০) কিন্তু এর বিপরীতমুখী কয়েকটি বর্ণনাও রয়েছে। হযরত নাফে' থেকেই তবকাতে ইবনে সা'দে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, বাইয়াতে রিদওয়ানের

কয়েক বছর পর সাহাবায়ে কিরাম ঐ গাছটি তালাশ করেছিলেন কিন্তু চিনতে পারেননি এবং সে গাছটি কোনটি সে ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়ে যায় (পৃঃ ১০৫) দ্বিতীয় বর্ণনাটি বুখারী, মুসলিম ও তবকাতে ইবনে সা'দে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের। তিনি বলেন ঃ আমার পিতা বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন, পরের বছর আমরা যখন উমরাতুল কাযার জন্য গিয়েছিলাম তখন গাছটি হারিয়ে ফেলেছিলাম। অনুসন্ধান করেও তার কোন হদিস করতে পারিনি। তৃতীয় বর্ণনাটি ইবনে জারীরের। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফত কালে যখন হুদাইবিয়া অতিক্রম করেন তখন জিজ্ঞেস করেন, যে গাছটির নিচে বাইয়াত হয়েছিলো তা কোথায়? কেউ বলে, অমুক গাছটি এবং কেউ বলেন অমুকটি। তখন হযরত উমর (র) বলেন, এ কষ্ট বাদ দাও, এর কোন প্রয়োজন নেই।

৩৩. এখানে سكينة অর্থ মনের সে বিশেষ অবস্থা যার ওপর নির্ভর করে কোন ব্যক্তি কোন মহত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঠাণ্ডা মনে পূর্ণ প্রশান্তি ও তৃপ্তি সহ নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয় এবং কোন ভয় বা দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ছাড়াই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ফলাফল যাই হোক না কেন এ কাজ করতেই হবে।

৩৪. এটা খায়বার বিজয় ও সেখানকার গনীমতের সম্পদের প্রতি ইংগিত। আর এ আয়াত এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে যে, আল্লাহ তা'আলা এ পুরস্কারটি কেবল তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন যারা বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক ছিলেন। এ বিজয় ও গনীমতের সম্পদে তাদের ছাড়া আর কারো শরীক হওয়ার অধিকার ছিল না। এ কারণে ৭ম হিজরী সনের সফর মাসে যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার আক্রমণের জন্য যাত্রা করলেন তখন তিনি কেবল তাদেরকেই সংগে নিলেন। এতে সন্দেহ নেই যে, পরে নবী (সা) হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী মুহাজির এবং দাওস ও আশয়ারী গোত্রের কোন কোন সাহাবীকেও খায়বারের গনীমতের মাল থেকে কিছু অংশ দিয়েছিলেন। তবে তা হয় 'খুমুস' (এক–পঞ্চমাংশ) থেকে নয়তো বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদের সম্মতিক্রমে দিয়েছিলেন। কাউকে তিনি ঐ সম্পদের হকদার বানাননি।

৩৫. খায়বার বিজয়ের পর মুসলমানরা ক্রমাগত আর যেসব বিজয় লাভ করে এর দ্বারা সেসব বিজয়কে বুঝানো হয়েছে।

৩৬. এর অর্থ হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি। এ চুক্তিকেই সূরার প্রারম্ভে 'ফাত্‌হে মুবীন' (সুস্পষ্ট বিজয়) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৩৭. অর্থাৎ তিনি কাফের কুরাইশদের এতটা সাহস দেননি যে, হুদাইবিয়াতে তারা তোমাদের সাথে লড়াই বাধিয়ে বসতে পারতো। অথচ সমস্ত বাহ্যিক অবস্থার দিক থেকে তারা অনেক ভাল অবস্থানে ছিল এবং সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তোমাদের পাল্লা তাদের চেয়ে অনেক বেশী দুর্বল বলে মনে হচ্ছিলো। এ ছাড়াও এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে, সে সময় কোন শত্রুশক্তি মদীনার ওপর আক্রমণ করতে সাহস পায়নি। অথচ যুদ্ধক্ষম চৌদ্দ শ' যোদ্ধা পুরুষ মদীনার বাইরে চলে যাওয়ার কারণে মদীনার যুদ্ধক্ষেত্র অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলো এবং ইহুদী, মুশরিক ও মুনাফিকরা এ পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে লাভবান হতে পারতো।

وَّأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾

এ ছাড়া তিনি তোমাদেরকে আরো গনীমতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যা তোমরা এখনো পর্যন্ত লাভ করতে পারনি। কিন্তু আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।[৪০] আল্লাহ সবকিছুর ওপরে ক্ষমতাবান।

এ মুহূর্তেই এসব কাফের যদি তোমাদের সাথে লড়াই বাধিয়ে বসতো তাহলে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতো এবং কোন সহযোগী ও সাহায্যকারী পেতো না।[৪১] এটা আল্লাহর বিধান যা পূর্ব থেকেই চলে আসছে।[৪২] তুমি আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না। তিনিই সেই সত্তা যিনি মক্কা ভূমিতে তাদের হাত তোমাদের থেকে আর তোমাদের হাত তাদের থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তাদের ওপর তোমাদেরকে আধিপত্য দান করার পর। তোমরা যা কিছু করছিলে আল্লাহ তা দেখছিলেন।

৩৮. অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের নীতিতে স্থির সংকল্প থাকে এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা করে ন্যায় ও সত্যের পক্ষ অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় আল্লাহ তাদের কতভাবে সাহায্য-সহযোগিতা দান করে পুরস্কৃত করেন তার নিদর্শন।

৩৯. অর্থাৎ তোমরা আরো দূরদৃষ্টি ও দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করবে। ভবিষ্যতেও এভাবেই আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করে ন্যায় ও সত্যের পথে অগ্রসর হতে থাকবে। আর এসব অভিজ্ঞতা এ শিক্ষাদান করবে যে, আল্লাহর দীন যে পদক্ষেপের দাবী করছে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে সে পদক্ষেপ গ্রহণ করাই মু'মিনের কাজ। আমার শক্তি কতটা এবং বাতিলের শক্তি কত প্রবল এ বাছ বিচার ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে যেন সে পড়ে না থাকে।

৪০. খুব সম্ভবত এখানে মক্কা বিজয়ের প্রতি ইংগিত দান করা হয়েছে। কাতাদাও এ মত পোষণ করেছেন এবং ইবনে জারীরও এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহর একথাটার উদ্দেশ্য যা বুঝা যায় তা হচ্ছে, মক্কা এখনো তোমাদের করায়ত্ব হয়নি। তবে তাকে আল্লাহ পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন এবং হুদাইবিয়ার এ বিজয়ের ফলশ্রুতিতে তাও তোমাদের করায়ত্ব হবে।

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾

এরাই তো সেসব লোক যারা কুফরী করেছে, তোমাদেরকে মসজিদে হারামে যেতে বাধা দিয়েছে এবং কুরবানীর উটসমূহকে কুরবানী গাহে পৌঁছতে দেয়নি।[৪৩] যদি (মক্কায়) এমন ঈমানদার নারী পুরুষ না থাকতো যাদেরকে তোমরা চিন না অজান্তে তাদেরকে পদদলিত করে ফেলবে এবং তাদের কারণে তোমরা বদনাম কুড়াবে এমন আশংকা না থাকতো (তাহলে যুদ্ধ থামানো হতো না। তা বন্ধ করা হয়েছে এ কারণে) যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা যেন তাঁর রহমতের মধ্যে স্থান দেন। সেসব মু'মিন যদি আলাদা হয়ে যেতো তাহলে (মক্কাবাসীদের মধ্যে) যারা কাফের ছিল আমি অবশ্যই তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতাম।[৪৪] এ কারণেই যখন ঐসব কাফেররা তাদের মনে জাহেলী সংকীর্ণতার স্থান দিল[৪৫] তখন আল্লাহ তাঁর রসূল ও ঈমানদারদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন[৪৬] এবং তাদেরকে তাকওয়ার নীতির ওপর সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখলেন। তারাই এ জন্য বেশী উপযুক্ত ও হকদার ছিল। আল্লাহ সব জিনিস সম্পর্কেই পরিজ্ঞাত।

৪১. অর্থাৎ হুদাইবিয়াতে যুদ্ধ হলে তোমাদের পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আল্লাহ এ জন্য সেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেননি তা নয়, বরং এর উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন কিছু যা পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হচ্ছে। সে উদ্দেশ্য ও কৌশল যদি বাধা না হতো এবং আল্লাহ তা'আলা এখানে যুদ্ধ সংঘটিত হতে দিতেন তাহলে নিশ্চিতভাবে কাফেররাই পরাজয় বরণ করতো এবং পবিত্র মক্কা তখন বিজিত হতো।

৪২. এখানে আল্লাহর বিধান বলতে বুঝানো হয়েছে, যেসব কাফের আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন এবং তাঁর রসূলকে সাহায্য করেন।

৪৩. অর্থাৎ ইসলামের জন্য যে আন্তরিকতা নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে তোমরা জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলে এবং বিনা বাক্যে যেভাবে রসূলের আনুগত্য করছিলে আল্লাহ তা দেখছিলেন। তিনি এও দেখছিলেন যে, কাফেররা সত্যিই বাড়াবাড়ি করছে। তোমাদের হাতে তৎক্ষণাৎ সেখানেই তাদেরকে শাস্তি দেয়া ছিল পরিস্থিতির দাবী। কিন্তু এসব সত্ত্বেও একটি বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তিনি তোমাদের হাত তাদের ওপর এবং তাদের হাত তোমাদের ওপর উত্তোলিত হওয়া থেকে বিরত রেখেছিলেন।

৪৪. আল্লাহ তা'আলা যে উদ্দেশ্য ও কৌশলের কারণে হুদাইবিয়াতে যুদ্ধ হতে দেননি এটাই সে উদ্দেশ্য ও কৌশল। এ উদ্দেশ্য ও কৌশলের দু'টি দিক আছে। একটি হচ্ছে সে সময় মক্কায় এমন অনেক নারী ও পুরুষ বর্তমান ছিলেন। যারা হয় তাদের ঈমান গোপন রেখেছিলেন নয়তো তাদের ঈমান গ্রহণ সম্পর্কে সবার জানা থাকলেও নিজেদের অসহায়ত্বের কারণে হিজরত করতে সক্ষম ছিলেন না এবং জুলুম-নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলো। যদি এ পরিস্থিতিতে যুদ্ধ সংঘটিত হতো এবং মুসলমানরা কাফেরদেরকে চরমভাবে পর্যুদস্ত করে পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করতো তাহলে অজানা ও অচেনা হওয়ার কারণে কাফেরদের সাথে এ মুসলমানরাও নিহত হতো। এর কারণে মুসলমানরা নিজেরাও দুঃখ ও পরিতাপে দগ্ধ হতো এবং আরবের মুশরিকরাও একথা বলার সুযোগ পেয়ে যেতো যে, যুদ্ধের ময়দানে নিজেদের দীনী ভাইয়ের হত্যা করতেও এসব লোক দ্বিধাবোধ করে না। তাই আল্লাহ তা'আলা অসহায় এ মুসলমানদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এবং সাহাবীদেরকে মনোকষ্ট ও বদনাম থেকে রক্ষার জন্য এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেননি। এ উদ্দেশ্য ও কৌশলের আরেকটি দিক এই যে, আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদেরকে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরাজিত করে মক্কা বিজিত করাতে চাচ্ছিলেন না। বরং তিনি চাচ্ছিলেন, দুই বছরের মধ্যে তাদেরকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে এমন অসহায় করে ফেলবেন যেন কোন প্রতিরোধ ছাড়াই তারা পরাজিত হয় এবং সমগ্র গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করে। মক্কা বিজয়ের সময় এ ঘটনাটিই ঘটেছিল।

এ ক্ষেত্রে একটি আইনগত বিতর্ক দেখা দেয়। যদি আমাদের ও কাফেরদের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে এবং কাফেরদের কব্জায় কিছু সংখ্যক মুসলিম নারী, পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধ থাকে আর তাদেরকে তারা মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে সামনে নিয়ে আসে কিংবা আমরা কাফেরদের যে শহরের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছি সেখানে কিছু মুসলিম বসতি থেকে থাকে, কিংবা কাফেরদের কোন যুদ্ধ জাহাজ আক্রমণের পাল্লায় এসে পড়ে এবং কাফেররা তার মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলমানকে রেখে দেয় তাহলে এরূপ পরিস্থিতিতে আমরা কি তাদের ওপর গোলাবর্ষণ করতে পারি? এ প্রশ্নের জবাবে ফকীহগণ যেসব সিদ্ধান্ত ও মতামত দিয়েছেন তা নিম্নরূপ ঃ

ইমাম মালেক (র) বলেন, এরূপ পরিস্থিতিতে গোলাবর্ষণ না করা উচিত। এ আয়াতটিকে তিনি এর দলীল হিসেবে পেশ করেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের রক্ষার জন্যই তো হুদাইবিয়াতে যুদ্ধ হতে দেননি। (আহকামুল কুরআন

—ইবনুল আরাবী) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা একটা দুর্বল দলীল। আয়াতের মধ্যে এমন কোন শব্দ নেই যা থেকে এ বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, এরূপ পরিস্থিতিতে হামলা করা হারাম ও নাজায়েয। এর দ্বারা বড় জোর এতটুকু কথা প্রমাণিত হয় তাহচ্ছে এ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য হামলা করা থেকে বিরত থাকা যেতে পারে, যদি বিরত থাকার ক্ষেত্রে এ আশংকা সৃষ্টি না হয় যে, কাফেররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করবে, কিংবা তাদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় লাভ করার সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র), ইমাম যুফার (র) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এ পরিস্থিতিতে গোলাবর্ষণ করা সম্পূর্ণরূপে জায়েয। এমনকি কাফেররা যদি মুসলমানদের শিশুদেরকেও ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে সামনে খাড়া করে তবুও তাদের ওপর গোলা বর্ষণ করায় কোন দোষ নেই। এ অবস্থায় যেসব মুসলমান মারা যাবে তাদের জন্য কোন কাফ্ফারা বা রক্তপণও মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব হবে না। (আহকামুল কুরআন—জাস্সাস, ইমাম মুহাম্মাদের কিতাবুস সিয়ার, অনুচ্ছেদ ঃ কাতউল মায়ে আন আহলিল হারব)

ইমাম সুফিয়ান সাওরীও এ পরিস্থিতিতে গোলাবর্ষণ জায়েয মনে করেন। কিন্তু তিনি বলেন, এ অবস্থায় যেসব মুসলমান মারা যাবে তাদের রক্তপণ দিতে হবে না। তবে সে জন্য কাফ্ফারা দেয়া মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব। (আহকামুল কুরআন—জাস্সাস)

ইমাম আওযায়ী এবং লাইস ইবনে সা'দ বলেন, কাফেররা যদি মুসলমানদেরকে ঢাল বানিয়ে সামনে ধরে তাহলে তাদের ওপর গুলি চালানো উচিত নয়। অনুরূপ আমরা যদি জানতে পারি যে, তাদের যুদ্ধ জাহাজে আমাদের বন্দীও আছে তাহলে সে অবস্থায় উক্ত যুদ্ধ জাহাজ না ডুবানো উচিত। কিন্তু আমরা যদি তাদের কোন শহরের ওপর আক্রমণ চালাই এবং জানতে পারি যে, ঐ শহরে মুসলমানও আছে তাহলেও তাদের ওপর গোলাবর্ষণ করা জায়েয। কারণ, আমাদের গোলা কেবল মুসলমানদের ওপরই পড়বে তা নিশ্চিত নয়। আর কোন মুসলমান যদি এ গোলাবর্ষণের শিকার হয়ও তাহলে তা আমাদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের উদ্দেশ্যমূলক হত্যা হবে না, বরং তা হবে আমাদের ইচ্ছার বাইরের একটি দুর্ঘটনা। (আহকামুল কুরআন—জাস্সাস)

এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর (র) মাযহাব হলো, এ অবস্থায় যদি গোলাবর্ষণ অনিবার্য না হয় তাহলে ধ্বংসের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার চেষ্টা চালানো উত্তম যদিও এ ক্ষেত্রে গোলাবর্ষণ করা হারাম নয় তবে নিসন্দেহে মাকরূহ। তবে প্রকৃতই যদি গোলাবর্ষণের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সন্দেহ থাকে যে, এরূপ না করা হলে যুদ্ধ পরিস্থিতি কাফেরদের জন্য লাভজনক এবং মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর হবে তাহলে সে ক্ষেত্রে গোলাবর্ষণ করা জায়েয। তবে এ পরিস্থিতিতেও মুসলমানদের রক্ষা করার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাছাড়া ইমাম শাফেয়ী এ মতও পোষণ করেন যে, যদি কাফেররা যুদ্ধের ময়দানে কোন মুসলমানকে ঢাল বানিয়ে সামনে ধরে এবং কোন মুসলমান তাকে হত্যা করে তাহলে তার দু'টি অবস্থা হতে পারে ঃ এক, হত্যাকারীর জানা ছিল যে, সে মুসলমান। দুই, সে জানতো না যে, সে মুসলমান। প্রথম অবস্থায় রক্তপণ ও কাফ্ফারা উভয়টিই তার ওপর ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় অবস্থায় শুধু কাফ্ফারা ওয়াজিব। (মুগনিউল মুহতাজ)

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾

৪ রুকূ'

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন—যা ছিল সরাসরি হক।[৪৭] ইনশাআল্লাহ[৪৮] তোমরা পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে।[৪৯] নিজেদের মাথা মুণ্ডন করবে, চুল কাটাবে[৫০] এবং তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। তোমরা যা জানতে না তিনি তা জানতেন। তাই স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করার পূর্বে তিনি তোমাদেরকে এ আসন্ন বিজয় দান করেছেন।

আল্লাহই তো সে মহান সত্তা যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন তাকে সমস্ত দীনের ওপর বিজয়ী করে দেন। আর এ বাস্তবতা সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষই যথেষ্ট।[৫১]

৪৫. জাহেলী সংকীর্ণতা অর্থ হলো, এক ব্যক্তির শুধু তার মর্যাদা রক্ষার জন্য কিংবা নিজের কথার মর্যাদা রক্ষার জন্য জেনে শুনে কোন অবৈধ কাজ করা। মক্কার কাফেররা জানতো এবং মানতো যে, হজ্জ ও উমরার জন্য বায়তুল্লাহর যিয়ারত করার অধিকার সবারই আছে। এ ধর্মীয় কর্তব্য পালনে বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই। এটা ছিল আরবের সুপ্রাচীন ও সর্বজন স্বীকৃত আইন। কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদেরকে অন্যায় ও অসত্যের অনুসারী এবং মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণ ন্যায় ও সত্যের অনুসারী বলে জানা সত্ত্বেও শুধু নিজেদের মর্যাদা রক্ষার খাতিরে মুসলমানদের উমরা করতে বাধা দান করে। এমনকি মুশরিকদের মধ্যেও যারা সত্যানুসারী ছিল তারাও বলছিলো যে, যারা ইহ্রাম অবস্থায় কুরবানীর উট সাথে নিয়ে উমরা পালন করতে এসেছে তাদেরকে বাধা দেয়া একটি অন্যায় কাজ। কিন্তু কুরাইশ নেতারা শুধু একথা ভেবে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর ছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি এত বড় দলবল নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন তাহলে সমগ্র আরবে আমাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। এটাই ছিল তাদের জাহেলী সংকীর্ণতা।

৪৬. এখানে سكينة অর্থ ধৈর্য ও মর্যাদা যা দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানগণ কাফের কুরাইশদের এ জাহেলী সংকীর্ণতার মোকাবিলা করেছিলেন। তাঁরা তাদের এ হঠকারিতা ও বাড়াবাড়িতে উত্তেজিত হয়ে সংযম হারিয়ে

ফেলেছিলেন না এবং তাদের মোকাবিলায় এমন কোন কথাও তারা বলেননি যা ন্যায়ের সীমা ছাড়িয়ে যায় ও সত্যের পরিপন্থী হয় কিংবা যার কারণে কাজ সুন্দর ও সার্থকভাবে সম্পাদিত হওয়ার পরিবর্তে আরো বেশী এলোমেলো ও বিশৃংখল হয়ে যায়।

৪৭. যে প্রশ্নটি মুসলমানদের মনে বারবার খটকা সৃষ্টি করছিলো এটি তারই জবাব। তারা বলতো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছেন এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন। কিন্তু কি হলো যে, আমরা উমরা আদায় করা ছাড়াই ফিরে যাচ্ছি। এর জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদিও বলেছিলেন যে, স্বপ্নে তো এ বছরই উমরা আদায় করার কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু না কিছু উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা মুসলমানদের মনের মধ্যে তখনো অবশিষ্ট ছিল। অতএব আল্লাহ তা'আলা নিজেই স্পষ্ট করে বললেন, স্বপ্ন আমি দেখিয়েছিলাম আর তা ছিল পুরোপুরি সত্য এবং নিশ্চিতভাবেই তা পূরণ হবে।

৪৮. এখানে আল্লাহ তা'আলা নিজে তাঁর প্রতিশ্রুতির সাথে ইনশাআল্লাহ কথাটি ব্যবহার করেছেন। এ ক্ষেত্রে কেউ প্রশ্ন উথাপন করতে পারে যে, আল্লাহ নিজেই যখন এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তখন তাকে আল্লাহর চাওয়ার সাথে শর্তযুক্ত করার অর্থ কি? এর জবাব হচ্ছে, এখানে যে কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ যদি না চান তাহলে তিনি এ প্রতিশ্রুতি পালন করবেন না। বরং যে প্রেক্ষিতে এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এর সম্পর্ক তার সাথে। মক্কার কাফেররা যে ধারণার বশবর্তী হয়ে মুসলমানদেরকে উমরা থেকে বিরত রাখার জন্য এ খেলা খেলেছিলো তা হচ্ছে আমরা যাকে উমরা করতে দিতে চাইবো সে–ই কেবল উমরা করতে পারবে এবং যখন করতে দিব তখনই মাত্র করতে পারবে। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেছেন, এটা তাদের ইচ্ছার ওপর নয় বরং আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এ বছর উমরা হতে না পারার কারণ এটা নয় যে, মক্কার কাফেররা তাই চেয়েছিলো। বরং তা হয়েছে এ জন্য যে, আমি তা হতে দিতে চাইনি। আমি যদি চাই তাহলে ভবিষ্যতে এ উমরা হবে, কাফেররা তা হতে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করুক বা না করুক। সাথে সাথে একথার মধ্যে এ অর্থও প্রচ্ছন্ন আছে যে, মুসলমানরা যে উমরা করবে তাও নিজের ক্ষমতায় করবে না। আমি যেহেতু চাইবো যে তারা উমরা করুক তাই তারা উমরা করবে আমার ইচ্ছা যদি এর পরিপন্থী হয় তাহলে নিজেরাই উমরা আদায় করে ফেলবে এতটা শক্তি–সামর্থ তাদের মধ্যে নেই।

৪৯. পরের বছর ৭ম হিজরীর যুল–কা'দা মাসে এ প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়। ইতিহাসে এ উমরা উমরাতুল কাযা নামে খ্যাত।

৫০. একথা থেকে প্রমাণিত হয় উমরা ও হজ্জ আদায়ের সময় মাথা মুণ্ডন আবশ্যিক নয়, বরং চুল ছেঁটে নেয়াও জায়েয। তবে মাথা মুণ্ডন উত্তম। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তা প্রথমে বর্ণনা করেছেন এবং চুল ছাঁটার কথা পরে উল্লেখ করেছেন।

৫১. এখানে একথা বলার কারণ হলো যখন হুদাইবিয়াতে সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিলো সে সময় মক্কার কাফেররা নবীর (সা) সম্মানিত নামের সাথে রসূলুল্লাহ কথাটি লিখতে আপত্তি জানিয়েছিলো, তাদের একগুঁয়েমির কারণে নবী (সা) নিজে চুক্তিপত্র থেকে একথাটি মুছে ফেলেছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলছেন, আমার রসূলের রসূল

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي
وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ ۚ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ
فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে আপোষহীন[৫২] এবং নিজেরা পরস্পর দয়া পরবশ।[৫৩] তোমরা যখনই দেখবে তখন তাদেরকে রুকূ' ও সিজদা এবং আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি কামনায় তৎপর পাবে। তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন বর্তমান যা দিয়ে তাদেরকে আলাদা চিনে নেয়া যায়।[৫৪] তাদের এ পরিচয় তাওরাতে দেয়া হয়েছে।[৫৫] আর ইনযীলে তাদের উপমা পেশ করা হয়েছে এই বলে[৫৬] যে, একটি শস্যক্ষেত যা প্রথমে অঙ্কুরোদগম ঘটালো। পরে তাকে শক্তি যোগালো তারপর তা শক্ত ও মজবুত হয়ে স্বীয় কাণ্ডে ভর করে দাঁড়ালো। যা কৃষককে খুশী করে কিন্তু কাফের তার পরিপুষ্টিলাভ দেখে মনোকষ্ট পায়। এ শ্রেণীর লোক যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও বড় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[৫৭]

হওয়া একটি অনিবার্য সত্য, কারোর মানা বা না মানাতে তাতে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। কিছু লোক যদি তা না মানে না মানুক। তা সত্য হওয়ার জন্য আমার সাক্ষই যথেষ্ট। তাদের অস্বীকৃতির কারণে এ সত্য পরিবর্তিত হয়ে যাবে না। তাদের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও এ রসূল আমার পক্ষ থেকে যে হিদায়াত ও দীন নিয়ে এসেছেন তা অন্য সব দীনের ওপর বিজয় লাভ করবে। তা ঠেকিয়ে রাখার জন্য এসব অস্বীকারকারীরা যত চেষ্টাই করুকনা কেন।

'সব দীন' বলতে বুঝানো হয়েছে সেসব ব্যবস্থাকে যা দীন হিসেবে গণ্য। আমরা পূর্বেই তাফহীমুল কুরআন সূরা যুমারের ব্যাখ্যায় ৩ টীকায় এবং সূরা শূরার ২০ টীকায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে আল্লাহ তা'আলা যে কথাটি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন তা হচ্ছে শুধু এ দীনের প্রচার করাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং উদ্দেশ্য ছিল একে দীন হিসেবে গণ্য সমস্ত

জীবনাদর্শের ওপর বিজয়ী করে দেয়া। অন্য কথায় জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগের ওপর কোন বাতিল জীবনাদর্শ বিজয়ী হয়ে থাকবে আর বিজয়ী সে জীবনাদর্শ তার আধিপত্যাধীনে এ দীনকে বেঁচে থাকার যতটুকু অধিকার দেবে এ দীন সে চৌহদ্দির মধ্যেই হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে এ উদ্দেশ্যে নবী (সা) এ দীন নিয়ে আসেননি। বরং তিনি এ জন্য তা এনেছেন যে, এটিই হবে বিজয়ী জীবনাদর্শ। অন্য কোন জীবনাদর্শ বেঁচে থাকলেও এ জীবনাদর্শ যে সীমার মধ্যে তাকে বেঁচে থাকার অনুমতি দেবে সে সীমার মধ্যেই তা বেঁচে থাকবে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা যুমারের তাফসীর, টীকা ৪৮)

৫২. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ । আরবী ভাষায় বলা হয় فُلَانٌ شَدِيْدٌ عَلَيْهِ অমুক ব্যক্তি তার প্রতি কঠোর। অর্থাৎ তাকে বশীভূত করা এবং নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা তার জন্য কঠিন। কাফেরদের প্রতি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের কঠোর হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তারা কাফেরদের সাথে রূঢ় এবং ক্রুদ্ধ আচরণ করেন, বরং এর অর্থ হচ্ছে, তারা তাদের ঈমানের পরিপক্কতা, নীতির দৃঢ়তা, চারিত্রিক শক্তি এবং ঈমানী দূরদর্শিতার কারণে কাফেরদের মোকাবিলায় মজবুত পাথরের মত অনমনীয় ও আপোষহীন। তারা চপল বা অস্থিরমনা নন যে, কাফেররা তাদেরকে যেদিকে ইচ্ছা ঘুরিয়ে দেবে। তারা নরম ঘাস নন যে, কাফেররা অতি সহজেই তাদেরকে চিবিয়ে পিষে ফেলবে। কোন প্রকার ভয় দেখিয়ে তাদেরকে স্তব্ধ করা যায় না। কোন লোভ দেখিয়ে তাদের কেনা যায় না। যে মহত উদ্দেশ্যে তারা জীবন বাজি রেখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হয়েছেন তা থেকে তাদের বিচ্যুত করার ক্ষমতা কাফেরদের নেই।

৫৩. অর্থাৎ তাদের মধ্যে যতটুকু কঠোরতা আছে তা কাফেরদের জন্য, ঈমানদারদের জন্য নয়। ঈমানদারদের কাছে তারা বিনম্র, দয়া পরবশ, স্নেহশীল, সমব্যাথী ও দুঃখের সাথী। নীতি ও উদ্দেশ্যের ঐক্য তাদের মধ্যে পরস্পরের জন্য ভালবাসা, সাযুজ্য ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে।

৫৪. সিজদা করতে করতে কোন কোন নামাযীর কপালে যে দাগ পড়ে এখানে তা বুঝানো হয়নি। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে আল্লাহভীরুতা, হৃদয়ের বিশালতা, মর্যাদা এবং মহৎ নৈতিক চরিত্রের প্রভাব যা আল্লাহর সামনে মাথা নত করার কারণে স্বাভাবিকভাবেই কোন মানুষের চেহারায় ফুটে ওঠে। মানুষের চেহারা একখানা খোলা গ্রন্থের মত যার পাতায় পাতায় মানুষের মনোজগতের অবস্থা সহজেই অবলোকন করা যেতে পারে। একজন অহংকারী মানুষের চেহারা একজন বিনম্র ও কোমল স্বভাব মানুষের চেহারা থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। একজন দুশ্চরিত্র মানুষের চেহারা একজন সচ্চরিত্র ও সংমনা মানুষের চেহারা থেকে আলাদা করে সহজে চেনা যায়। একজন গুণ্ডা ও দুশ্চরিত্রের চেহারা–আকৃতি এবং একজন সম্ভ্রান্ত ও পবিত্র ব্যক্তির চেহারা–আকৃতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকে। আল্লাহ তা'আলার এ উক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব সংগী–সাথী এমন যে, কেউ তাদের একবার দেখা মাত্রই অনুধাবন করতে পারবে তারা সৃষ্টির সেরা। কারণ তাদের চেহারায় আল্লাহভীরুতার দীপ্তি সমুজ্জল। এ বিষয়টি সম্পর্কে ইমাম মালেক (র) বলেন, সাহাবীদের

সেনাদল যে সময় সিরীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করে তখন সিরীয়ার খৃষ্টানরা বলছিলো ঃ ঈসার (আ) হাওয়ারীদের চালচলন সম্পর্কে আমরা যা যা শুনে আসছি এদের চালচলন দেখছি ঠিক তাই।

৫৫. সম্ভবত 'এখানে বাইবেলের' দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের ৩৩ অধ্যায়ের ২ ও ৩ শ্লোকের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে, যেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় শুভ আগমনের কথা বলতে গিয়ে তাঁর সাহাবীদের জন্য "পবিত্রদের" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি ছাড়া সাহাবায়ে কিরামের আর কোন গুণ বা পরিচয় যদি তাওরাতে বর্ণিত হয়ে থাকে তাহলে তা এখন এ বিকৃত তাওরাতে নেই।

৫৬. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের একটি বক্তৃতায় এ উপমাটি বর্ণিত হয়েছে এবং বাইবেলের 'নতুন নিয়মে' তা উদ্ধৃত হয়েছে এভাবে ঃ "তিনি আরো কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য এইরূপ। কোন ব্যক্তি যেন ভূমিতে বীজ বুনে; পরে রাত দিন নিদ্রা যায় ও উঠে, ইতিমধ্যে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠে, কিরূপে তাহা সে জানে না। ভূমি আপনা আপনি ফল উৎপন্ন করে; প্রথমে অঙ্কুর পরে শীষ তাহার পর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য। কিন্তু ফল পাকিলে সে তৎক্ষণাৎ কাস্তে লাগায়। কেননা শস্য কাটিবার সময় উপস্থিত। ....তাহা একটা সরিষা দানার তুল্য; সেই বীজ ভূমিতে বুনিবার সময় ভূমির সকল বীজের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু বুনা হইলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া সকল শাক হইতে বড় হইয়া ওঠে, এবং বড় বড় ডাল ফেলে; তাহাতে আকাশের পক্ষিগণ তাহার ছায়ার নীচে বাস করিতে পারে।" (মার্ক, অধ্যায় ৪, শ্লোক ২৬ থেকে ৩২; এই বক্তৃতার শেষাংশ মথি লিখিত সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ের ৩১ ও ৩২ শ্লোকেও বর্ণিত হয়েছে)

৫৭. একদল এ আয়াতে ব্যবহৃত مِنْهُمْ এর مِنْ শব্দটিকে تَبْعِيض অর্থে (অর্থাৎ তাদের কিছু সংখ্যক লোককে বুঝাতে) ব্যবহার করে আয়াতের অনুবাদ করেন "তাদের মধ্যে যারা ঈমান গ্রহণ এবং নেক কাজ করেছে তাদেরকে ক্ষমা ও বড় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" এভাবে তারা সাহাবায়ে কিরামের (রা) প্রতি দোষারোপের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং দাবী করে যে, এ আয়াত অনুসারে সাহাবীদের (রা) মধ্যে অনেকেই মু'মিন ও নেক্‌কার ছিলেন না। কিন্তু এ ব্যাখ্যা এ সূরারই ৪, ৫, ১৮ এবং ২৬ আয়াতের পরিপন্থী এবং এ আয়াতের প্রথমাংশের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যারা হুদাইবিয়াতে নবীর (সা) সাথে ছিলেন ৪ ও ৫ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের মনে প্রশান্তি নাযিল করা ও তাদের ঈমান বৃদ্ধি করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই তাদের সবাইকে জান্নাতে প্রবেশ করার সুখবর দান করেছেন। আর যারা গাছের নিচে নবীর (সা) কাছে বাইয়াত হয়েছিলেন ১৮ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের সবার জন্য তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এ ক্ষেত্রেও কোন ব্যতিক্রমের উল্লেখ নেই। ২৬ আয়াতেও নবীর (সা) সমস্ত সংগী–সাথীর জন্য 'মু'মিনীন' শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাদের প্রতি তাঁর প্রশান্তি নাযিলের খবর দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এসব লোক তাকওয়ার নীতি অনুসরণের অধিক যোগ্য ও অধিকারী। এখানেও একথা বলা হয়নি যে, তাদের মধ্যে যারা মু'মিন কেবল তাদের জন্যই এ সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে। তাছাড়া এ আয়াতেও প্রথমাংশে যে প্রশংসা বাক্য বলা হয়েছে তা তাদের সবার জন্যে বলা হয়েছে যারা আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। কথাটা হচ্ছে যারাই আপনার সাথে আছে

তারাই এরূপ এবং এরূপ। এরপর আয়াতের শেষাংশে পৌঁছে একথা বলার এমন কি অবকাশ থাকতে পারে যে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ঈমানদার ও নেক্কার ছিলেন এবং কিছু সংখ্যক লোক তা ছিলো না। তাই এখানে مِنْ শব্দটিকে تَبْعِيْض অর্থে গ্রহণ করা বাক্য বিন্যাসের পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে এখানে مِنْ শব্দটি স্পষ্ট করে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ (মূর্তিসমূহের অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো) আয়াতে مِنْ تَبْعِيْض অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তা না হলে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে মূর্তিসমূহের যেগুলো অপবিত্র সেগুলো থেকে দূরে থাকো। এর অর্থ হবে এই যে, কিছু মূর্তিকে পবিত্র বলেও ধরে নিতে হবে। আর সেগুলোর পূজা থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক হবে না।

আল হুজুরাত

৪৯

নামকরণ

৪ আয়াতের إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ বাক্যাংশ থেকে এ সূরার নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ যে সূরার মধ্যে আল হুজুরাত শব্দ আছে এটি সেই সূরা।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় এবং সূরার বিষয়বস্তু থেকেও সমর্থন পাওয়া যায় যে, এ সূরা বিভিন্ন পরিবেশ ও ক্ষেত্রে নাযিল হওয়া হুকুম–আহকাম ও নির্দেশনাসমূহের সমষ্টি। বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যের কারণে এগুলোকে এখানে একত্রিত করা হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন বর্ণনা থেকে একথাও জানা যায় যে, ঐ সব হুকুম–আহকামের বেশীর ভাগই মাদানী যুগের শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। যেমন ঃ ৪ আয়াত সম্পর্কে তাফসীরকারদের বর্ণনা হচ্ছে আয়াতটি বনী তামীম গোত্র সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো যার প্রতিনিধি দল এসে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীগণের হুজরা বা গৃহের বাইরে থেকে তাঁকে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছিলো। সমস্ত সীরাত গ্রন্থে হিজরী ৯ম সনকে এ প্রতিনিধি দলের আগমনের সময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপ ৬ আয়াত সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তা ওয়ালীদ ইবনে উকবা সম্পর্কে নাযিল হয়েছিলো—রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে বনী মুস্তালিক গোত্র থেকে যাকাত আদায় করে আনতে পাঠিয়েছিলেন। একথা সবারই জানা যে, ওয়ালীদ ইবনে উকবা মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে মুসলমানদেরকে এমন আদব–কায়দা, শিষ্টাচার ও আচরণ শিক্ষা দেয়া, যা তাদের ঈমানদারসুলভ স্বভাব চরিত্র ও ভাবমূর্তির উপযুক্ত ও মানানসই।

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে যেসব আদব–কায়দা ও শিষ্টাচারের দিকে লক্ষ রাখতে হবে প্রথম পাঁচ আয়াতে তাদেরকে তা শিখিয়ে দেয়া হয়েছে।

এরপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রতিটি খবরই বিশ্বাস করা এবং সে অনুসারে কোন কর্মকাণ্ড করে বসা ঠিক নয়, যদি কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কওমের বিরুদ্ধে কোন খবর পাওয়া যায় তাহলে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে খবর পাওয়ার মাধ্যম নির্ভরযোগ্য কি

না। নির্ভরযোগ্য না হলে তার ভিত্তিতে কোন তৎপরতা চালানোর পূর্বে খবরটি সঠিক কি না তা যাঁচাই বাছাই করে নিতে হবে।

এরপর বলা হয়েছে মুসলমানদের দু'টি দল যদি কোন সময় পরস্পর সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তবে সে ক্ষেত্রে অন্য মুসলমানদের কর্মনীতি কি হওয়া উচিত।

তারপর মুসলমানদেরকে সেসব খারাপ জিনিস থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা সমাজ জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং যার কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। একে অপরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা, বদনাম ও উপহাস করা, খারাপ নামে আখ্যায়িত করা, খারাপ ধারণা পোষণ করা, অন্যের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি ও অনুসন্ধান করা, অসাক্ষাতে মানুষের বদনাম করা এগুলো এমনিতেও গোনাহের কাজ এবং সমাজে বিপর্যয়ও সৃষ্টি করে। আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে নাম ধরে ধরে হারাম ঘোষণা করেছেন।

অতপর গোত্রীয় ও বংশগত বৈষম্যের ওপর আঘাত হানা হয়েছে যা সারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও বংশের নিজ নিজ মর্যাদা নিয়ে গর্ব ও অহংকার করা, অন্যদেরকে নিজেদের চেয়ে নিম্নস্তরের মনে করা এবং নিজেদের বড়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যদের হেয় করা—এসব এমন জঘন্য খাসলত যার কারণে পৃথিবী জুলুমে ভরে উঠেছে। আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ছোট্ট একটি আয়াতে একথা বলে এসব অনাচারের মূলোৎপাটন করেছেন যে, "সমস্ত মানুষ একই মূল উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য, গর্ব ও অহংকার প্রকাশের জন্য নয় এবং একজন মানুষের ওপর আরেকজন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য আর কোন বৈধ ভিত্তি নেই।"

সব শেষে মানুষকে বলা হয়েছে যে, ঈমানের মৌখিক দাবী প্রকৃত জিনিস নয়. বরং সরল মনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মানা, কার্যত অনুগত হয়ে থাকা এবং আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর পথে জান ও মাল কুরবানী করা। সত্যিকার মু'মিন সে যে এ নীতি ও আচরণ গ্রহণ করে। কিন্তু যারা আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া ছাড়াই শুধু মৌখিকভাবে ইসলামকে স্বীকার করে এবং তারপর এমন নীতি ও আচরণ অবলম্বন করে যেন ইসলাম গ্রহণ করে তারা কোন মহা উপকার সাধন করেছে, পৃথিবীতে তারা মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারে, সমাজে তাদের সাথে মুসলমানের মত আচরণও করা যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কাছে তারা মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

আয়াত ১৮ — সূরা আল হুজুরাত—মাদানী — রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ① يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ② اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ۭ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ③

হে মু'মিনগণ ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না।[১] আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।[২]

হে মু'মিনগণ ! নিজেদের আওয়ায রসূলের আওয়াযের চেয়ে উঁচু করো না এবং উচ্চস্বরে নবীর সাথে কথা বলো না, যেমন তোমরা নিজেরা পরস্পর বলে থাকো।[৩] এমন যেন না হয় যে, তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সব কাজ–কর্ম ধ্বংস হয়ে যায়।[৪] যারা আল্লাহর রসূলের সামনে তাদের কন্ঠ নিচু রাখে তারাই সেসব লোক, আল্লাহ যাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন।[৫] তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার।

১. এটা ঈমানের প্রাথমিক ও মৌলিক দাবী। যে ব্যক্তি আল্লাহকে তার রব এবং আল্লাহর রসূলকে তার হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনকারী মানে সে যদি তার এ বিশ্বাসে সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে সে নিজের মতামত ও ধ্যান–ধারণাকে কখনো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সিদ্ধান্তের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে পারে না, কিংবা বিভিন্ন ব্যাপারে স্বাধীন মতামত পোষণ করতে পারে না এবং ঐ সব ব্যাপারে নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না বরং আল্লাহ ও তাঁর রসূল ঐ সব ব্যাপারে কোন হিদায়াত বা দিকনির্দেশনা দিয়েছেন

কিনা এবং দিয়ে থাকলে কি দিয়েছেন সে বিষয়ে আগে জানার চেষ্টা করবে। কোন মু'মিনের আচরণে এর ব্যতিক্রম কখনো হতে পারে না। এ জন্য আল্লাহ বলছেন, "হে ঈমানদাররা, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অগ্রগামী হয়ো না।" অর্থাৎ তাঁর আগে আগে চলবে না, পেছনে পেছনে চলো। তাঁর অনুগত হয়ে থাকো। এ বাণীতে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা সূরা আহযাবের ৩৬ আয়াতের নির্দেশ থেকে একটু কঠোর। সেখানে বলা হয়েছিলো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে বিষয়ে ফায়সালা করে দিয়েছেন সে বিষয়ে আলাদা কোন ফায়সালা করার ইখতিয়ার কোন ঈমানদারের জন্য আর অবশিষ্ট থাকে না। আর এখানে বলা হয়েছে ঈমানদারদের নিজেদের বিভিন্ন ব্যাপারে আপনা থেকেই অগ্রগামী হয়ে ফায়সালা না করা উচিত। বরং প্রথমে দেখা উচিত ঐ সব ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাতে কি কি নির্দেশনা রয়েছে।

এ নির্দেশটি শুধু মুসলমানদের ব্যক্তিগত ব্যাপারসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাদের সমস্ত সামাজিক ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। প্রকৃতপক্ষে এটি ইসলামী আইনের মৌলিক দফা। মুসলমানদের সরকার, বিচারালয় এবং পার্লামেন্ট কোন কিছুই এ আইন থেকে মুক্ত নয়। মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় সহীহ সনদে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, যে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মু'আয ইবনে জাবালকে ইয়ামানের বিচারক করে পাঠাচ্ছিলেন তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কিসের ভিত্তিতে ফায়সালা করবে? তিনি জবাব দিলেন : "আল্লাহর কিতাব অনুসারে।" নবী (সা) বললেন : যদি কোন বিষয়ে কিতাবুল্লাহর মধ্যে হুকুম না পাওয়া যায় তাহলে কোন্ জিনিসের সাহায্য নেবে ? তিনি বললেন: আল্লাহর রসূলের সুন্নাতের সাহায্য নেব। তিনি বললেন : যদি সেখানেও কিছু না পাও? তিনি বললেন : তাহলে আমি নিজে ইজতিহাদ করবো। একথা শুনে নবী (সা) তার বুকের ওপর হাত রেখে বললেন : সে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি যিনি তাঁর রসূলের প্রতিনিধিকে এমন পন্থা অবলম্বন করার তাওফীক দান করেছেন যা তাঁর রসূলের কাছে পছন্দনীয়। নিজের ইজতিহাদের চেয়ে আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং হিদায়াত লাভের জন্য সর্বপ্রথম এ দু'টি উৎসের দিকে ফিরে যাওয়াই এমন একটা জিনিস যা একজন মুসলিম বিচারক এবং একজন অমুসলিম বিচারকের মধ্যকার মূল পার্থক্য তুলে ধরে। অনুরূপ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাবই যে সর্বপ্রথম উৎস এবং তারপরই যে রসূলের সুন্নাত—এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তির কিয়াস ও ইজতিহাদ তো দূরের কথা গোটা উম্মতের ইজমাও এ দু'টি উৎসের পরিপন্থী কিংবা তা থেকে স্বাধীন হতে পারে না।

২. অর্থাৎ যদি তোমরা কখনো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে স্বেচ্ছাচারী হওয়ার নীতি গ্রহণ করো কিংবা নিজের মতামত ও ধ্যান-ধারণাকে তাঁদের নির্দেশের চেয়ে অগ্রাধিকার দান করো তাহলে জেনে রাখো তোমাদের বুঝাপড়া হবে সেই আল্লাহর সাথে যিনি তোমাদের সব কথা শুনছেন এবং মনের অভিপ্রায় পর্যন্ত অবগত আছেন।

৩. যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে ওঠাবসা ও যাতায়াত করতেন তাদেরকে এ আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো। এর উদ্দেশ্য ছিল

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ④

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ⑤

হে নবী ! যারা তোমাকে গৃহের বাইরে থেকে ডাকাডাকি করতে থাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। যদি তারা তোমার বেরিয়ে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতো তাহলে তাদের জন্য ভাল হোত।[৬] আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[৭]

নবীর (সা) সাথে দেখা–সাক্ষাত ও কথাবার্তার সময় যেন ঈমানদাররা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার প্রতি একান্তভাবে লক্ষ রাখেন। কারো কন্ঠ যেন তাঁর কন্ঠ থেকে উচ্চ না হয়। তাঁকে সম্বোধন করতে গিয়ে কেউ যেন একথা ভুলে না যায় যে, সে কোন সাধারণ মানুষ বা তার সমকক্ষ কাউকে নয় বরং আল্লাহর রসূলকে সম্বোধন করে কথা বলছে। তাই সাধারণ মানুষের সাথে কথাবার্তা এবং আল্লাহর রসূলের সাথে কথাবার্তার মধ্যে পার্থক্য থাকতে হবে এবং কেউ তাঁর সাথে উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলবে না।

যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসের জন্য এসব আদব–কায়দা শেখানো হয়েছিলো এবং নবীর (সা) যুগের লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিলো। কিন্তু যখনই নবীর (সা) আলোচনা হবে কিংবা তাঁর কোন নির্দেশ শুনানো হবে অথবা তাঁর হাদীসসমূহ বর্ণনা করা হবে এরূপ সকল ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ের লোকদেরও এ আদব–কায়দাই অনুসরণ করতে হবে। তাছাড়া নিজের চেয়ে উচ্চ মর্যাদার লোকদের সাথে কথাবার্তা ও আলাপ–আলোচনার সময় কি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে এ আয়াত থেকে সে ইংগিতও পাওয়া যায়। কেউ তার বন্ধুদের সাথে কিংবা সাধারণ মানুষের সাথে যেভাবে কথাবার্তা বলে, তার কাছে সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের সাথেও যদি একইভাবে কথাবার্তা বলে তাহলে তা প্রমাণ করে যে, সে ব্যক্তির জন্য তাঁর মনে কোন সম্মানবোধ নেই এবং সে তার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না।

৪. ইসলামে রসূলের ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা ও স্থান কি এ বাণী থেকে তা জানা যায়। কোন ব্যক্তি সম্মানলাভের যতই উপযুক্ত হোক না কেন কোন অবস্থায়ই সে এমন মর্যাদার অধিকারী নয় যে, তার সাথে বেয়াদবী আল্লাহর কাছে এমন শাস্তিযোগ্য হবে যা মূলত কুফরীর শাস্তি। বড় জোর সেটা বেয়াদবী বা অশিষ্ট আচরণ। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সামান্য শিথিলতাও এত বড় গোনাহ যে, তাতে ব্যক্তির সারা জীবনের সঞ্চিত পুঁজি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই নবীর (সা) প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই শামিল, যিনি তাঁকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে অবহেলার অর্থ স্বয়ং আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে ত্রুটি বা অবহেলার পর্যায়ভুক্ত।

৫. অর্থাৎ যারা আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং এসব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছে যে, প্রকৃতই তাদের অন্তরে তাকওয়া বিদ্যমান তারাই আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সম্মানের প্রতি লক্ষ রাখে। এ আয়াতাংশ থেকে আপনা আপনি প্রমাণিত হয়

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ﴿٦﴾ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۭ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ﴿٧﴾ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٨﴾

হে ঈমান গ্রহণকারীগণ, যদি কোন ফাসেক তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে তাহলে তা অনুসন্ধান করে দেখ। এমন যেন না হয় যে, না জেনে শুনেই তোমরা কোন গোষ্ঠীর ক্ষতি করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।[৮]

ভাল করে জেনে নাও, আল্লাহর রসূল তোমাদের মাঝে বর্তমান। তিনি যদি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তোমাদের কথা মেনে নেন তাহলে তোমরা নিজেরাই অনেক সমস্যার মধ্যে পড়ে যাবে।[৯] *কিন্তু আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ঈমানের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের কাছে পছন্দনীয় করে দিয়েছেন। আর কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে ঘৃণিত করে দিয়েছেন। আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীতে এসব লোকই সৎপথের অনুগামী।*[১০] *আল্লাহ জ্ঞানী ও কুশলী।*[১১]

যে, যে হৃদয়ে রসূলের মর্যাদাবোধ নেই সে হৃদয়ে প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া নেই। আর রসূলের সামনে কারো কন্ঠস্বর উচ্চ হওয়া শুধু একটি বাহ্যিক অশিষ্টতাই নয় বরং অন্তরে তাকওয়া না থাকারই প্রমাণ।

৬. নবীর (সা) পবিত্র যুগে যারা তাঁর সাহচর্যে থেকে ইসলামী আদব-কায়দা, ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন তারা সবসময় নবীর (সা) সময়ের প্রতি লক্ষ রাখতেন। তিনি আল্লাহর কাজে কতটা ব্যস্ত জীবন যাপন করেন সে ব্যাপারে তাদের পূর্ণ উপলব্ধি ছিল। এসব ক্লান্তিকর ব্যস্ততার ভেতরে কিছু সময় তাঁর আরামের জন্য, কিছু সময় অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য এবং কিছু সময় পারিবারিক কাজকর্ম দেখা-শোনার জন্যও অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। এ জন্য তারা নবীর সাথে দেখা করার জন্য এমন সময় গিয়ে হাজির হতো যখন তিনি ঘরের বাইরেই অবস্থান করতেন এবং কখনো যদি তাঁকে

মজলিসে না–ও পেতো তাহলে তাঁর বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতো। অত্যধিক প্রয়োজন ছাড়া তাঁকে বাইরে আসার জন্য কষ্ট দিতো না। কিন্তু আরবের সে পরিবেশে যেখানে সাধারণভাবে মানুষ কোন প্রকার শিষ্টাচারের শিক্ষা পায়নি সেখানে বারবার এমন সব অশিক্ষিত লোকেরা নবীর (সা) সাথে সাক্ষাতের জন্য এসে হাজির হতো যাদের ধারণা ছিল ইসলামী আন্দোলন ও মানুষকে সংশোধনের কাজ যারা করেন তাদের কোন সময় বিশ্রাম গ্রহণের অধিকার নেই এবং রাতের বেলা বা দিনের বেলা যখনই ইচ্ছা তাঁর কাছে এসে হাজির হওয়ার অধিকার তাদের আছে। আর তাঁর কর্তব্য হচ্ছে, যখনই তারা আসবে তাদেরকে সাক্ষাত দানের জন্য তিনি প্রস্তুত থাকবেন। এ প্রকৃতির লোকদের মধ্যে সাধারণভাবে এবং আরবের বিভিন্ন অংশ থেকে আগত লোকদের মধ্যে বিশেষভাবে এমন কিছু অজ্ঞ অভদ্র লোকও থাকতো যারা নবীর (সা) সাথে সাক্ষাত করতে আসলে কোন খাদেমের মাধ্যমে ভিতরে খবর দেয়ার কষ্টটাও করতো না। নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের হুজরার চারদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে বাইরে থেকেই তাঁকে ডাকতে থাকতো। সাহাবীগণ হাদীসে এ ধরনের বেশ কিছু ঘটনা বর্ণনা করেছেন। লোকজনের এ আচরণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুব কষ্ট হতো। কিন্তু স্বভাবগত ধৈর্যের কারণে তিনি এসব সহ্য করে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন এবং এ অশিষ্ট কর্মনীতির জন্য তিরস্কার করে লোকজনকে এ নির্দেশনা দান করলেন যে, যখন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য এসে তাঁকে পাবে না, তখন চিৎকার করে তাঁকে ডাকার পরিবর্তে ধৈর্যের সাথে বসে সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে যখন তিনি নিজেই তাদেরকে সাক্ষাতদানের জন্য বেরিয়ে আসবেন।

৭. অর্থাৎ এ যাবত যা হওয়ার তা হয়েছে। যদি ভবিষ্যতে এ ভুলের পুনরাবৃত্তি না করা হয় তবে আল্লাহ অতীতের সব ভুল ক্ষমা করে দেবেন এবং যারা তাঁর রসূলকে এভাবে কষ্ট দিয়েছে দয়া ও করুণা পরবশ হয়ে তিনি তাদের পাকড়াও করবেন না।

৮. অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এ আয়াতটি ওয়ালীদ ইবনে উকবা ইবনে আবী মু'আইত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এর পটভূমি হচ্ছে, বনী মুসতালিক গোত্র মুসলমান হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে যাকাত আদায় করে আনার জন্য ওয়ালীদ ইবনে উকবাকে পাঠালেন। সে তাদের এলাকায় পৌঁছে কোন কারণে ভয় পেয়ে গেল এবং গোত্রের লোকদের কাছে না গিয়েই মদীনায় ফিরে গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ বলে অভিযোগ করলো যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। এ খবর শুনে নবী (সা) অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাদের শায়েস্তা করার জন্য একদল সেনা পাঠাতে মনস্থ করলেন। কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সেনাদল পাঠিয়েছিলেন এবং কোন কোনটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মোট কথা, এ বিষয়ে সবাই একমত যে, এ সময়ে বনী মুসতালিক গোত্রের নেতা হারেস ইবনে দেরার (উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুয়াইরিয়ার পিতা) এক প্রতিনিধি দল নিয়ে নবীর (সা) খেদমতে হাজির হন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহর কসম যাকাত দিতে অস্বীকৃতি এবং ওয়ালীদকে হত্যা করার চেষ্টা তো দূরের কথা তার সাথে আমাদের সাক্ষাত পর্যন্ত হয়নি। আমরা ঈমানের ওপরে অবিচল আছি এবং যাকাত প্রদানে আদৌ অনিচ্ছুক নই। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত

নাযিল হয়। এ ঘটনাটি ইমাম আহমাদ, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী এবং ইবনে জারীর সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হারেস ইবনে দ্বেরার, মুজাহিদ, কাতাদা, আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা, ইয়াযীদ ইবনে রূমান, দ্বাহ্হাক এবং মুকাতিল ইবনে হাইয়ান থেকে উদ্বৃত করেছেন। হযরত উম্মে সালামা বর্ণিত হাদীসে পুরো ঘটনাটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে সুস্পষ্টভাবে ওয়ালীদের নামের উল্লেখ নেই।

এ নাজুক পরিস্থিতিতে যখন একটি ভিত্তিহীন খবরের ওপর নির্ভর করার কারণে একটি বড় ভুল সংঘটিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো সে মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে এ মৌলিক নির্দেশটি জানিয়ে দিলেন যে, যখন তোমরা এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর পাবে যার ভিত্তিতে বড় রকমের কোন ঘটনা সংঘটিত হতে পারে তখন তা বিশ্বাস করার পূর্বে খবরের বাহক কেমন ব্যক্তি তা যাঁচাই করে দেখো। সে যদি কোন ফাসেক লোক হয় অর্থাৎ যার বাহ্যিক অবস্থা দেখেই প্রতীয়মান হয় যে, তার কথা নির্ভরযোগ্য নয় তাহলে তার দেয়া খবর অনুসারে কাজ করার পূর্বে প্রকৃত ঘটনা কি তা অনুসন্ধান করে দেখো। আল্লাহর এ হুকুম থেকে শরীয়াতের একটি নীতি পাওয়া যায় যার প্রয়োগ ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। এ নীতি অনুসারে যার চরিত্র ও কাজ-কর্ম নির্ভরযোগ্য নয় এমন কোন সংবাদদাতার সংবাদের ওপর নির্ভর করে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা জাতির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ ইসলামী সরকারের জন্য বৈধ নয়। এ নীতির ভিত্তিতে হাদীস বিশারদগণ হাদীস শাস্ত্রে "জারহ্ ও তা'দীল"-এর নীতি উদ্ভাবন করেছেন। যাতে যাদের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসমূহ পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌঁছেছিলো তাদের অবস্থা যাঁচাই বাছাই করতে পারেন। তাছাড়া সাক্ষ আইনের ক্ষেত্রে ফকীহগণ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, এমন কোন ব্যাপারে ফাসেক ব্যক্তির সাক্ষ গ্রহণযোগ্য হবে না যার দ্বারা শরীয়াতের কোন নির্দেশ প্রমাণিত হয় কিংবা কোন মানুষের ওপর কোন অধিকার বর্তায়। তবে এ ব্যাপারে পণ্ডিতগণ একমত যে, সাধারণ পার্থিব ব্যাপারে প্রতিটি খবরই যাঁচাই ও অনুসন্ধান করা এবং খবরদাতার নির্ভরযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া জরুরী নয়। কারণ, আয়াতে نَبَأٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি সব রকম খবরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, শুধু গুরুত্বপূর্ণ খবরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ কারণে ফকীহগণ বলেন, সাধারণ ও খুঁটিনাটি ব্যাপারে এ নীতি খাটে না। উদাহরণ স্বরূপ আপনি কারো কাছে গেলেন এবং বাড়ীতে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। বাড়ীর ভেতর থেকে কেউ এসে বললো, আসুন। এ ক্ষেত্রে আপনি তার কথার ওপর নির্ভর করে প্রবেশ করতে পারেন। বাড়ীর মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতির সংবাদদাতা সৎ না অসৎ এ ক্ষেত্রে তা দেখার প্রয়োজন নেই। অনুরূপ ফকীহগণ এ ব্যাপারেও একমত, যেসব লোকের ফাসেকী মিথ্যাচার ও চারিত্রিক অসততার পর্যায়ের নয়, বরং আকীদা-বিকৃতির কারণে ফাসেক বলে আখ্যায়িত তাদের সাক্ষ এবং বর্ণনাও গ্রহণ করা যেতে পারে। শুধু আকীদা খারাপ হওয়া তাদের সাক্ষ ও বর্ণনা গ্রহণ করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক নয়।

৯. বনী মুসতালিক গোত্র সম্পর্কে ওয়ালীদ ইবনে উকবার খবরের ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক যে তাদের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ পরিচালনার জন্য

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

ঈমানদারদের মধ্যকার দু'টি দল যদি পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়[১২] তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও।[১৩] তারপরও যদি দু'টি দলের কোন একটি অপরটির বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করে তবে যে দল বাড়াবাড়ি করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করো।[১৪] যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।[১৫] এরপর যদি তারা ফিরে আসে তাহলে তাদের মাঝে ন্যায় বিচারের সাথে মীমাংসা করিয়ে দাও[১৬] এবং ইনসাফ করো। আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।[১৭] মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক করে দাও।[১৮] আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায় তোমাদের প্রতি মেহেরবানী করা হবে।

পীড়াপীড়ি করছিলো আয়াতের পূর্বাপর প্রসঙ্গ থেকেও এ বিষয়ে ইংগিত পাওয়া যায় এবং কিছু সংখ্যক মুফাস্সিরও আয়াতটি থেকে তাই বুঝেছেন। এ কারণে ঐ সব লোককে তিরস্কার করে বলা হয়েছে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তোমাদের মধ্যে বর্তমান, একথা ভুলে যেয়ো না। তিনি তোমাদের জন্য কল্যাণের বিষয়কে তোমাদের চেয়ে অধিক জানেন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত তোমাদের কাছে যথোপযুক্ত মনে হয় তিনি যেন সে অনুসারেই কাজ করেন তোমাদের এরূপ আশা করাটা অত্যন্ত অন্যায় দুঃসাহস। যদি তোমাদের কথা অনুসারে সব কাজ করা হতে থাকে তাহলে বহু ক্ষেত্রে এমন সব ভুল-ক্রটি হবে যার ভোগান্তি তোমাদেরকেই পোহাতে হবে।

১০. অর্থাৎ কতিপয় লোক তাদের অপরিপক্ক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিচালনা করতে চাচ্ছিলো। তাদের এ চিন্তা ছিল ভুল। তবে মু'মিনদের গোটা জামায়াত এ ভুল করেনি। মু'মিনদের সঠিক পথের ওপর কায়েম থাকার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর দয়া ও মেহেরবানীতে ঈমানী আচার-আচরণকে তাদের জন্য প্রিয় ও হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন এবং কুফরী, ফাসেকী ও নাফরমানীর আচরণকে তাদের কাছে ঘৃণিত করে দিয়েছেন। এ আয়াতের দু'টি অংশে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে কথা বলা হয়েছে। لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ আয়াতাংশে সব

সাহাবীকে উদ্দেশ করে কথা বলা হয়নি, বরং যারা বনী মুসতালিকের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য পীড়াপীড়ি করছিলো সে বিশেষ কিছু সাহাবীকে উদ্দেশ করে কথা বলা হয়েছে। আর وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ আয়াতাংশে সমস্ত সাহাবীদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজেদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করার দুঃসাহস কখনো দেখাতেন না। বরং ঈমানের দাবী অনুসারে তাঁর হিদায়াত ও দিকনির্দেশনার ওপর নির্ভর করে সবসময় আনুগত্যের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতেন। এর দ্বারা আবার একথা বুঝায় না যে, যারা নিজেদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলো তাদের মধ্যে ঈমানের প্রতি কোন ভালবাসা ছিল না। একথা থেকে যে বিষয়ের ইংগিত পাওয়া যায় তা হচ্ছে ঈমানের এ দাবীর ব্যাপারে তাদের মধ্যে শিথিলতা এসে পড়েছিলো। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতি সত্ত্বেও তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলো। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রথমে এ ভুল ও এর কুফল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং পরে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সাহাবীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে নীতির অনুসারী সেটিই সঠিক নীতি ও আচরণ।

১১. অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী কোন অযৌক্তিক ভাগ–বাঁটোয়ারা নয়। তিনি যাকেই এ বিরাট নিয়ামত দান করেন জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে দান করেন এবং নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে যাকে এর উপযুক্ত বলে জানেন তাকেই দান করেন।

১২. আল্লাহ একথা বলেননি, যখন ঈমানদারদের মধ্যকার দু'টি গোষ্ঠী পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয় বরং বলেছেন, "যদি ঈমানদারদের দু'টি দল একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়।" একথা থেকে স্বতঃই বুঝা যায় যে, পরস্পরে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া মুসলমানদের নীতি ও স্বভাব নয় এবং হওয়া উচিতও নয়। মু'মিন হয়েও তারা পরস্পর লড়াই করবে এটা তাদের কাছ থেকে আশাও করা যায় না। তবে কখনো যদি এরূপ ঘটে তাহলে সে ক্ষেত্রে এমন কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত যা পরে বর্ণনা করা হচ্ছে। তাছাড়া দল বুঝাতেও فرقة শব্দ ব্যবহার না করে طائفة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় فرقة বড় দলকে এবং طائفة ছোট দলকে বুঝায়। এ থেকেও ইংগিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে এটি একটা চরম অপছন্দনীয় ব্যাপার। মুসলমানদের বড় বড় দলের এতে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকাও উচিত নয়।

১৩. এ নির্দেশ দ্বারা এমন সমস্ত মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা উক্ত বিবদমান দল দু'টিতে শামিল নয় এবং যাদের পক্ষে যুদ্ধমান দু'টি দলের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা করে দেয়া সম্ভব। অন্য কথায় আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে মুসলমানদের দু'টি দল পরস্পর লড়াই করতে থাকবে আর মুসলমান নিষ্ক্রিয় বসে তামাশা দেখবে আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে সেটা মুসলমানের কাজ নয়। বরং এ ধরনের দুঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলে তাতে সমস্ত ঈমানদার লোকদের অস্থির হয়ে পড়া উচিত এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণে যার পক্ষে যতটুকু চেষ্টা করা সম্ভব তাকে তা করতে হবে। উভয় পক্ষকে লড়াই থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতে হবে। তাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাতে হবে। প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ উভয় পক্ষের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত

করবে। বিবাদের কারণসমূহ জানবে এবং নিজ নিজ সাধ্যমত তাদের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার সব রকম প্রচেষ্টা চালাবে।

১৪. অর্থাৎ এটাও মুসলমানের কাজ নয় যে, সে অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেবে এবং যার প্রতি অত্যাচার করা হচ্ছে তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে কিংবা অত্যাচারীকে সহযোগিতা করবে। তাদের কর্তব্য হচ্ছে, যুদ্ধরত দু' পক্ষের মধ্যে সন্ধি করানোর সমস্ত প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়ে যায় তাহলে দেখতে হবে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী কে এবং অত্যাচারী কে? যে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী তাকে সহযোগিতা করবে। আর যে অত্যাচারী তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। যেহেতু এ লড়াই করতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন তাই তা ওয়াজিব এবং জিহাদ হিসেবে গণ্য। এটা সেই ফিতনার অন্তরভুক্ত নয় যার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ القائم فيها خير من الماشى والقاعد فيها خير من القائم (সে ফিতনার সময় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি চলতে থাকা ব্যক্তির চেয়ে এবং বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম।) কারণ, সে ফিতনার দ্বারা মুসলমানদের নিজেদের মধ্যকার সে লড়াইকে বুঝানো হয়েছে যা উভয় পক্ষের মাঝে গোত্র প্রীতি, জাহেলী সংকীর্ণতা এবং পার্থিব স্বার্থ অর্জনের প্রতিযোগিতা থেকে সংঘটিত হয় এবং দু' পক্ষের কেউই ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না। তবে অত্যাচারী দলের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত দলের সহযোগিতার জন্য যে যুদ্ধ করা হয় তা ফিতনায় অংশ গ্রহণ করা নয়। বরং আল্লাহর আদেশ মান্য করা। এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে সমস্ত ফিকাহবিদগণ একমত এবং ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে কোন মতানৈক্য ছিল না। (আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস) এমনকি কিছু সংখ্যক ফকীহ একে জিহাদের চাইতেও উত্তম বলে আখ্যায়িত করেন। তাদের যুক্তি হলো, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গোটা খিলাফতকাল কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার পরিবর্তে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে কাটিয়ে দিয়েছেন। (রুহুল মাআনী)। এ ধরনের লড়াই ওয়াজিব নয় বলে কেউ যদি তার সপক্ষে এই বলে যুক্তি পেশ করে যে, হযরত আলীর (রা) এসব যুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর এবং আরো কতিপয় সাহাবী অংশ গ্রহণ করেননি তাহলে সে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছে। ইবনে উমর নিজেই বলেছেন ঃ

ما وجدت فى نفسى من شيئ ما وجدت من هذه الاية انى لم اقاتل هذه الفئة الباغية كما امرنى الله تعالى - (المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة ، باب الدفع عمن قعدوا عن بيعة على)

"কোন বিষয়ে আমার মনে এতটা খটকা লাগেনি যতটা এ আয়াতের কারণে লেগেছে। কেননা, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে আমি ঐ বিদ্রোহী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি।"

সীমালংঘনকারী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করার অর্থ এটাই নয় যে, তার বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়াই করতেই হবে এবং তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে তার

বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করা এবং এর মূল উদ্দেশ্য তার অত্যাচার নিরসন করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে ধরনের শক্তি প্রয়োগ অনিবার্য তা ব্যবহার করতে হবে এবং যতটা শক্তি প্রয়োগ উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে যথেষ্ট তার চেয়ে কম শক্তিও প্রয়োগ করবে না আবার বেশীও প্রয়োগ করবে না। এ নির্দেশে সেই লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা শক্তি প্রয়োগ করে অত্যাচার ও সীমালংঘন নিরসন করতে সক্ষম।

১৫. এ থেকে বুঝা যায়, এ যুদ্ধ বিদ্রোহী (সীমালংঘনকারী দল)–কে বিদ্রোহের (সীমালংঘনের) শাস্তি দেয়ার জন্য নয়, বরং আল্লাহর নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য। আল্লাহর নির্দেশ অর্থ আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাত অনুসারে যা ন্যায় বিদ্রোহী দল তা মেনে নিতে উদ্যোগী হবে এবং সত্যের এ মানদণ্ড অনুসারে যে কর্মপন্থাটি সীমালংঘন বলে সাব্যস্ত হবে তা পরিত্যাগ করবে। কোন বিদ্রোহী দল যখনই এ নির্দেশ অনুসরণ করতে সম্মত হবে তখন থেকেই তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। কারণ, এটিই এ যুদ্ধের চূড়ান্ত লক্ষ ও উদ্দেশ্য। এরপরও যদি কেউ বাড়াবাড়ি করে তাহলে সে–ই সীমালংঘনকারী। এখন কথা হলো, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাত অনুসারে কোন বিবাদে ন্যায় কি এবং অন্যায় কি তা নির্ধারণ করা নিসন্দেহে তাদেরই কাজ যারা এ উম্মতের মধ্যে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির দিক দিয়ে বিষয়টি বিচার–বিশ্লেষণ করার যোগ্য।

১৬. শুধু সন্ধি করিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি, বরং নির্দেশ দেয়া হয়েছে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে সন্ধি করিয়ে দেয়ার। এ থেকে বুঝা যায় হক ও বাতিলের পার্থক্যকে উপেক্ষা করে শুধু যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য যে সন্ধি করানো হয় এবং যেখানে সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী দলকে অবদমিত করে সীমালংঘনকারী দলকে অন্যায়ভাবে সুবিধা প্রদান করানো হয় আল্লাহর দৃষ্টিতে তার কোন মূল্য নেই। সে সন্ধিই সঠিক যা ন্যায় বিচারের ওপর ভিত্তিশীল। এ ধরনের সন্ধি দ্বারা বিপর্যয় দূরীভূত হয়। তা না হলে ন্যায়ের অনুসারীদের অবদমিত করা এবং সীমালংঘনকারীদের সাহস ও উৎসাহ যোগানোর অনিবার্য পরিণাম দাঁড়ায় এই যে, অকল্যাণের মূল কারণসমূহ যেমন ছিল তেমনই থেকে যায়। এমনকি তা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তা থেকে বার বার বিপর্যয় সৃষ্টির ঘটনা ঘটতে থাকে।

১৭. এ আয়াতটি মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ সম্পর্কে শরয়ী বিধানের মূল ভিত্তি। একটি মাত্র হাদীস (যা আমরা পরে বর্ণনা করব) ছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতে এ বিধানের আর কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কারণ, নবীর (সা) যুগে মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের মত কোন ঘটনাই কখনো সংঘটিত হয়নি যে, তাঁর কাজ ও কথা থেকে এ বিধানের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। পরে হযরত আলীর (রা) খিলাফত যুগে যখন মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ হয় তখন এ বিধানের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ দেয়া হয়। তখন যেহেতু বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কিরাম বর্তমান ছিলেন তাই তাদের কর্মকাণ্ড ও বর্ণিত আদেশ থেকে ইসলামী বিধানের এ শাখার বিস্তারিত নিয়ম–কানুন বিধিবদ্ধ করা হয়। বিশেষ করে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নীতি ও কর্মপন্থা এ ব্যাপারে সমস্ত ফিকাহবিদদের কাছে মূল উৎস হিসেবে গণ্য হয়। নিচে আমরা এ বিধানের একটি প্রয়োজনীয় সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করছি :

এক ঃ মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধের কয়েকটি ধরন হতে পারে এবং প্রতিটি ধরন সম্পর্কে শরীয়াতের বিধান বিভিন্ন ঃ

(ক) যুদ্ধরত দু'টি দল যখন কোন মুসলিম সরকারের প্রজা হবে তখন তাদের সন্ধি ও সমঝোতা করে দেয়া কিংবা তাদের মধ্যে কোন্ দলটি সীমালংঘনকারী তা নির্ণয় করা এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে ন্যায় ও সত্য গ্রহণ করতে বাধ্য করা সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(খ) যুদ্ধরত দু'পক্ষই যখন দু'টি বড় শক্তিশালী দল হবে কিংবা দু'টি মুসলিম সরকার হবে এবং উভয়ে পার্থিব স্বার্থের জন্য লড়াই চালাবে তখন মু'মিনদের কাজ হলো এ ফিতনায় অংশ গ্রহণ করা থেকে চূড়ান্তভাবে বিরত থাকা এবং উভয় পক্ষকেই আল্লাহর ভয় দেখিয়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে থাকা।

(গ) যুদ্ধরত যে দু'টি পক্ষের কথা ওপরে (খ) অংশে উল্লেখ করা হয়েছে তার একটি পক্ষ যদি ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় আর অপর পক্ষ যদি বাড়াবাড়ি করতে থাকে এবং আপোষ মীমাংসায় রাজী না হয় সে ক্ষেত্রে ঈমানদারদের কর্তব্য হচ্ছে সীমালংঘনকারী পক্ষের বিরুদ্ধে ন্যায়পন্থী দলের পক্ষ অবলম্বন করা।

(ঘ) উভয় পক্ষের একটি পক্ষ যদি প্রজা হয় আর তারা সরকার অর্থাৎ মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে থাকে তাহলে ফিকাহবিদগণ বিদ্রোহে অংশ গ্রহণকারী এ দলকেই তাদের পরিভাষায় বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

দুই ঃ বিদ্রোহী অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণকারী গোষ্ঠীও নানা রকম হতে পারে ঃ

(ক) যারা শুধু হাংগামা সৃষ্টি করতে তৎপর হয়েছে। এ বিদ্রোহের স্বপক্ষে তাদের কাছে কোন শরীয়াতসম্মত কারণ নেই। এ ধরনের দল ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সরকারের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সর্বসম্মত মতে বৈধ এবং এ ক্ষেত্রে সরকারকে সমর্থন করা ঈমানদারদের জন্য ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে সরকার ন্যায়বান হোক বা না হোক তাতে কিছু এসে যায় না।

(খ) যেসব বিদ্রোহী সরকারকে উৎখাতের জন্য বিদ্রোহ করে। কিন্তু এ জন্য তাদের কাছে শরীয়াত সম্মত কোন যুক্তি নেই। বরং তাদের বাহ্যিক অবস্থা থেকে প্রকাশ পাচ্ছে যে, তারা জালেম ও ফাসিক। এ ক্ষেত্রে সরকার যদি ন্যায়নিষ্ঠ হয় তাহলে তাকে সমর্থন করা বিনা বাক্য ব্যয়ে ওয়াজিব। কিন্তু সে সরকার যদি ন্যায়নিষ্ঠ নাও হয় তবুও তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য লড়াই করা ওয়াজিব। কারণ সেই সরকারের জন্যই রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা টিকে আছে।

(গ) যারা নতুন কোন শরয়ী ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, কিন্তু তাদের ব্যাখ্যা বাতিল এবং আকীদা ফাসেদ; যেমন, খারেজীদের আকীদা ও ব্যাখ্যা। এরূপ ক্ষেত্রে মুসলিম সরকারের তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার বৈধ অধিকার আছে। সে সরকার ন্যায়নিষ্ঠ হোক বা না হোক তাতে কিছু এসে যায় না। আর এ সরকারকে সমর্থন করাও ওয়াজিব।

(ঘ) যারা এমন কোন ন্যায়নিষ্ঠ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যার প্রধানের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব বৈধভাবে কায়েম হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের কাছে শরীয়াতসম্মত কোন

ব্যাখ্যা থাক বা না থাক সরকারের সর্বাবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বৈধ এবং তাদের সমর্থন করা ওয়াজিব।

(৬) যারা এমন একটি জালেম সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে যার নেতৃত্ব জোর করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যার নেতৃবৃন্দ ফাসেক। কিন্তু বিদ্রোহকারীগণ ন্যায়নিষ্ঠ। তারা আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া তাদের বাহ্যিক অবস্থা থেকেও প্রতিভাত হচ্ছে যে, তারা সৎ ও নেক্‌কার। এরূপ ক্ষেত্রে তাদেরকে 'বিদ্রোহী' অর্থাৎ সীমালংঘনকারী বলে আখ্যায়িত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব বলে ঘোষণা করার ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদদের মধ্যে চরম মতবিরোধ হয়েছে। এ মতবিরোধের বিষয়টি আমরা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

অধিকাংশ ফিকাহবিদ এবং আহলে হাদীসদের মত হচ্ছে, যে নেতার নেতৃত্ব একবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁর ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রে শান্তি, নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় আছে তিনি ন্যায়নিষ্ঠ ও অত্যাচারী যাই হয়ে থাকুন না কেন এবং তাঁর নেতৃত্ব যেভাবেই কায়েম হয়ে থাকুক না কেন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম। তবে তিনি সুস্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হলে তা ভিন্ন কথা। ইমাম সারাখসী লিখছেন ঃ মুসলমানগণ যখন কোন শাসকের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে এবং তার কারণে শান্তি লাভ করে ও পথঘাট নিরাপদ হয় এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের কোন দল বা গোষ্ঠী তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে যার যুদ্ধ করার ক্ষমতা আছে এমন লোকদের মুসলমানদের ঐ শাসকের সাথে মিলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব। (আল মাবসূত, খাওয়ারেজ অধ্যায়) ইমাম নববী শরহে মুসলিমে বলেন ঃ নেতা অর্থাৎ মুসলিম শাসকবৃন্দ জালেম এবং ফাসেক হলেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও লড়াই করা হারাম। এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলে ইমাম নববী দাবী করেছেন।

কিন্তু এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলে দাবী করা ঠিক নয়। মুসলিম ফিকাহ্‌বিদদের একটি বড় দল যার মধ্যে বড় বড় জ্ঞানী ও পণ্ডিত অন্তরভুক্ত বিদ্রোহকারীদের কেবল তখনই বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করেন যখন তারা ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। জালেম ও ফাসেক নেতাদের বিরুদ্ধে সৎ ও নেক্‌কার লোকদের অবাধ্যতাকে তারা কুরআন মজীদের পরিভাষা অনুসারে বিদ্রোহের নামান্তর বলে আখ্যায়িত করেন না এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ওয়াজিব বলেও মনে করেন না। অত্যাচারী নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফার মতামত বিষয়ে জ্ঞানীগণ সম্যক অবহিত। আবু বকর জাস্‌সাস আহকামুল কুরআন গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, ইমাম সাহেব এ যুদ্ধকে শুধু জায়েযই মনে করতেন না বরং অনুকূল পরিস্থিতিতে ওয়াজিব বলে মনে করতেন। (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯) বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যায়েদ ইবনে আলীর বিদ্রোহে তিনি যে শুধু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন তাই নয়, বরং অন্যদেরকেও তা করতে উপদেশ দিয়েছেন। (আল জাস্‌সাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১)। মনসূরের বিরুদ্ধে নাফসে যাকিয়ার বিদ্রোহে তিনি পুরাপুরি সক্রিয়ভাবে নাফসে যাকিয়াকে সাহায্য করেছেন। সেই যুদ্ধকে তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চেয়েও উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। (আল জাস্‌সাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১; মানাকেবে আবী হানীফা, আল কারদারী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা

৭১–৭২) তাছাড়াও ইমাম সারাখসী যে সিদ্ধান্ত বর্ণনা করেছেন তা হানাফী ফিকাহ্‌বিদদের সর্বসম্মত মত নয়। হিদায়ার শরাহ ফাতহুল কাদীরে ইবনে হুমাম লিখছেন ঃ

الباغي في عرف الفقهاء الخارج عن طاعة امام الحق

"সাধারণভাবে ফিকাহবিদদের মতে বিদ্রোহী সে–ই যে ন্যায় পরায়ণ ইমামের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়।"

হাম্বলীদের ইবনে আকীল ও ইবনুল জুযী ন্যায়নিষ্ঠ নয় এমন ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে জায়েয বলে মনে করেন। এ ব্যাপারে তারা হযরত হুসাইনের বিদ্রোহকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। (আল ইনসাফ, ১০ খণ্ড, বাবু কিতালি আহলিল বাগী) ইমাম শাফেয়ী তাঁর কিতাবুল উম্ম গ্রন্থে সে ব্যক্তিকে বিদ্রোহী বলে মত প্রকাশ করেছেন, যে ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। (৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৫) মুদাওয়ানা গ্রন্থে ইমাম মালেকের মত উদ্ধৃত হয়েছে যে, বিদ্রাহী যদি ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয় তবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে। (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৭) কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী আহকামুল কুরআনে তাঁর এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন, যদি কেউ উমর ইবনে আবদুল আযীযের মত ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাহলে তাকে দমন করা ওয়াজিব। তাঁর চেয়ে ভিন্নতর কোন ইমাম সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় তাকে ঐ অবস্থাই ছেড়ে দাও। আল্লাহ তা'আলা অপর কোন জালেম দ্বারা তাকে শাস্তি দেবেন এবং তৃতীয় কোন জালেম দ্বারা তাদের উভয়কে আবার শাস্তি দেবেন। তিনি ইমাম মালেকের আরো একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তা হচ্ছে এক শাসকের কাছে আনুগত্যের শপথ নিয়ে থাকলে তার ভাইও যদি তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তার বিরুদ্ধেও লড়াই করা হবে যদি সে ন্যায়নিষ্ঠ শাসক হয়। আমাদের সময়ের ইমাম বা নেতাদের সম্পর্কে বলা যায় যে, তাদের কোন বাইয়াত বা আনুগত্য শপথই নেই। কারণ জবরদস্তিমূলকভাবে তাদের পক্ষে শপথ নেয়া হয়েছে। তাছাড়া সাহনুনের বরাত দিয়ে কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী মালেকী উলামাদের যে রায় বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে, যুদ্ধ কেবল ন্যায়নিষ্ঠ ইমামের সহযোগিতার জন্যই করা যাবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম বাইয়াতকৃত ইমাম ন্যায়নিষ্ঠ হোক কিংবা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী ব্যক্তি ন্যায়নিষ্ঠ হোক তাতে কিছু এসে যায় না। দু' জনের কেউই যদি ন্যায়নিষ্ঠ না হয় তাহলে দু'জনের থেকেই দূরে থাকো। তবে যদি তোমার নিজের জীবনের ওপর হামলা হয় কিংবা মুসলমানগণ জুলুমের শিকার হয় তাহলে প্রতিরোধ করো। এ মত উদ্ধৃত করার পর কাজী আবু বকর বলেন ঃ

لانقاتل الامع امام عادل يقدمه اهل الحق لانفسهم

"সত্যের অনুসারীগণ যাকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাকে ছাড়া আর কারো জন্য আমরা যুদ্ধ করবো না।"

তিন ঃ বিদ্রোহীরা যদি স্বল্প সংখ্যক হয়, কোন বড় দল তাদের পৃষ্ঠপোষক না থাকে এবং তাদের কাছে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম বেশী না থাকে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে বিদ্রোহ সম্পর্কিত আইন প্রযোজ্য হবে না। তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ আইন প্রয়োগ করা হবে। অর্থাৎ

তারা যদি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে তাহলে কিসাস গহণ করা হবে এবং আর্থিক ক্ষতি সাধন করে থাকলে জরিমানা অদায় করা হবে। যেসব বিদ্রোহী কোন বড় রকমের শক্তির অধিকারী এবং অধিকতর সাংগঠনিক ক্ষমতা ও বিপুল যুদ্ধ সরঞ্জাম নিয়ে বিদ্রোহ করবে বিদ্রোহ বিষয়ক আইন কানুন কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

চার ঃ বিদ্রোহীরা যতক্ষণ শুধু তাদের ভ্রান্ত আকীদা–বিশ্বাস অথবা সরকার ও সরকার প্রধানের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহাত্মক ও শত্রুতামূলক ধ্যান–ধারণা প্রকাশ করতে থাকবে ততক্ষণ তাদেরকে হত্যা বা বন্দী করা যাবে না। যখন তারা কার্যত সশস্ত্র বিদ্রোহ করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে কেবল তখনই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে। (আল মাবসূত—বাবুল খাওয়ারিজ, ফাতহুল কাদীর—বাবুল বুগাত, আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস)।

পাঁচ ঃ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে কুরআন মজীদের নির্দেশ অনুসারে তাদেরকে বিদ্রোহ পরিত্যাগ করে ইনসাফ ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ করার আহবান জানানো হবে। তাদের যদি কোন সন্দেহ–সংশয় এবং প্রশ্ন থাকে তাহলে যুক্তি দ্বারা বুঝিয়ে দূর করার চেষ্টা করা হবে। তা সত্ত্বেও যদি তারা বিরত না হয় এবং তাদের পক্ষ থেকেই যুদ্ধ শুরু করা হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা হবে। (ফাতহুল কাদীর, আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস)।

ছয় ঃ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের বরাত দিয়ে হাকেম, বায্যার ও আল জাস্‌সাস বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নীতিমালার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হে উম্মে আবদের পুত্র, এ উম্মতের বিদ্রোহীদের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ কি তা কি জান?" তিনি বললেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন ঃ তাদের আহতদের ওপর আঘাত করা হবে না, বন্দীদের হত্যা করা হবে না, পলায়নরতদের পিছু ধাওয়া করা হবে না এবং তাদের সম্পদ গনীমতের সম্পদ হিসেবে বন্টন করা হবে না। এ নীতিমালার দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি ও কর্ম সমস্ত ফিকাহ্‌বিদ এ উক্তি ও আমলের ওপর নির্ভর করেছেন। উষ্ট্র যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর তিনি ঘোষণা করলেন ঃ পলায়নপরদের পিছু ধাওয়া করো না, আহতদের আক্রমণ করো না, বন্দীদের হত্যা করো না, যে অস্ত্র সমর্পণ করবে তাকে নিরাপত্তা দান করো, মানুষের বাড়ীঘরে প্রবেশ করো না এবং গালি দিতে থাকলেও কোন নারীর ওপর হাত তুলবে না। হযরত আলীর সেনাদলের কেউ কেউ দাবী করলো যে, বিরোধী ও তাদের সন্তান–সন্ততিদের দাস বানিয়ে বন্টন করে দেয়া হোক। হযরত আলী (রা) একথা শুনে রাগান্বিত হয়ে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশাকে তার নিজের অংশে নিতে চাও?

সাত ঃ হযরত আলীর (রা) অনুসৃত নীতি ও আদর্শ থেকে বিদ্রোহীদের অর্থ–সম্পদ সম্পর্কে যে বিধান গৃহীত হয়েছে তা হচ্ছে, তাদের সম্পদ সেনাবাহিনীর মধ্যে পাওয়া যাক কিংবা বাড়ীতে থাক এবং সম্পদের মালিক জীবিত হোক বা মৃত হোক কোন অবস্থায়ই তা গনীমতের মাল হিসেবে গণ্য করা যাবে না এবং সৈন্যদের মধ্যে বন্টনও করা যাবে না। তবে যে মাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া জরুরী নয়। যুদ্ধ

শেষ হলে এবং বিদ্রোহ স্তিমিত হওয়ার পর তাদের সম্পদ তাদেরকেই ফেরত দেয়া হবে। যুদ্ধ চলাকালে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও বাহন যদি হস্তগত হয় তা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু ওগুলোকে বিজয়ীদের মালিকানাভুক্ত করে গনীমতের সম্পদ হিসেবে বন্টন করা হবে না এবং পুনরায় তাদের বিদ্রোহ করার আশংকা না থাকলে ঐ সব জিনিসও তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। শুধু ইমাম আবু ইউসুফের মত হচ্ছে, সরকার ঐ সব সম্পদ গনীমত হিসেবে গণ্য করবেন। (আল মাবসূত, ফাতহুল কাদীর, আল জাস্‌সাস)।

আট ঃ পুনরায় বিদ্রোহ করবে না এ প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাদের বন্দীদের মুক্ত করে দেয়া হবে। (আল মাবসূত)

নয় ঃ নিহত বিদ্রোহীদের মাথা কেটে প্রদর্শন করা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। কারণ তা মৃতদেহ বিকৃতকরণ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। এক রোমান বিশপের মাথা কেটে হযরত আবু বকরের (রা) কাছে আনা হলে তিনি তাতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন ঃ রোমান ও ইরানীদের অন্ধ অনুসরণ আমাদের কাজ নয়। সুতরাং কাফেরদের সাথে যেখানে এরূপ আচরণ করা গ্রহণযোগ্য নয় সেখানে মুসলমানদের সাথে এরূপ আচরণ আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। (আল মাবসূত)

দশ ঃ যুদ্ধকালে বিদ্রোহীদের যেসব প্রাণ ও সম্পদের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে যুদ্ধ শেষ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার কোন কিসাস বা ক্ষতিপূরণ তাদের ওপর বর্তাবে না। ফিতনা ও অশান্তি পুনরায় যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে সে জন্য কোন নিহতের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাবে না কিংবা কোন সম্পদের জন্য তাদের জরিমানাও করা যাবে না। সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক লড়াইয়ে এ নীতিমালাই অনুসরণ করা হয়েছিলো। (আল মাবসূত, আল জাস্‌সাস, আহকামুল কুরআন—ইবনুল আরাবী)

এগার ঃ যেসব অঞ্চল বিদ্রোহীদের করতলগত হয়েছে এবং সেখানে তারা নিজেদের প্রশাসন চালু করে যাকাত এবং সরকারী কর ইত্যাদি আদায় করে নিয়েছে, সরকার ঐ সব অঞ্চল পুনর্দখলের পর জনগণের কাছে পুনরায় উক্ত যাকাত ও কর দাবী করবে না। বিদ্রোহীরা যদি উক্ত অর্থ শরীয়াতসম্মত পন্থায় খরচ করে থাকে তাহলে আদায়কারীদের পক্ষ থেকে তা আল্লাহর কাছেও আদায়কৃত বলে গণ্য হবে। কিন্তু তারা যদি উক্ত সম্পদ শরীয়াতসম্মত নয় এমন পন্থায় খরচ করে থাকে তাহলে তা প্রদানকারী এবং আল্লাহর মধ্যকার ব্যাপার। তারা চাইলে পুনরায় যাকাত আদায় করতে পারে। (ফাতহুল কাদীর, আল জাস্‌সাস—ইবনুল আরাবী)।

বার ঃ বিদ্রোহীরা তাদের অধিকৃত অঞ্চলে যেসব বিচারালয় কায়েম করেছিল তার বিচারক যদি ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে থাকেন এবং শরীয়াত অনুসারে বিচারকার্য সমাধা করে থাকেন তাহলে তাদের নিয়োগকারীরা বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী হলেও তা বহাল রাখা হবে। কিন্তু তাদের ফায়সালা যদি শরীয়াতসম্মত না হয় এবং বিদ্রোহ দমনের পর তাদেরকে সরকারের বিচারালয়ে বিচারের জন্য হাজির করা হয় তাহলে তাদের ফায়সালাসমূহ বহাল রাখা হবে না। তাছাড়া বিদ্রোহীদের প্রতিষ্ঠিত বিচারালায়সমূহের পক্ষ থেকে জারী করা ওয়ারেন্ট বা হুকুমনামা সরকারের আদালতে গৃহীত হবে না। (আল মাবসূত, আল জাস্‌সাস)

তের ঃ ইসলামী আদালতসমূহে বিদ্রোহীদের সাক্ষ গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ ন্যায় ও ইনসাফের অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফাসেকীর অন্তরভুক্ত। ইমাম মুহাম্মাদ বলেন ঃ যতক্ষণ না তারা যুদ্ধ করবে এবং ন্যায়ের অনুসারীদের বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহে লিপ্ত হবে ততক্ষণ তাদের সাক্ষ গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু একবার তারা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়লে আমি আর তাদের সাক্ষ গ্রহণ করবো না। (আল জাস্‌সাস)

এসব বিধান থেকে মুসলমান বিদ্রোহী এবং কাফের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আইনে পার্থক্য কি তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

১৮. এ আয়াতটি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। দুনিয়ার অন্য কোন আদর্শ বা মত ও পথের অনুসারীদের মধ্যে এমন কোন ভ্রাতৃত্ব বন্ধন পাওয়া যায় না যা মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যায়। এটাও এ আয়াতের বরকতে সাধিত হয়েছে। এ নির্দেশের দাবী ও গুরুত্বসমূহ কি, বহুসংখ্যক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বর্ণনা করেছেন। ঐ সব হাদীসের আলোকে এ আয়াতের আসল লক্ষ ও উদ্দেশ্য বোধগম্য হতে পারে।

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার থেকে তিনটি বিষয়ে "বাইয়াত" নিয়েছেন। এক, নামায কায়েম করবো। দুই, যাকাত আদায় করতে থাকবো। তিন, প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করবো। (বুখারী—কিতাবুল ঈমান)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা কুফরী। (বুখারী—কিতাবুল ঈমান) মুসনাদে আহমাদে হযরত সাঈদ ইবনে মালেক ও তার পিতা থেকে অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত হারাম।" (মুসলিম—কিতাবুল বিরর ওয়াসসিলাহ, তিরমিযী—আবওয়াবুল বিরর ওয়াস্‌সিলাহ)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, নবী (সা) বলেছেন ঃ এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার ওপরে জুলুম করে না, তাকে সহযোগিতা করা পরিত্যাগ করে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে না। কোন ব্যক্তির জন্য তার কোন মুসলমান ভাইকে হেয় ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করার মত অপকর্ম আর নাই। (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী নবীর (সা) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, ঈমানদারদের সাথে একজন ঈমানদারের সম্পর্ক ঠিক তেমন যেমন দেহের সাথে মাথার সম্পর্ক। সে ঈমানদারদের প্রতিটি দুঃখ-কষ্ট ঠিক অনুভব করে যেমন মাথা দেহের প্রতিটি অংশের ব্যথা অনুভব করে। (মুসনাদে আহমাদ) অপর একটি হাদীসে এ বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ পারস্পরিক ভালবাসা, সুসম্পর্ক এবং একে অপরের দয়ামায়া ও স্নেহের ব্যাপারে মু'মিনগণ একটি দেহের মত।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا۟ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿١١﴾

২ রুকূ'

হে[১৯] ঈমানদারগণ, পুরুষরা যেন অন্য পুরুষদের বিদ্রূপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম। আর মহিলারাও যেন অন্য মহিলাদের বিদ্রূপ না করে। হতে পারে তারাই এদের চেয়ে উত্তম।[২০] তোমরা একে অপরকে বিদ্রূপ করোনা[২১] এবং পরস্পরকে খারাপ নামে ডেকো না।[২২] ঈমান গ্রহণের পর গোনাহর কাজে প্রসিদ্ধি লাভ করা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার।[২৩] যারা এ আচরণ পরিত্যাগ করেনি তারাই জালেম।

দেহের যে অংগেই কষ্ট হোক না কেন তাতে গোটা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভুগতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

আরো একটি হাদীসে নবীর (সা) এ বাণীটি উদ্ধৃত হয়েছে যে, মু'মিনগণ পরস্পরের জন্য একই প্রাচীরের ইঁটের মত একে অপরের থেকে শক্তিলাভ করে থাকে। (বুখারী—কিতাবুল আদাব, তিরমিযী—কিতাবুল বির্‌র–ওয়াস্ সিলাহ)

১৯. পূর্বের দু'টি আয়াতে মুসলমানদের পারস্পরিক লড়াই সম্পর্কে জরুরী নির্দেশনা দেয়ার পর ঈমানদারদেরকে এ অনুভূতি দেয়া হয়েছিল যে, ইসলামের পবিত্রতম সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা একে অপরের ভাই এবং আল্লাহর ভয়েই তাদেরকে নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক রাখার চেষ্টা করা উচিত। এখন পরবর্তী দু'টি আয়াতে এমন সব বড় বড় অন্যায়ের পথ রুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যা সাধারণত লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। একে অপরের ইজ্জতের ওপর হামলা, একে অপরকে মনোকষ্ট দেয়া, একে অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা এবং একে অপরের দোষ–ত্রুটি তালাশ করা পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টির এগুলোই মূল কারণ। এসব কারণ অন্যান্য কারণের সাথে মিশে বড় বড় ফিতনার সৃষ্টি করে। এ ক্ষেত্রে পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তার যেসব ব্যাখ্যা হাদীসসমূহে পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে মানহানি (Law of Libel) সম্পর্কিত বিস্তারিত আইন–বিধান রচনা করা যেতে পারে। পাশ্চাত্যের মানহানি সম্পর্কিত আইন এ ক্ষেত্রে এতটাই অসম্পূর্ণ যে, এ আইনের অধীনে কেউ মানহানির অভিযোগ পেশ করে নিজের মর্যাদা আরো কিছু খুইয়ে আসে। পক্ষান্তরে ইসলামী আইন প্রত্যেক ব্যক্তির এমন একটি মৌলিক মর্যাদার স্বীকৃতি দেয় যার ওপর কোন আক্রমণ

চালানোর অধিকার কারো নেই। এ ক্ষেত্রে হামলা বাস্তবতা ভিত্তিক হোক বা না হোক এবং যার ওপর আক্রমণ করা হয়, জনসমক্ষে তার কোন সুপরিচিত মর্যাদা থাক বা না থাক তাতে কিছু যায় আসে না। এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে অপমান করেছে শুধু এতটুকু বিষয়ই তাকে অপরাধী প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। তবে এ অপমান করার যদি কোন শরীয়াতসম্মত বৈধতা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

২০. বিদ্রূপ করার অর্থ কেবল কথার দ্বারা হাসি-তামাসা করাই নয়। বরং কারো কোন কাজের অভিনয় করা, তাঁর প্রতি ইংগিত করা, তার কথা, কাজ, চেহারা বা পোশাক নিয়ে হাসাহাসি করা অথবা তার কোন ত্রুটি বা দোষের দিকে এমনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাতে অন্যদের হাসি পায়। এ সবই হাসি-তামাসার অন্তরভুক্ত। মূল নিষিদ্ধ বিষয় হলো কেউ যেন কোনভাবেই কাউকে উপহাস ও হাসি-তামাসার লক্ষ না বানায়। কারণ, এ ধরনের হাসি-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের পেছনে নিশ্চিতভাবে নিজের বড়ত্ব প্রদর্শন এবং অপরকে অপমানিত করা ও হেয় করে দেখানোর মনোবৃত্তি কার্যকর। যা নৈতিকভাবে অত্যন্ত দোষণীয়। তাছাড়া এভাবে অন্যের মনোকষ্ট হয় যার কারণে সমাজে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। এ কারণেই এ কাজকে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

পুরুষ ও নারীদের কথা আলাদা করে উল্লেখ করার অর্থ এ নয় যে, পুরুষদের নারীদেরকে বিদ্রূপের লক্ষ বানানো এবং নারীদের পুরুষদেরকে হাসি-তামাসার লক্ষ বানানো জায়েয। মূলত যে কারণে নারী ও পুরুষদের বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে, ইসলাম এমন সমাজ আদৌ সমর্থন করে না। যেখানে নারী পুরুষ অবাধে মেলামেশা করতে পারে। অবাধ খোলামেলা মজলিসেই সাধারণত একজন আরেকজনকে হাসি-তামাসার লক্ষ বানাতে পারে। মুহাররাম নয় এমন নারী পুরুষ কোন মজলিসে একত্র হয়ে পরস্পর হাসি-তামাসা করবে ইসলামে এমন অবকাশ আদৌ রাখা হয়নি। তাই একটি মুসলিম সমাজের একটি মজলিসে পুরুষ কোন নারীকে উপহাস ও বিদ্রূপ করবে কিংবা নারী কোন পুরুষকে বিদ্রূপ ও উপহাস করবে এমন বিষয় কল্পনার যোগ্যও মনে করা হয়নি।

২১. মূল আয়াতে لمز শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটির মধ্যে বিদ্রূপ ও কুৎসা ছাড়াও আরো কিছু সংখ্যক অর্থ এর মধ্যে শামিল। যেমন : উপহাস করা, অপবাদ আরোপ করা, দোষ বের করা এবং খোলাখুলি বা গোপনে অথবা ইশারা-ইংগিত করে কাউকে তিরস্কারের লক্ষস্থল বানানো। এসব কাজও যেহেতু পারস্পরিক সুসম্পর্ক নষ্ট করে এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তাই এসব কাজও হারাম করে দেয়া হয়েছে। এখানে আল্লাহর ভাষার চমৎকারিত্ব এই যে, لَا يَلْمِزْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (একে অপরকে বিদ্রূপ করো না) বলার পরিবর্তে لَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ (নিজেকে নিজে বিদ্রূপ করো না) কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা স্বতই একথার ইংগিত পাওয়া যায় যে, অন্যদের বিদ্রূপ ও উপহাসকারী প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই বিদ্রূপ ও উপহাস করে। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, যতক্ষণ না কারো মনে কুপ্রেরণার লাভা জমে উপচে পড়ার জন্য প্রস্তুত না হবে ততক্ষণ তার মুখ অন্যদের কুৎসা রটনার জন্য খুলবে না। এভাবে এ মানসিকতার লালনকারী অন্যদের আগে নিজেকেই তো কুকর্মের আস্তানা বানিয়ে ফেলে। তারপর যখন সে অন্যদের ওপর আঘাত করে তখন তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সে তার নিজের ওপর আঘাত

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ⑫

হে ঈমানদারগণ, বেশী ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো কারণ কোন কোন ধারণা ও অনুমান গোনাহ।[২৪] দোষ অন্বেষণ করো না।[২৫] আর তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে।[২৬] এমন কেউ কি তোমাদের মধ্যে আছে, যে তার নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে?[২৭] দেখো, তা খেতে তোমাদের ঘৃণা হয়। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ অধিক পরিমাণে তাওবা কবুলকারী এবং দয়ালু।

করার জন্য অন্যদেরকে আহবান করছে। ভদ্রতার কারণে কেউ যদি তার আক্রমণ এড়িয়ে চলে তাহলে তা ভিন্ন কথা। কিন্তু যাকে সে তার বাক্যবাণের লক্ষস্থল বানিয়েছে সে–ও পাল্টা তার ওপর আক্রমণ করুক এ দরজা সে নিজেই খুলে দিয়েছে।

২২. এ নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন ব্যক্তিকে এমন নামে যেন ডাকা না হয় অথবা এমন উপাধি না দেয়া হয় যা তার অপছন্দ এবং যা দ্বারা তার অবমাননা ও অমর্যাদা হয়। যেমন কাউকে ফাসেক বা মুনাফিক বলা। কাউকে খোঁড়া, অন্ধ অথবা কানা বলা। কাউকে তার নিজের কিংবা মা–বাপের অথবা বংশের কোন দোষ বা ত্রুটির সাথে সম্পর্কিত করে উপাধি দেয়া। মুসলমান হওয়ার পর তার পূর্ব অনুসৃত ধর্মের কারণে ইহুদী বা খৃস্টান বলা। কোন ব্যক্তি, বংশ, আত্মীয়তা অথবা গোষ্ঠীর এমন নাম দেয়া যার মধ্যে তার নিন্দা ও অপমানের দিকটি বিদ্যমান। তবে যেসব উপাধি বাহ্যত খারাপ কিন্তু তা দ্বারা কারো নিন্দা করা উদ্দেশ্য নয়, বরং ঐ উপাধি দ্বারা যাদের সম্বোধন করা হয় তা তাদের পরিচয়ের সহায়ক এমন সব উপাধি এ নির্দেশের মধ্যে পড়ে না। এ কারণে মুহাদ্দিসগণ "আসমাউর রিজাল" (বা হাদীসের রাবীদের পরিচয় মূলক) শাস্ত্রে সুলায়মান আল আ'মাশ (ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন সুলায়মান) এবং ওয়াসেল আল আহদাব (কুঁজো ওয়াসেল) এর মত নামের উল্লেখ রেখেছেন। যদি একই নামের কয়েকজন লোক থাকে এবং তাদের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তার বিশেষ কোন উপাধি দ্বারাই কেবল চেনা যায় তাহলে ঐ উপাধি খারাপ হলেও তা বলা যেতে পারে। যেমন আবদুল্লাহ নামের যদি কয়েকজন লোক থাকে আর তাদের মধ্যে একজন অন্ধ হয় তাহলে তাকে চেনার সুবিধার জন্য আপনি 'অন্ধ আবদুল্লাহ' বলতে পারেন। অনুরূপ এমন সব উপাধি বা উপনাম এ নির্দেশের মধ্যে পড়বে না যা দ্বারা বাহ্যত অমর্যাদা বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ভালবাসা ও স্নেহবশতই রাখা হয় এবং যাদেরকে এ উপাধি বা উপনামে ডাকা হয় তারা নিজেরাও তা পছন্দ করে। যেমন ঃ আবু হুরাইরা এবং আবু তুরাব।

২৩. ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও সে কটুভাষী হবে এবং অসৎ ও অন্যায় কাজের জন্য বিখ্যাত হবে এটা একজন ঈমানদারের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। কোন কাফের যদি মানুষকে ঠাট্টা–বিদ্রূপ ও উপহাস করা কিংবা বেছে বেছে বিদ্রূপাত্মক নাম দেয়ার ব্যাপারে খুব খ্যাতি লাভ করে তাহলে তা মনুষ্যত্বের বিচারে যদিও সুখ্যাতি নয় তবুও অন্তত তার কুফরীর বিচারে তা মানায়। কিন্তু কেউ আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং আখেরাতে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও যদি এরূপ হীন বিশেষণে ভূষিত হয় তাহলে তার জন্য পানিতে ডুবে মরার শামিল।

২৪. একেবারেই ধারণা করতে নিষেধ করা হয়নি। বরং খুব বেশী ধারণার ভিত্তিতে কাজ করতে এবং সব রকম ধারণার অনুসরণ থেকে মানা করা হয়েছে। এর কারণ বলা হয়েছে এই যে, অনেক ধারণা গোনাহর পর্যায়ে পড়ে। এ নির্দেশটি বুঝার জন্য আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত ধারণা কত প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের নৈতিক অবস্থা কি?

এক প্রকারের ধারণা হচ্ছে, যা নৈতিকতার দৃষ্টিতে অত্যন্ত পছন্দনীয় এবং দীনের দৃষ্টিতেও কাম্য ও প্রশংসিত। যেমন ঃ আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং ঈমানদারদের ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করা। তাছাড়া যাদের সাথে ব্যক্তির মেলামেশা ও উঠাবসা আছে এবং যাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণের কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই।

আরেক প্রকার ধারণা আছে যা বাদ দিয়ে বাস্তব জীবনে চলার কোন উপায় নেই। যেমন, আদালতে বিচারকের সামনে যেসব সাক্ষ পেশ করা হয় তা যাঁচাই বাছাই করে নিশ্চিত প্রায় ধারণার ভিত্তিতে ফায়সালা করা ছাড়া আদালত চলতে পারে না। কারণ, বিচারকের পক্ষে ঘটনা সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। আর সাক্ষের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নিশ্চিত সত্য হয় না, বরং প্রায় নিশ্চিত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। যে ক্ষেত্রে কোন না কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়ে, কিন্তু বাস্তব জ্ঞান লাভ সম্ভব হয় না সে ক্ষেত্রে ধারণার ওপর ভিত্তি করে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া মানুষের জন্য আর কোন উপায় থাকে না।

তৃতীয় এক প্রকারের ধারণা আছে যা মূলত খারাপ ধারণা হলেও বৈধ প্রকৃতির। এ প্রকারের ধারণা গোনাহের অন্তরভুক্ত হতে পারে না। যেমন ঃ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর চরিত্র ও কাজ–কর্মে কিংবা তার দৈনন্দিন আচার–আচরণ ও চালচলনে এমন সুস্পষ্ট লক্ষণ ফুটে ওঠে যার ভিত্তিতে সে আর ভাল ধারণার যোগ্য থাকে না। বরং তার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণের একাধিক যুক্তিসংগত কারণ বিদ্যমান। এরূপ পরিস্থিতিতে শরীয়াত কখনো এ দাবী করে না যে, সরলতা দেখিয়ে মানুষ তার প্রতি অবশ্যই ভাল ধারণা পোষণ করবে। তবে এ বৈধ খারাপ ধারণা পোষণের চূড়ান্ত সীমা হচ্ছে তার সম্ভাব্য দুষ্কৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নিছক ধারণার ভিত্তিতে আরো অগ্রসর হয়ে তার বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা চালানো ঠিক নয়।

চতুর্থ আরেক প্রকারের ধারণা আছে যা মূলত গোনাহ, সেটি হচ্ছে, বিনা কারণে কারো অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা কিংবা অন্যদের ব্যাপারে মতস্থির করার বেলায় সবসময় খারাপ ধারণার ওপর ভিত্তি করেই শুরু করা কিংবা এমন লোকদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করা যাদের বাহ্যিক অবস্থা তাদের সৎ ও শিষ্ট হওয়ার প্রমাণ দেয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি কোন কথা বা কাজে যদি ভাল ও মন্দের সমান

সম্ভাবনা থাকে কিন্তু খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা যদি তা খারাপ হিসেবেই ধরে নেই তাহলে তা গোনাহের কাজ বলে গণ্য হবে। যেমন ঃ কোন সৎ ও ভদ্র লোক কোন মাহফিল থেকে উঠে যাওয়ার সময় নিজের জুতার পরিবর্তে অন্য কারো জুতা উঠিয়ে নেন আমরা যদি ধরে নেই যে, জুতা চুরি করার উদ্দেশ্যেই তিনি এ কাজ করেছেন। অথচ এ কাজটি ভুল করেও হতে পারে। কিন্তু ভাল সম্ভাবনার দিকটি বাদ দিয়ে খারাপ সম্ভাবনার দিকটি গ্রহণ করার কারণ খারাপ ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ বিশ্লেষণ থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ধারণা করা কোন নিষিদ্ধ বিষয় নয়। বরং কোন কোন পরিস্থিতিতে তা পছন্দনীয়, কোন কোন পরিস্থিতিতে অপরিহার্য, কোন কোন পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জায়েয কিন্তু ঐ সীমার বাইরে নাজায়েয এবং কোন কোন পরিস্থিতিতে একেবারেই নাজায়েয। তাই একথা বলা হয়নি যে, ধারণা বা খারাপ ধারণা করা থেকে একদম বিরত থাকো। বরং বলা হয়েছে, অধিকমাত্রায় ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। তাছাড়া নির্দেশটির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করার জন্য আরো বলা হয়েছে, কোন কোন ধারণা গোনাহ। এ সতর্কীকরণ দ্বারা আপনা থেকেই বুঝা যায় যে, যখনই কোন ব্যক্তি ধারণার ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে কিংবা কোন পদক্ষেপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তখন তার ভালভাবে যাচাই বাছাই করে দেখা দরকার, যে ধারণা সে পোষণ করছে তা গোনাহর অন্তরভুক্ত নয় তো? আসলেই কি এরূপ ধারণা পোষণের দরকার আছে? এরূপ ধারণা পোষণের জন্য তার কাছে যুক্তিসংগত কারণ আছে কি? সে ধারণার ভিত্তিতে সে যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করছে তা কি বৈধ? যেসব ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এতটুকু সাবধানতা তারা অবশ্যই অবলম্বন করবে। লাগামহীন ধারণা পোষণ কেবল তাদেরই কাজ যারা আল্লাহর ভয় থেকে মুক্ত এবং আখেরাতের জবাবদিহি সম্পর্কে উদাসীন।

২৫. অর্থাৎ মানুষের গোপন বিষয় তালাশ করো না। একজন আরেকজনের দোষ খুঁজে বেড়িও না। অন্যদের অবস্থা ও ব্যাপার স্যাপার অনুসন্ধান করে বেড়াবে না। খারাপ ধারণার বশবর্তী হয়ে এ আচরণ করা হোক কিংবা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য করা হোক অথবা শুধু নিজের কৌতুহল ও ঔৎসুক্য নিবারণের জন্য করা হোক শরীয়াতের দৃষ্টিতে সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। অন্যদের যেসব বিষয় লোকচক্ষুর অন্তরালে আছে তা খোঁজাখুজি করা এবং কার কি দোষ-ত্রুটি আছে ও কার কি কি দুর্বলতা গোপন আছে পর্দার অন্তরালে উঁকি দিয়ে তা জানার চেষ্টা করা কোন মু'মিনের কাজ নয়। মানুষের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র পড়া, দু'জনের কথোপকথন কান পেতে শোনা, প্রতিবেশীর ঘরে উঁকি দেয়া এবং বিভিন্ন পন্থায় অন্যদের পারিবারিক জীবন কিংবা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদি খোঁজ করে বেড়ানো একটা বড় অনৈতিক কাজ। এর দ্বারা নানা রকম ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এ কারণে একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খোতবায় দোষ অন্বেষণকারীদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين فانه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه فى بيته (ابو داؤد)

"হে সেই সব লোকজন, যারা মুখে ঈমান এনেছো কিন্তু এখনো ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি, তোমরা মুসলমানদের গোপনীয় বিষয় খুঁজে বেড়িও না। যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি তালাশ করে বেড়াবে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটির অন্বেষণে লেগে যাবেন। আর আল্লাহ যার ত্রুটি তালাশ করেন তাকে তার ঘরের মধ্যে লাঞ্ছিত করে ছাড়েন।" (আবু দাউদ)

হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন : আমি নিজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি :

انك ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او كدت ان تفسد هم

"তুমি যদি মানুষের গোপনীয় বিষয় জানার জন্য পেছনে লাগো। তাদের জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করবে কিংবা অন্তত বিপর্যয়ের দ্বার প্রান্তে পৌছে দেবে।" (আবু দাউদ)

অপর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اذا ظننتم فلا تحققوا (احكام القران - للجصاص)

"তোমাদের মনে কারো সম্পর্কে সন্দেহ হলে, অন্বেষণ করো না।"
(আহকামুল কুরআন -জাস্‌সাস)

অপর একটি হাদীসে নবী (সা) বলেছেন :

من رائى عورة فسترها كان كمن احيا موؤدة (الجصاص)

"কেউ যদি কারো গোপন দোষ-ত্রুটি দেখে ফেলে এবং তা গোপন রাখে তাহলে সে যেন একজন জীবন্ত পুঁতে ফেলা মেয়ে সন্তানকে জীবন দান করলো।" (আল জাস্‌সাস)

দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান না করার এ নির্দেশ শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, বরং ইসলামী সরকারের জন্যেও। ইসলামী শরীয়াত নাহী আনিল মুনকারের (মন্দ কাজের প্রতিরোধ) যে দায়িত্ব সরকারের ওপর ন্যস্ত করেছে তার দাবী এ নয় যে, সে একটি গোয়েন্দা চক্র কায়েম করে মানুষের গোপন দোষ-ত্রুটিসমূহ খুঁজে খুঁজে বের করবে এবং তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবে। বরং যেসব অসৎ প্রবণতা ও দোষ-ত্রুটি প্রকাশ হয়ে পড়বে কেবল তার বিরুদ্ধেই তার শক্তি প্রয়োগ করা উচিত। গোপনীয় দোষ-ত্রুটি ও খারাপ চালচলন সংশোধনের উপায় গোয়েন্দাগিরি নয়। বরং শিক্ষা, ওয়াজ-নসীহত, জনসাধারণের সামগ্রিক প্রশিক্ষণ এবং একটি পবিত্র সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করাই তার একমাত্র উপায়। এ ক্ষেত্রে হযরত উমরের (রা) এ ঘটনা অতীব শিক্ষাপ্রদ। একবার রাতের বেলা তিনি এক ব্যক্তির কণ্ঠ শুনতে পেলেন। সে গান গাইতেছিল। তাঁর সন্দেহ হলো। তিনি প্রাচীরে উঠে দেখলেন, সেখানে শরাব প্রস্তুত, তার সাথে এক নারীও। তিনি চিৎকার করে বললেন : ওরে আল্লাহর দুশমন, তুই কি মনে করেছিস যে, তুই আল্লাহর নাফরমানী করবি আর তিনি তোর গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করবেন না? জবাবে সে বললো : আমীরুল মু'মেনীন, তাড়াহুড়ো করবেন না। আমি যদি একটি গোনাহ করে থাকি তবে আপনি তিনটি গোনাহ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আপনি দোষ-ত্রুটি খুঁজেছেন। আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন, দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো। কিন্তু আপনি প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছেন। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন,

নিজের ঘর ছাড়া অনুমতি না নিয়ে অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না। কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়াই আপনি আমার ঘরে পদার্পণ করেছেন।" এ জবাব শুনে হযরত উমর (রা) নিজের ভুল স্বীকার করলেন এবং তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করলেন না। তবে তিনি তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, সে কল্যাণ ও সুকৃতির পথ অনুসরণ করবে। (মাকারিমুল আখলাক—আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর আল খারায়েতী) এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, খুঁজে খুঁজে মানুষের গোপন দোষ–ত্রুটি বের করা এবং তারপর তাদেরকে পাকড়াও করা শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, ইসলামী সরকারের জন্যও জায়েয নয়। একটি হাদীসেও একথা উল্লেখিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ

ان الامير اذا بتغى الريبة فى الناس افسدهم (ابو داؤد)

"শাসকরা যখন সন্দেহের বশে মানুষের দোষ অনুসন্ধান করতে শুরু করে তখন তাদের চরিত্র নষ্ট করে দেয়।" (আবু দাউদ)

তবে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি খোঁজ–খবর নেয়া ও অনুসন্ধান করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তবে সেটা এ নির্দেশের আওতাভুক্ত নয়। যেমন ঃ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচার–আচরণে বিদ্রোহের কিছুটা লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে তারা কোন অপরাধ সংঘটিত করতে যাচ্ছে বলে আশংকা সৃষ্টি হলে সরকার তাদের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে পারে। অথবা কোন ব্যক্তিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয় বা তার সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন করতে চায় তাহলে তার ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্য সে তার সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে ও খোঁজ–খবর নিতে পারে।

২৬. গীবতের সংজ্ঞা হচ্ছে, "কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কারো এমন কথা বলা যা শুনলে সে অপছন্দ করবে।" খোদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে গীবতের এ সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী এবং আরো অনেক হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ঐ হাদীসে নবী (সা) গীবতের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে ঃ

ذكرك اخاك بما يكره – قيل افرأيت ان كان فى اخى ما اقول ؟

قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته –

"গীবত হচ্ছে, তুমি এমনভাবে তোমার ভাইয়ের কথা বললে যা তার কাছে অপছন্দনীয়। প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সত্যিই থেকে থাকে তাহলে আপনার মত কি? তিনি বললেন ঃ তুমি যা বলছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তো তুমি তার গীবত করলে। আর তা যদি না থাকে তাহলে অপবাদ আরোপ করলে।"

ইমাম মালেক (র) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে হযরত মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ থেকে এ বিষয়ে আর একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যার ভাষা নিম্নরূপ ঃ

ان رجلا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة ؟ فقال

ان تذكر من المرء ما يكره ان يسمع - فقال يارسول الله وان كان حقا ؟ قال اذا قلت باطلا فذلك البهتان -

"এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, গীবত কাকে বলে ? তিনি বললেন ঃ কারো সম্পর্কে তোমার এমন কথা বলা যা তার পছন্দ নয়। সে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল, যদি আমার কথা সত্য হয়? তিনি জবাব দিলেন ঃ তোমার কথা মিথ্যা হলে তো সেটা অপবাদ।"

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব বাণী থেকে প্রমাণিত হয় যে, কারো বিরুদ্ধে তার অনুপস্থিতিতে মিথ্যা অভিযোগ করাই অপবাদ। আর তার সত্যিকার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত। এ কাজ স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে করা হোক বা ইশারা ইংগিতের মাধ্যমে করা হোক সর্বাবস্থায় হারাম। অনুরূপভাবে এ কাজ ব্যক্তির জীবদ্দশায় করা হোক বা মৃত্যুর পরে করা হোক উভয় অবস্থায় তা সমানভাবে হারাম। আবু দাউদের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মায়েয ইবনে মালেক আসলামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অপরাধে 'রজম' করার শাস্তি কার্যকর করার পর নবী (সা) পথে চলতে চলতে শুনলেন এক ব্যক্তি তার সংগীকে বলছে ঃ এ লোকটার ব্যাপারটাই দেখো, আল্লাহ তার অপরাধ আড়াল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ না তাকে কুকুরের মত হত্যা করা হয়েছে ততক্ষণ তার প্রবৃত্তি তার পিছু ছাড়েনি। সামনে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটি গাধার গলিত মৃতদেহ দৃষ্টিগোচর হলো। নবী (সা) সেখানে থেমে গেলেন এবং ঐ দু' ব্যক্তিকে ডেকে বললেন ঃ "তোমরা দু'জন ওখানে গিয়ে গাধার ঐ গলিত মৃত দেহটা আহার করো।" তারা দু'জনে বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল, কেউ কি তা খেতে পারে? নবী (সা) বললেন ঃ

فما قلتما من عرض اخيكما انفا اشد من اكل منه

"তোমরা এইমাত্র তোমাদের ভাইয়ের সম্মান ও মর্যাদার ওপর যেভাবে আক্রমণ চালাচ্ছিলে তা গাধার এ মৃতদেহ খাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী নোংরা কাজ।"

যেসব ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে বা তার মৃত্যুর পর তার মন্দ দিকগুলো বর্ণনা করার এমন কোন প্রয়োজন দেখা দেয় যা শরীয়াতের দৃষ্টিতে সঠিক এবং গীবত ছাড়া ঐ প্রয়োজন পূরণ হতে পারে না, আর ঐ প্রয়োজন পূরণের জন্য গীবত না করা হলে তার চেয়েও অধিক মন্দ কাজ অপরিহার্য হয়ে পড়ে এমন ক্ষেত্রসমূহ গীবত হারাম হওয়া সম্পর্কিত নির্দেশের অন্তরভুক্ত নয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যতিক্রমকে মূলনীতি হিসেবে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

ان من اربى الربا الاستطالة فى عرض المسلم بغير حق

(ابو داؤد)

"কোন মুসলমানের মান-মর্যাদার ওপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ করা জঘন্যতম জুলুম।"

এ বাণীতে "অন্যায়ভাবে" কথাটি বলে শর্তযুক্ত করাতে বুঝা যায় যে, ন্যায়ভাবে এরূপ করা জায়েয। নবীর (সা) নিজের কর্মপদ্ধতির মধ্যে এমন কয়েকটি নজীর দেখতে পাই যা

থেকে জানা যায় ন্যায়ভাবে বলতে কি বুঝানো হয়েছে এবং কি রকম পরিস্থিতিতে প্রয়োজনে গীবত করা জায়েয হতে পারে।

একবার এক বেদুঈন এসে নবীর (সা) পিছনে নামাযে শামিল হলো এবং নামায শেষ হওয়া মাত্রই একথা বলে প্রস্থান করলো যে, হে আল্লাহ! আমার ওপর রহম করো এবং মুহাম্মাদের ওপর রহম করো। আমাদের দু'জন ছাড়া আর কাউকে এ রহমতের মধ্যে শরীক করো না। নবী (সা) সাহাবীদের বললেন ঃ

اتقولون هو اضل ام بعيره ؟ الم تسمعوا الى ما قال

"তোমরা কি বলো, এ লোকটাই বেশী বেকুফ, না তার উট? তোমরা কি শুননি সে কি বলছিলো?" (আবু দাউদ)

নবীকে (সা) তার অনুপস্থিতিতেই একথা বলতে হয়েছে। কারণ সালাম ফেরানো মাত্রই সে চলে গিয়েছিল। নবীর উপস্থিতিতেই সে একটি ভুল কথা বলে ফেলেছিল। তাই এ ব্যাপারে তাঁর নিশ্চুপ থাকা কাউকে এ ভ্রান্তিতে ফেলতে পারতো যে, সময় বিশেষে এরূপ কথা বলা হয় তো জায়েয। তাই নবী (সা) কর্তৃক একথার প্রতিবাদ করা জরুরী হয়ে পড়েছিলো।

ফাতেমা বিনতে কায়েস নামক এক মহিলাকে দু' ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব দেন। একজন হযরত মুয়াবিয়া (রা) অপরজন আবুল জাহম (রা)। ফাতেমা বিনতে কায়েস নবীর (সা) কাছে এসে পরামর্শ চাইলে তিনি বললেন ঃ মুয়াবিয়া গরীব আর আবুল জাহম স্ত্রীদের বেদম প্রহার করে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম) এখানে একজন নারীর ভবিষ্যত জীবনের প্রশ্ন জড়িত ছিল। সে নবীর (সা) কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চেয়েছিল। এমতাবস্থায় উভয় ব্যক্তির যে দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি তাঁর জানা ছিল তা তাকে জানিয়ে দেয়া তিনি জরুরী মনে করলেন।

একদিন নবী (সা) হযরত আয়েশার (রা) ঘরে ছিলেন। এক ব্যক্তি এসে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি তার গোত্রের অত্যন্ত খারাপ লোক। এরপর তিনি বাইরে গেলেন এবং তার সাথে অত্যন্ত সৌজন্যের সাথে কথাবার্তা বললেন। নবী (সা) ঘরে ফিরে আসলে হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ আপনি তো তার সাথে ভালোভাবে কথাবার্তা বললেন। অথচ যাওয়ার সময় আপনি তার সম্পর্কে ঐ কথা বলেছিলেন। জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ

ان شر الناس منزلة عندَ اللّه يوم القيامة من ودعه (روتركه) النَّاسُ اتقاء فحشه –

"যে ব্যক্তির কটু বাক্যের ভয়ে লোকজন তার সাথে উঠাবসা পরিত্যাগ করে কিয়ামতের দিন সে হবে আল্লাহ তা'আলার কাছে জঘন্যতম ব্যক্তি।" (বুখারী ও মুসলিম)

এ ঘটনা সম্পর্কে যদি চিন্তা করেন তাহলে বুঝতে পারবেন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা সত্ত্বেও নবী (সা) তার সাথে সুন্দরভাবে কথাবার্তা বলেছেন এ জন্য যে, নবীর (সা) উত্তম স্বভাব এটিই দাবী করে। কিন্তু সাথে সাথে তিনি আশংকা করলেন ঃ

লোকটির সাথে তাঁকে দয়া ও সৌজন্য প্রকাশ করতে দেখে তার পরিবারের লোকজন তাকে তাঁর বন্ধু বলে মনে করে বসতে পারে। তাহলে পরে কোন সময় সে এর সুযোগ নিয়ে কোন অবৈধ সুবিধা অর্জন করতে পারে। তাই তিনি হযরত আয়েশাকে সতর্ক করে দিলেন যে, সে তার গোত্রের জঘন্যতম মানুষ।

এক সময় হযরত আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা এসে নবীকে (সা) বললো, "আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ লোক। আমার ও আমার সন্তানের প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হতে পারে এমন অর্থকড়ি সে দেয় না।" (বুখারী ও মুসলিম) স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর এ ধরনের অভিযোগ যদিও গীবতের পর্যায়ে পড়ে কিন্তু নবী (সা) তা বৈধ করে দিয়েছেন। কারণ জুলুমের প্রতিকার করতে পারে এমন ব্যক্তির কাছে জুলুমের অভিযোগ নিয়ে যাওয়ার অধিকার মজলুমের আছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের এসব দৃষ্টান্তের আলোকে ফকীহ ও হাদীস বিশারদগণ এ বিধি প্রণয়ন করেছেন যে, গীবত কেবল তখনই বৈধ যখন একটি সংগত (অর্থাৎ শরীয়াতের দৃষ্টিতে সংগত) কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার প্রয়োজন পড়ে এবং ঐ প্রয়োজন গীবত ছাড়া পূরণ হতে পারে না। সুতরাং এ বিধির ওপর ভিত্তি করে আলেমগণ নিম্নরূপ গীবতকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছেন ঃ

এক ঃ যে ব্যক্তি জুলুমের প্রতিকারের জন্য কিছু করতে পারে বলে আশা করা যায় এমন ব্যক্তির কাছে জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের ফরিয়াদ।

দুই ঃ সংশোধনের উদ্দেশ্যে এমন ব্যক্তিদের কাছে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অপকর্মের কথা বলা যারা তার প্রতিকার করতে পারবেন বলে আশা করা যায়।

তিন ঃ ফতোয়া চাওয়ার উদ্দেশ্যে কোন মুফতির কাছে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনার সময় যদি কোন ব্যক্তির ভ্রান্ত কাজ-কর্মের উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়।

চার ঃ মানুষকে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অপকর্মের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য সাবধান করে দেয়া। যেমন ঃ হাদীস বর্ণনাকারী, সাক্ষী এবং গ্রন্থ প্রণেতাদের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করা সর্বসম্মত মতে শুধু জায়েযই নয়, বরং ওয়াজিব। কেননা, এ ছাড়া শরীয়াতকে ভুল রেওয়ায়াতের প্রচারণা ও বিস্তার থেকে, আদালতসমূহকে বেইনসাফী থেকে এবং জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদেরকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। অথবা উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোন ব্যক্তি কারো সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী কিংবা কারো বাড়ীর পাশে বাড়ী খরিদ করতে চায় অথবা কারো সাথে অংশীদারী কারবার করতে চায় অথবা কারো কাছে আমানত রাখতে চায় সে আপনার কাছে পরামর্শ চাইলে তাকে সে ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে অবহিত করা আপনার জন্য ওয়াজিব যাতে না জানার কারণে সে প্রতারিত না হয়।

পাঁচ ঃ যেসব লোক গোনাহ ও পাপকার্যের বিস্তার ঘটাচ্ছে অথবা বিদআত ও গোমরাহীর প্রচার চালাচ্ছে অথবা আল্লাহর বান্দাদেরকে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড ও জুলুম- নির্যাতনের মধ্যে নিক্ষেপ করছে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সোচ্চার হওয়া এবং তাদের দুষ্কর্ম ও অপকীর্তির সমালোচনা করা।

ছয় ঃ যেসব লোক কোন মন্দ নাম বা উপাধিতে এতই বিখ্যাত হয়েছে যে, ঐ নাম ও উপাধি ছাড়া অন্য কোন নাম বা উপাধি দ্বারা তাদেরকে আর চেনা যায় না, তাদের মর্যাদা হানির উদ্দেশ্যে নয়, বরং পরিচয়দানের জন্য ঐ নাম ও উপাধি ব্যবহার করা।

(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ফাতহুল বারী, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬২; শরহে মুসলিম—নববী, বাব ঃ তাহরীমুল গীবাত। রিয়াদুস সালেহীন, বাব ঃ মা ইউবাহ মিনাল গীবাত। আহ্কামুল কুরআন—জাস্সাস। রূহুল মা'আনী—লা ইয়াগতাব বাদুকুম বাদান-আয়াতের তাফসীর)।

এ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রগুলো ছাড়া অসাক্ষাতে কারো নিন্দাবাদ একেবারেই হারাম। এ নিন্দাবাদ সত্য ও বাস্তব ভিত্তিক হলে তা গীবত, মিথ্যা হলে অপবাদ এবং দু'জনের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হলে চোখলখুরী। ইসলামী শরীয়াত এ তিনটি জিনিসকেই হারাম করে দিয়েছে। ইসলামী সমাজে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে যদি তার সামনে অন্য কোন ব্যক্তির ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হতে থাকে তাহলে সে যেন চুপ করে তা না শোনে বরং তার প্রতিবাদ করে। আর যদি কোন বৈধ শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া কারো সত্যিকার দোষ-ত্রুটিও বর্ণনা করা হতে থাকে তাহলে এ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহকে ভয় করতে এবং এ গোনাহ থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিতে হবে।

নবী (সা) বলেছেন ঃ

ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما فى موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه الاخذله الله تعالى فى مواطن يحب فيها نصرته - وما من امرئ ينصر امرأ مسلما فى موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله عزوجل فى مواطن يحب فيها نصرته - (ابو داؤد)

"যদি কোন ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে কোন মুসলমানকে সাহায্য না করে যেখানে তাকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে এবং তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করা হচ্ছে তাহলে আল্লাহ তা'আলাও তাকে সেসব ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন না যেখানে সে তাঁর সাহায্যের প্রত্যাশা করে। আর যদি কোন ব্যক্তি এমন পরিস্থিতিতে কোন মুসলমানকে সাহায্য করে যখন তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করা হচ্ছে এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করা হচ্ছে তাহলে মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে এমন পরিস্থিতিতে সাহায্য করবেন যখন সে আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশী হবে।" (আবু দাউদ)।

গীবতকারী ব্যক্তি যখনই উপলব্ধি করবে যে, সে এ গোনাহ করছে অথবা করে ফেলেছে তখন তার প্রথম কর্তব্য হলো আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং এ হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা। এরপর তার ওপর দ্বিতীয় যে কর্তব্য বর্তায় তা হচ্ছে, যতদূর সম্ভব এ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ⑬

হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দিয়েছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তোমাদের মধ্যে যে অধিক পরহেজগার সে–ই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদার অধিকারী।[২৮] নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সবকিছু সম্পর্কে অবহিত।।[২৯]

গোনাহের ক্ষতিপূরণ করা। সে যদি কোন মৃত ব্যক্তির গীবত করে থাকে তাহলে সে ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য অধিক মাত্রায় দোয়া করবে। যদি কোন জীবিত ব্যক্তির গীবত করে থাকে এবং তা অসত্যও হয় তাহলে যাদের সাক্ষাতে সে এ অপবাদ আরোপ করেছিল তাদের সাক্ষাতেই তা প্রত্যাহার করবে। আর যদি সত্য ও বাস্তব বিষয়ে গীবত করে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে আর কখনো তার নিন্দাবাদ করবে না। তাছাড়া যার নিন্দাবাদ করেছিল তার কাছে মাফ চেয়ে নেবে। একদল আলেমের মতে, যার গীবত করা হয়েছে সে যদি এ বিষয়ে অবহিত হয়ে থাকে, কেবল তখনই ক্ষমা চাওয়া উচিত। অন্যথায় শুধু তাওবা করলেই চলবে। কারণ, যে ব্যক্তির গীবত করা হয়েছে সে যদি এ বিষয়ে অবহিত না থাকে এবং গীবতকারী তার কাছে গিয়ে বলে, আমি তোমার গীবত করেছিলাম তাহলে তা তার জন্য মনোকষ্টের কারণ হবে।

২৭. এ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলা গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করে এ কাজের চরম ঘৃণিত হওয়ার ধারণা দিয়েছেন। মৃতের গোশত খাওয়া এমনিতেই ঘৃণ্য ব্যাপার। সে গোশতও যখন অন্য কোন জন্তুর না হয়ে মানুষের হয়, আর সে মানুষটিও নিজের আপন ভাই হয় তাহলে তো কোন কথাই নেই। তারপর এ উপমাকে প্রশ্নের আকারে পেশ করে আরো অধিক কার্যকর বানিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে নিজেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, সে কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে প্রস্তুত আছে? সে যদি তা খেতে রাজি না হয় এবং তার প্রবৃত্তি এতে ঘৃণাবোধ করে তাহলে সে কিভাবে এ কাজ পছন্দ করতে পারে যে, সে তার কোন মু'মিন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার মান মর্যাদার ওপর হামলা চালাবে যেখানে সে তা প্রতিরোধ করতে পারে না, এমনকি সে জানেও না যে, তাকে বেইজ্জতি করা হচ্ছে। এ আয়াতাংশ থেকে একথাও জানা গেল যে, গীবত হারাম হওয়ার মূল কারণ যার গীবত করা হয়েছে তার মনোকষ্ট নয়। বরং কোন ব্যক্তির অসাক্ষাতে তার নিন্দাবাদ করা আদতেই হারাম, চাই সে এ সম্পর্কে অবহিত হোক বা না হোক কিংবা এ কাজ দ্বারা সে কষ্ট পেয়ে থাক বা না থাক। সবারই জানা কথা, মৃত ব্যক্তির গোশত খাওয়া এ জন্য হারাম নয় যে, তাতে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়। মৃত্যুর পর কে তার লাশ ছিঁড়ে খাবলে খাচ্ছে তা মৃতের জানার কথা নয়। কিন্তু সেটা আদতেই অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। অনুরূপ, যার গীবত

করা হয়েছে, কোনভাবে যদি তার কাছে খবর না পৌছে তাহলে কোথায় কোন্ ব্যক্তি কখন কাদের সামনে তার মান-ইজ্জতের ওপর হামলা করেছিল এবং তার ফলস্বরূপ কার কার দৃষ্টিতে সে নীচ ও হীন সাব্যস্ত হয়েছিল, তা সে সারা জীবনেও জানতে পারবে না। না জানার কারণে এ গীবত দ্বারা সে আদৌ কোন কষ্ট পাবে না। কিন্তু এতে অবশ্যই তার মর্যাদাহানি হবে। তাই ধরন ও প্রকৃতির দিক থেকে কাজটি মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া থেকে ভিন্ন কিছু নয়।

২৮. মুসলিম সমাজকে বিভিন্ন অকল্যাণ ও অনাচার থেকে রক্ষা করার জন্য যেসব পথনির্দেশের প্রয়োজন ছিল পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে ঈমানদারদের উদ্দেশ করে সেসব পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছিলো। এখন এ আয়াতে গোটা মানব জাতিকে উদ্দেশ করে একটি বিরাট গোমরাহীর সংশোধন করা হচ্ছে যা আবহমান কাল ধরে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।

অর্থাৎ বংশ, বর্ণ, ভাষা, দেশ এবং জাতীয়তার গোঁড়ামী ও সংকীর্ণতা। প্রাচীনতম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে মানুষ সাধারণত মানবতাকে উপক্ষো করে তাদের চারপাশে কিছু ছোট ছোট বৃত্ত টেনেছে। এ বৃত্তের মধ্যে জন্মগ্রহণকারীদের সে তার আপন জন এবং বাইরে জন্মগ্রহণকারীদের পর বলে মনে করেছে। কোন যৌক্তিক বা নৈতিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করে এ বৃত্ত টানা হয়নি বরং টানা হয়েছে জন্মের ভিত্তিতে যা একটি অনিচ্ছাকৃত ব্যাপার মাত্র। কোথাও এর ভিত্তি একই খান্দান, গোত্র ও গোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ করা এবং কোথাও একই ভৌগলিক এলাকায় কিংবা এক বিশেষ বর্ণ অথবা একটি বিশেষ ভাষাভাষী জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করা। তাছাড়া এসব ভিত্তির ওপর নির্ভর করে আপন ও পরের বিভেদ রেখা টানা হয়েছে। এ মানদণ্ডে যাদেরকে আপন বলে মনে করা হয়েছে পরদের তুলনায় তাদের কেবল অধিক ভালবাসা বা সহযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এ বিভেদনীতি ঘৃণা, শত্রুতা, তাচ্ছিল্য ও অবমাননা এবং জুলুম ও নির্যাতনের জঘন্যতম রূপ পরিগ্রহ করেছে। এর সমর্থনে দর্শন রচনা করা হয়েছে। মত ও বিশ্বাস আবিষ্কার করা হয়েছে। আইন তৈরী করা হয়েছে। নৈতিক নীতিমালা রচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন জাতি ও রাষ্ট্র এটিকে তাদের স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বিধান হিসেবে গ্রহণ করে বাস্তবে অনুসরণ করেছে। এর ভিত্তিতেই ইহুদীরা নিজেদেরকে আল্লাহর মনোনীত সৃষ্টি বলে মনে করেছে এবং তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধানে পর্যন্ত অইসরাঈলীদের অধিকার ও মর্যাদা ইসরাঈলীদের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ে রেখেছে। এ ভেদনীতিই হিন্দুদের মধ্যে বর্ণাশ্রমের জন্ম দিয়েছে যার ভিত্তিতে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। উচ্চ বর্ণের লোকদের তুলনায় সমস্ত মানুষকে নীচ ও অপবিত্র ঠাওরানো হয়েছে এবং শুদ্রদের চরম লাঞ্ছনার গভীর খাদে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কালো ও সাদার মধ্যে পার্থক্য টেনে আফ্রিকা ও আমেরিকায় কৃষ্ণাংগদের ওপর যে অত্যাচার চালানো হয়েছে তা ইতিহাসের পাতায় অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই বরং আজ এ শতাব্দীতেই প্রতিটি মানুষ তার নিজ চোখে দেখতে পারে। ইউরোপের মানুষ আমেরিকা মহাদেশে প্রবেশ করে রেড ইণ্ডিয়ান জাতি গোষ্ঠীর সাথে যে আচরণ করেছে এবং এশিয়া ও আফ্রিকার দুর্বল জাতিসমূহের ওপর আধিপত্য কায়েম করে তাদের সাথে যে ব্যবহার করেছে তার গভীরেও এ ধ্যান-ধারণাই কার্যকর ছিল যে, নিজের দেশ ও জাতির গণ্ডির বাইরে জন্মগ্রহণকারীদের জান-মাল ও

সম্ভ্রম নষ্ট করা তাদের জন্য বৈধ। তাদেরকে লুট করা, ক্রীতদাস বানানো এবং প্রয়োজনে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার অধিকার তাদের আছে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের জাতিপূজা এক জাতিকে অন্যান্য জাতিসমূহের জন্য যেভাবে পশুতে পরিণত করেছে তার জঘন্যতম দৃষ্টান্ত নিকট অতীতে সংঘটিত যুদ্ধসমূহেই দেখা গিয়েছে এবং আজও দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে নাৎসী জার্মানদের গোষ্ঠী দর্শন ও নরডিক প্রজাতির শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বিগত মহাযুদ্ধে যে ভয়াবহ ফল দেখিয়েছে তা স্মরণ রাখলে যে কোন ব্যক্তি অতি সহজেই অনুমান করতে পারবে যে, তা কত বড় এবং ধ্বংসাত্মক গোমরাহী। এ গোমরাহীর সংশোধনের জন্যই কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

এ ছোট্ট আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক সত্য বর্ণনা করেছেন ঃ

এক ঃ তোমাদের সবার মূল উৎস এক। একমাত্র পুরুষ এবং একমাত্র নারী থেকে তোমাদের গোটা জাতি অস্তিত্ব লাভ করেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে তোমাদের যত বংশধারা দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে তা একটি মাত্র প্রাথমিক বংশধারার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা যা একজন মা ও একজন বাপ থেকে শুরু হয়েছিল। এ সৃষ্টি ধারার মধ্যে কোথাও এ বিভেদ এবং উচ্চ নীচের কোন ভিত্তি বর্তমান নেই। অথচ তোমরা এ ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত আছো। একই আল্লাহ তোমাদের স্রষ্টা। এমন নয় যে, বিভিন্ন মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন খোদা সৃষ্টি করেছেন। একই সৃষ্টি উপকরণ দ্বারা তোমরা সৃষ্টি হয়েছো। এমন নয় যে, কিছু সংখ্যক মানুষ কোন পবিত্র বা মূল্যবান উপাদানে সৃষ্টি হয়েছে এবং অপর কিছু সংখ্যক কোন অপবিত্র বা নিকৃষ্ট উপাদানে সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। একই নিয়মে তোমরা জন্মলাভ করেছো। এমনও নয় যে, বিভিন্ন মানুষের জন্মলাভের নিয়ম-পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। তাছাড়া তোমরা একই পিতা-মাতার সন্তান। এমনটিও নয় যে, সৃষ্টির প্রথম দিককার মানব দম্পতির সংখ্যা ছিল অনেক এবং তাদের থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ আলাদা আলাদা জন্মলাভ করেছে।

দুই ঃ মূল উৎসের দিক দিয়ে এক হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত হওয়া ছিল একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। একথা স্পষ্ট যে, সমগ্র বিশ্বে গোটা মানব সমাজের একটি মাত্র বংশধারা আদৌ হতে পারতো না। বংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন খান্দান ও বংশধারার সৃষ্টি হওয়া এবং তারপর খান্দানের সমন্বয়ে গোত্র ও জাতিসমূহের পত্তন হওয়া অপরিহার্য ছিল। অনুরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপনের পর বর্ণ, দেহাকৃতি, ভাষা এবং জীবন যাপন রীতিও অবশ্যম্ভাবীরূপে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা। একই ভূখণ্ডের বসবাসকারীরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ এবং দূর-দূরান্তের ভূখণ্ডে বসবাসকারীদের মধ্যে পরস্পর ব্যবধান সৃষ্টি হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃতিগত এ পার্থক্য ও ভিন্নতার দাবী এ নয় যে, এর ভিত্তিতে উচ্চ ও নীচ, ইতর ও ভদ্র এবং শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট হওয়ার ভেদাভেদ সৃষ্টি করা হবে, একটি বংশধারা আরেকটি বংশধারার ওপর কৌলিণ্যের দাবী করবে, এক বর্ণের লোক অন্য বর্ণের লোকদের হেয় ও নীচ মনে করবে, এক জাতি অন্য জাতির ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য কায়েম করবে এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে এক জাতি অন্য জাতির ওপর অগ্রাধিকার লাভ করবে। যে কারণে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মানব গোষ্ঠীসমূহকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের আকারে বিন্যস্ত

করেছিলেন তা হচ্ছে, তাদের মধ্যে পারস্পরিক জানা শোনা ও সহযোগিতার জন্য এটাই ছিল স্বাভাবিক উপায়। এ পদ্ধতিতে একটি পরিবার, একটি প্রজাতি, একটি গোত্র এবং একটি জাতির লোক মিলে একটি সম্মিলিত সমাজ গড়তে এবং জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে একে অপরের সাহায্যকারী হতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট প্রকৃতি যে জিনিসকে পারস্পরিক পরিচয়ের উপায় বানিয়েছিল শুধু শয়তানী মূঢ়তা ও মূর্খতা সে জিনিসকে গর্ব ও ঘৃণার উপকরণ বানিয়ে নিয়েছে এবং বিষয়টিকে অত্যাচার ও সীমালংঘনের পর্যায় পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছে।

তিন ঃ মানুষের মধ্যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের বুনিয়াদ যদি কিছু থেকে থাকে এবং হতে পারে তাহলে তা হচ্ছে নৈতিক মর্যাদা। জন্মগতভাবে সমস্ত মানুষ সমান। কেননা, তাদের সৃষ্টিকর্তা এক, তাদের সৃষ্টির উপাদান ও সৃষ্টির নিয়ম-পদ্ধতিও এক এবং তাদের সবার বংশধারা একই পিতা-মাতা পর্যন্ত গিয়ে পৌছে। তাছাড়া কোন ব্যক্তির কোন বিশেষ দেশ, জাতি অথবা জাতি-গোষ্ঠীতে জন্মলাভ করা একটি কাকতালীয় ব্যাপার মাত্র। এতে তার ইচ্ছা, পছন্দ বা চেষ্টা-সাধনার কোন দখল নেই। এদিক দিয়ে কোন ব্যক্তির অন্য কোন ব্যক্তির ওপর মর্যাদালাভের কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। যে মূল জিনিসের ভিত্তিতে এক ব্যক্তি অপর সব ব্যক্তিদের ওপর মর্যাদা লাভ করতে পারে তা হচ্ছে, সে অন্য সবার তুলনায় অধিক আল্লাহ ভীরু মন্দ ও অকল্যাণ থেকে দূরে অবস্থানকারী এবং নেকী ও পবিত্রতার পথ অনুগমনকারী। এরূপ ব্যক্তি যে কোন বংশ, যে কোন জাতি এবং যে কোন দেশেরই হোক না কেন সে তার ব্যক্তিগত গুণাবলীর কারণে সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। যার অবস্থা এর বিপরীত সর্বাবস্থাই সে একজন নিকৃষ্টতর মানুষ। সে কৃষ্ণাঙ্গ হোক বা শ্বেতাঙ্গ হোক এবং প্রাচ্যে জন্মলাভ করে থাকুক বা পাশ্চাত্যে তাতে কিছু এসে যায় না।

এ সত্য কথাগুলোই যা কুরআনের একটি ছোট্ট আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে—রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও উক্তিতে আরো স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। মক্কা বিজয়ের সময় কা'বার তাওয়াফের পর তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তাতে বলেছিলেন ঃ

الحمد لله الذى اذهب عنكم عيبة الجاهلية وتكبرها - يا ايها الناس ، الناس رجلان ، برتقى كريم على الله ، وفاجر شقى هين على الله - الناس كلهم بنو ادم وخَلَقَ اللّهُ ادم من تراب -

(بيهقى فى شعب الايمان - ترمذى)

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের দোষ-ত্রুটি ও অহংকার দূর করে দিয়েছেন। হে লোকেরা! সমস্ত মানুষ দু' ভাগে বিভক্ত। এক, নেক্কার ও পরহেজগার—যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মর্যাদার অধিকারী। দুই, পাপী ও দুরাচার যারা আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট। অন্যথায় সমস্ত মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটির সৃষ্টি।" (বায়হাকী—ফী শুআবিল ঈমান, তিরমিযী)

বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে নবী (সা) বক্তৃতা করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন ঃ

يا ايها الناس ، الا ان ربكم واحد – لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لاسود على احمر ولا لاحمر على اسود الا بالتقوى ، ان اكرمكم عند الله اتقكم – الا هل بَلَّغتُ ؟ قالوا بلى يا رسول الله ، قال فليبلغ الشَّاهد الغائب (بيهقى)

"হে লোকজন ! সাবধান ! তোমাদের আল্লাহ একজন। কোন অনারবের ওপর কোন আরবের ও কোন আরবের ওপর কোন অনারবের কোন কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের ও কোন শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই আল্লাহভীতি ছাড়া। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু সেই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাবান। বলো, আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌছিয়ে দিয়েছি? সবাই বললো ঃ হে আল্লাহর রসূল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে যারা এখানে উপস্থিত আছে তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এ বাণী পৌছিয়ে দেয়।" (বায়হাকী)

একটি হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ

كلكم بنو ادم وادم خلق من تراب ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم او ليكونن اهون على الله من الجعلان – (بزار)

"তোমরা সবাই আদমের সন্তান। আর আদমকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল। লোকজন তাদের বাপদাদার নাম নিয়ে গর্ব করা থেকে বিরত হোক। তা না হলে আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা নগণ্য কীট থেকেও নীচ বলে গণ্য হবে।" (বাযযার)

আর একটি হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ

ان الله لا يسئلكم عن احسابكم ولا عن انسابكم يوم القيامة ان اكرمكم عند الله اتقكم – (ابن جرير)

"আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের বংশ ও আভিজাত্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন না। তোমাদের মধ্যে যে বেশী আল্লাহভীরু সে-ই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী।" (ইবনে জারীর)

আরো একটি হাদীসের ভাষা হচ্ছে ঃ

ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم (مسلم ، ابن ماجه)

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারা–আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজ–কর্ম দেখেন।" (মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

এসব শিক্ষা কেবল কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং সে শিক্ষা অনুসারে ইসলাম ঈমানদারদের একটি বিশ্বভ্রাতৃত্ব বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়ে দিয়েছে। যেখানে বর্ণ, বংশ, ভাষা, দেশ ও জাতীয়তার কোন ভেদাভেদ নেই, যেখানে উচ্চ নীচ, ছুত–ছাত এবং বিভেদ ও পক্ষপাতিত্বের কোন স্থান নেই, এবং যে কোন জাতি, গোষ্ঠী ও দেশেরই হোক না কেন সেখানে সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণ সমান অধিকার নিয়ে শরীক হতে পারে এবং হয়েছে। ইসলামের বিরোধীদেরও একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, মানবিক সাম্য ও ঐক্যের নীতিমালাকে মুসলিম সমাজে যেভাবে সফলতার সাথে বাস্তব রূপদান করা হয়েছে বিশ্বের আর কোন ধর্ম ও আদর্শে কখনো তার কোন নজির পরিলক্ষিত হয়নি। একমাত্র ইসলাম সেই আদর্শ যা বিশ্বের সমগ্র অঞ্চলে ও আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য জাতিগোষ্ঠীকে মিলিয়ে একটি জাতি বানিয়ে দিয়েছে।

এ পর্যায়ে একটি ভ্রান্ত ধারণা দূর করাও অত্যন্ত জরুরী। বিয়ে–শাদীর ব্যাপারে ইসলামী আইন 'কুফু' বা 'সমবংশ' হওয়ার প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করে, কিছু লোক তার অর্থ গ্রহণ করে এই যে, কিছুসংখ্যক জাতি গোষ্ঠী আছে কুলীন ও অভিজাত এবং কিছু সংখ্যক ইতর ও নীচ। তাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক আপত্তিজনক। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। ইসলামী আইন অনুসারে প্রত্যেক মুসলমান পুরুষের প্রত্যেক মুসলমান নারীর সাথে বিয়ে হতে পারে। তবে দাম্পত্য জীবনের সফলতা স্বামী–স্ত্রীর অভ্যাস, আচার–আচরণ, জীবন যাপন পদ্ধতি, পারিবারিক ও বংশগত ঐতিহ্য এবং আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার ওপর নির্ভর করে যাতে তারা পরস্পরের সাথে ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। 'কুফু' বা সমবংশ হওয়ার মূল লক্ষ্য এটাই। যেখানে পুরুষ ও নারীর মধ্যে এদিক দিয়ে অনেক বেশী দূরত্ব হবে সেখানে জীবনব্যাপী বিস্তৃত বন্ধুত্বের সম্পর্ক বনিবনার আশা কমই করা যায়। তাই ইসলামী আইন এ রকম দাম্পত্য বন্ধনকে পছন্দ করে না। এখানে আশরাফ ও আতরাফের কোন প্রশ্ন নেই। বরং উভয়ের অবস্থার মধ্যে যদি স্পষ্ট পার্থক্য ও ভিন্নতা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে দাম্পত্য জীবন ব্যর্থ হওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে।

২৯. অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে কে গুণাবলীর দিক দিয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ আর কে নীচু মর্যাদার মানুষ তা আল্লাহই ভাল জানেন। মানুষ নিজেরা নিজেদের উচ্চ নীচের যে মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। হতে পারে দুনিয়াতে যাকে অনেক উচ্চ মর্যাদার মানুষ মনে করা হতো আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালায় সে অতি নীচুস্তরের মানুষ হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং যাকে এখানে অতি নগণ্য মনে করা হয়েছে সেখানে সে অনেক উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। আসল গুরুত্ব দুনিয়ার সম্মান ও লাঞ্ছনার নয়, বরং কেউ আল্লাহর কাছে যে সম্মান ও লাঞ্ছনা লাভ করবে তার। তাই যেসব গুণাবলী আল্লাহর কাছে মর্যাদা লাভের উপযুক্ত বানাতে পারে নিজের মধ্যে সেসব বাস্তব গুণাবলী সৃষ্টির জন্য মানুষের সমস্ত চিন্তা নিয়োজিত হওয়া উচিত।

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۴﴾ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ﴿۱۵﴾

এ বেদুইনরা বলে, "আমরা ঈমান এনেছি"[৩০] তাদের বলে দাও তোমরা ঈমান আন নাই। বরং বল, আমরা অনুগত হয়েছি।[৩১] ঈমান এখনো তোমাদের মনে প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের পথ অনুসরণ করো তাহলে তিনি তোমাদের কার্যাবলীর পুরস্কার দানে কোন কার্পণ্য করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। প্রকৃত ঈমানদার তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান এনেছে এবং এ ব্যাপারে পরে আর কোন সন্দেহ পোষণ করেনি। তারপর প্রাণ ও অর্থ-সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারাই সত্যবাদী।

৩০. এর অর্থ সমস্ত বেদুঈন নয়। বরং এখানে কতিপয় বিশেষ বেদুঈন গোষ্ঠীর উল্লেখ করা হচ্ছে যারা ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে এই ভেবে মুসলমান হয়ে যায় যে, মুসলমানদের আঘাত থেকেও নিরাপদ থাকবে এবং ইসলামী বিজয় থেকে সুবিধাও ভোগ করবে। এসব লোক প্রকৃতপক্ষে সরল মনে ঈমান গ্রহণ করেছিল না। শুধু ঈমানের মৌখিক অঙ্গীকার করে তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে নিজেদেরকে মুসলমানদের অন্তরভুক্ত করে নিয়েছিল। তাদের এ গোপন মানসিক অবস্থা তখনই ফাঁস হয়ে যেতো যখন তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে নানা রকমের দাবী-দাওয়া পেশ করতো এবং এমনভাবে নিজেদের অধিকার ফলাতো যে, ইসলাম গ্রহণ করে তারা যেন রসূলের (সা) মস্তবড় উপকার সাধন করেছে। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে কয়েকটি গোষ্ঠীর এ আচরণের উল্লেখ আছে। যেমন ঃ মুযাইনা, জুহাইনা, আসলাম, আশজা', গিফার ইত্যাদি গোত্রসমূহ। বিশেষ করে বনী আসাদ ইবনে খুযায়মা গোত্র সম্পর্কে ইবনে আব্বাস এবং সাঈদ ইবনে জুবায়ের বর্ণনা করেছেন যে, একবার দুর্ভিক্ষের সময় তারা মদীনায় এসে আর্থিক সাহায্য দাবী করে বারবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে লাগলো ঃ আমরা যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই মুসলমান হয়েছি, অমুক ও অমুক গোত্র যেমন যুদ্ধ করেছে আমরা আপনার বিরুদ্ধে তেমন যুদ্ধ করিনি। একথা বলার পেছনে তাদের পরিষ্কার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা এবং ইসলাম গ্রহণ করা যেন তাদের একটি বড় দান। তাই রসূল ও ঈমানদারদের কাছে এর বিনিময় তাদের

পাওয়া উচিত। মদীনার আশেপাশের বেদুঈন গোষ্ঠীসমূহের এ আচরণ ও কর্মনীতি সম্পর্কে এ আয়াতগুলোতে সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ সমালোচনা ও পর্যালোচনার সাথে সূরা তাওবার ৯০ থেকে ১১০ আয়াত এবং সূরা ফাত্হের ১১ থেকে ১৭ আয়াত মিলিয়ে পড়লে এ বিষয়টি আরো ভালভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে।

৩১. মূল আয়াতে قُوْلُوْا أَسْلَمْنَا কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর আরেকটি অনুবাদ হতে পারে, "বলো, আমরা মুসলমান হয়ে গিয়েছি" এ আয়াতাংশ থেকে কোন কোন লোক এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, কুরআন মজীদের ভাষায় 'মু'মিন' ও 'মুসলিম' দু'টি বিপরীত অর্থ জ্ঞাপক পরিভাষা। মু'মিন সে ব্যক্তি যে সরল মনে ঈমান আনয়ন করেছে এবং মুসলিম সে ব্যক্তি যে ঈমান ছাড়াই বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। এখানে অবশ্য ঈমান শব্দটি আন্তরিক বিশ্বাস এবং ইসলাম কেবল বাহ্যিক আনুগত্য বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এমনটি বুঝে নেয়া ঠিক নয় যে, এ দু'টি শব্দ কুরআন মজীদের দু'টি স্থায়ী ও বিপরীত অর্থজ্ঞাপক পরিভাষা। কুরআনের যেসব আয়াতে ইসলাম ও মুসলিম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তা বিশ্লেষণ করলে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির জন্য যে জীবন বিধান নাযিল করেছেন কুরআনের পরিভাষায় তার নাম ইসলাম। ঈমান ও আনুগত্য উভয়টি এর অন্তরভুক্ত। আর মুসলিম সে ব্যক্তি যে সরল মনে মেনে নেয় এবং কার্যত আনুগত্য করে। প্রমাণ স্বরূপ নিম্ন বর্ণিত আয়াতগুলো দেখুন ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (ال عمران : ١٩)

"নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর মনোনীত দীন 'ইসলাম'।" (আলে ইমরান, ১৯)

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ (ال عمران : ٨٥)

"যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা চায় তার সেই জীবন ব্যবস্থা কখনো গ্রহণ করা হবে না।" (আলে ইমরান, ৮৫)

وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (المائدة : ٣)

"আমি তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছি।" (আল মায়েদা, ৩)

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ (الانعام : ١٢٥)

"আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করতে চান তার হৃদয় মনকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।" (আল আনআম, ১২৫)

قُلْ اِنِّیْۤ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ (الانعام : ١٤)

"হে নবী। বলে দাও, আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে আমি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হই।" (আল আনআম, ১৪)

فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا (ال عمران : ٢٠)

"এরপর তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে হিদায়াত প্রাপ্ত হলো।"
(আলে ইমরান, ২০)

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا (المائدة : ٤٤)

"সমস্ত নবী—যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাওরাত অনুসারে ফায়সালা করতেন।"
(আল মায়েদা, ৪৪)

এসব আয়াতে এবং এ ধরনের আরো বহু আয়াতে ইসলাম গ্রহণের অর্থ কি ঈমানবিহীন আনুগত্য করা? একইভাবে 'মুসলিম' শব্দটি যে অর্থে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে তার জন্য নমুনা হিসেবে নিম্ন বর্ণিত আয়াতসমূহ দেখুন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (ال عمران : ١٠٢)

"হে ঈমান গ্রহণকারীগণ ! আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় করো। আর মুসলিম হওয়ার আগেই যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে।" (আলে ইমরান, ১০২)

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا (الحج : ٧٨)

"তিনি এর পূর্বেও তোমাদের নামকরণ করেছিলেন মুসলিম তাছাড়া এ কিতাবেও।"
(আল হাজ্ব, ৭৮)

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا (ال عمران : ٦٧)

"ইবরাহীম ইহুদী বা খৃষ্টান কোনটাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম।"
(আলে ইমরান, ৬৭)

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ (البقرة :١٢٨)

"(কা'বা ঘর নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈলের দোয়া) হে আমাদের রব, আমাদের দু'জনকেই তোমার অনুগত বানাও এবং আমাদের বংশ থেকে এমন একটি উম্মত সৃষ্টি করো যারা তোমার অনুগত হবে।" (আল বাকারা, ১২৮)।

يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (البقرة : ١٣٢)

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

হে নবী ! ঈমানের এ দাবীদারদের বলো, তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের দীনের কথা অবগত করাচ্ছো? আল্লাহ তো আসমান ও যমীনের প্রত্যেকটি জিনিস ভালভাবে অবহিত। এসব লোক তোমাকে বুঝাতে চায় যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমার উপকার করেছে। তাদের বলো, ইসলাম গ্রহণ করে আমার উপকার করেছো একথা মনে করো না। বরং যদি তোমরা নিজেদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহ তা'আলাই তোমাদের উপকার করে চলেছেন। কারণ তিনি তোমাদেরকে ঈমানের পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ আসমান ও যমীনের প্রতিটি গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে জানেন। তোমরা যা কিছু করছো তা সবই তিনি দেখছেন।

[নিজের সন্তানদেরকে হযরত ইয়াকূবের (আ) অসীয়ত] হে আমার সন্তানেরা, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য এ জীবন বিধানকেই মনোনীত করেছেন। অতএব, মুসলিম হওয়ার আগে যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে।" (আল বাকারা), ১৩২)।

এসব আয়াত পাঠ করে এমন ধারণা কে করতে পারে যে, এতে উল্লেখিত মুসলিম শব্দের দ্বারা এমন লোককে বুঝানো হয়েছে যে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করলেও আন্তরিকভাবে তা মানে না? সুতরাং কুরআনের পরিভাষা অনুসারে ইসলাম অর্থ ঈমানহীন আনুগত্য এবং কুরআনের ভাষায় কেবল বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণকারীকেই মুসলিম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এরূপ দাবী করাও চরম ভুল। অনুরূপ এ দাবী করাও ভুল যে, কুরআন মজীদে উল্লেখিত ঈমান ও মু'মিন শব্দ দু'টি অবশ্যই সরল মনে মেনে নেয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব শব্দ নিসন্দেহে এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এমন অনেক স্থানও আছে যেখানে এ শব্দ ঈমানের বাহ্যিক স্বীকৃতি বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। যারা মৌখিক স্বীকারোক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের দলে শামিল হয়েছে। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলে তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তারা সত্যিকার মু'মিন, না দুর্বল ঈমানের অধিকারী না মুনাফিক তা বিচার করা হয়নি। এর বহুসংখ্যক

উদাহরণের মধ্য থেকে মাত্র কয়েকটির জন্য দেখুন, আলে ইমরান, আয়াত ১৫৬; আন নিসা, ১৩৬; আল মায়েদা, ৫৪; আল আনফাল, ২০ থেকে ২৭; আত তাওবা, ৩৮; আল হাদীদ, ২৮; আস্‌–সফ, ২০।

ক্বাফ

৫০

নামকরণ

সূরার প্রথম বর্ণটিই এর নাম হিসেবে গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যা ق (ক্বাফ) বর্ণ দিয়ে শুরু হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

ঠিক কোন্ সময় এ সূরা নাযিল হয়েছে তা কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় না। তবে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায়, এটি মক্কী যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ে নাযিল হয়েছে। মক্কী যুগের দ্বিতীয় পর্যায় নবুওয়াতের তৃতীয় সন থেকে শুরু করে পঞ্চম সন পর্যন্ত বিস্তৃত। আমি সূরা আন'আমের ভূমিকায় এ যুগের বৈশিষ্টসমূহ বর্ণনা করেছি। ঐ সব বৈশিষ্টের প্রতি লক্ষ রেখে বিচার করলে মোটামুটি অনুমান করা যায় যে, সূরাটি নবুওয়াতের পঞ্চম বছরে নাযিল হয়ে থাকবে। এ সময় কাফেরদের। বিরোধিতা বেশ কঠোরতা লাভ করেছিল। কিন্তু তখনো জুলুম-নির্যাতন শুরু হয়নি।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

নির্ভরযোগ্য বর্ণনাসমূহ থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে দু' ঈদের নামাযে এ সূরা পড়তেন।

উম্মে হিশাম ইবনে হারেসা নাম্নী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিবেশিনী এক মহিলা বর্ণনা করেছেন যে, প্রায়ই আমি নবীর (সা) মুখ থেকে জুমআর খুতবায় এ সূরাটি শুনতাম এবং শুনতে শুনতেই তা আমার মুখস্ত হয়েছে। অপর কিছু রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি বেশীর ভাগ ফজরের নামাযেও এ সূরাটি পাঠ করতেন। এ থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, নবীর (সা) দৃষ্টিতে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। সে জন্য এর বিষয়বস্তু অধিক সংখ্যক লোকের কাছে পৌছানোর জন্য বারবার চেষ্টা করতেন।

সূরাটি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করলে এর গুরুত্বের কারণ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। গোটা সূরার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আখেরাত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা মুয়ায্যমায় দাওয়াতের কাজ শুরু করলে মানুষের কাছে তাঁর যে কথাটি সবচেয়ে বেশী অদ্ভুত মনে হয়েছিল তা হচ্ছে, মৃত্যুর পর পুনরায় মানুষকে জীবিত করে উঠানো হবে এবং তাদেরকে নিজের কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে। লোকজন বলতো,

এটা তো একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। এরূপ হতে পারে বলে বিবেক–বুদ্ধি বিশ্বাস করে না। আমাদের দেহের প্রতিটি অণু–পরমাণু যখন মাটিতে মিশে বিলীন হয়ে যাবে তখন হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে ঐসব বিক্ষিপ্ত অংশকে পুনরায় একত্রিত করে আমাদের এ দেহকে পুনরায় তৈরী করা হবে এবং আমরা জীবিত হয়ে যাব তা কি করে সম্ভব? এর জবাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ ভাষণটি নাযিল হয়। এতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে ছোট ছোট বাক্যে একদিকে আখেরাতের সম্ভাব্যতা ও তা সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছে। অন্যদিকে মানুষকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা বিস্মিত হও, বিবেক–বুদ্ধি বিরোধী মনে করো কিংবা মিথ্যা বলে মনে করো তাতে কোন অবস্থায়ই সত্য পরিবর্তিত হতে পারে না। সত্য তথা অকাট্য ও অটল সত্য হচ্ছে এই যে, তোমাদের দেহের এক একটি অণু–পরমাণু যা মাটিতে বিলীন হয়ে যায় তা কোথায় গিয়েছে এবং কি অবস্থায় কোথায় আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত আছেন। বিক্ষিপ্ত এসব অণু–পরমাণু পুনরায় একত্রিত হয়ে যাওয়া এবং তোমাদেরকে ইতিপূর্বে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল ঠিক সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ তা'আলার একটি ইংগিতই যথেষ্ট। অনুরূপভাবে তোমাদের এ ধারণাও একটি ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয় যে, এখানে তোমাদেরকে লাগামহীন উটের মত ছেড়ে দেয়া হয়েছে, কারো কাছে তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তা'আলা নিজেও সরাসরি তোমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ সম্পর্কে এমনকি তোমাদের মনের মধ্যে জেগে ওঠা সমস্ত ধারণা ও কল্পনা পর্যন্ত অবহিত আছেন। তাছাড়া তাঁর ফেরেশতারাও তোমাদের প্রত্যেকের সাথে থেকে তোমাদের সমস্ত গতিবিধি রেকর্ড করে সংরক্ষিত করে যাচ্ছে। যেভাবে বৃষ্টির একটি বিন্দু পতিত হওয়ার পর মাটি ফুঁড়ে উদ্ভিদরাজির অঙ্কুর বেরিয়ে আসে ঠিক তেমনি নির্দিষ্ট সময় আসা মাত্র তাঁর একটি মাত্র আহবানে তোমরাও ঠিক তেমনি বেরিয়ে আসবে। আজ তোমাদের বিবেক–বুদ্ধির ওপর গাফলতের যে পর্দা পড়ে আছে তোমাদের সামনে থেকে সেদিন তা অপসারিত হবে এবং আজ যা অস্বীকার করছো সেদিন তা নিজের চোখে দেখতে পাবে। তখন তোমরা জানতে পারবে, পৃথিবীতে তোমরা দায়িত্বহীন ছিলে না, বরং নিজ কাজ–কর্মের জন্য দায়ী ছিলে। পুরস্কার ও শাস্তি, আযাব ও সওয়াব এবং জান্নাত ও দোযখ যেসব জিনিসকে আজ তোমরা আজব কল্প কাহিনী বলে মনে করছো সেদিন তা সবই তোমাদের সামনে বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দেবে। যে জাহান্নামকে আজ বিবেক–বুদ্ধির বিরোধী বলে মনে করো সত্যের সাথে শত্রুতার অপরাধে সেদিন তোমাদেরকে সেই জাহান্নামেই নিক্ষেপ করা হবে। আর যে জান্নাতের কথা শুনে আজ তোমরা বিস্মিত হচ্ছো মহা দয়ালু আল্লাহকে ভয় করে সঠিক পথে ফিরে আসা লোকেরা সেদিন তোমাদের চোখের সামনে সেই জান্নাতে চলে যাবে।

আয়াত ৪৫ সূরা ক্বাফ–মাদানী রুকূ' ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ① بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ② ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ ③ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ④

ক্বাফ, মহিমান্বিত কল্যাণময় কুরআনের[১] শপথ। তারা বরং বিস্মিত হয়েছে এ জন্য যে, তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী এসেছে।[২] এরপর অস্বীকারকারীরা বলতে শুরু করলো এটা তো বড় আশ্চর্যজনক কথা, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটিতে মিশে যাব (তখন কি আমাদের উঠানো হবে)? এ প্রত্যাবর্তন তো যুক্তি–বুদ্ধি বিরোধী।[৩] অথচ মাটি তার দেহের যা কিছু খেয়ে ফেলে তা সবই আমার জানা। আমার কাছে একখানা কিতাব আছে। তাতে সবকিছু সংরক্ষিত আছে।[৪]

১. مجيد শব্দ আরবী ভাষায় দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক, উচ্চ পদের অধিকারী, শ্রেষ্ঠ, মহান এবং সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। দুই, দয়ালু, অধিক দানশীল এবং অতি মাত্রায় উপকারকারী। কুরআনের জন্য এ শব্দটি দু'টি অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন মহান এ দিক দিয়ে যে, তার মোকাবিলায় দুনিয়ার আর কোন গ্রন্থই পেশ করা যেতে পারে না। ভাষা ও সাহিত্যিক মূল্যবোধের বিচারেও তা মু'জিযা আবার শিক্ষা ও জ্ঞানের বিচারেও তা মু'জিযা। কুরআন যে সময় নাযিল হয়েছিল সে সময়েও মানুষ কুরআনের বাণীর মত বাণী বানিয়ে পেশ করতে অক্ষম ছিল এবং আজও অক্ষম। তার কোন কথা কখনো কোন যুগে ভুল প্রমাণ করা যায়নি এবং যাবেও না। বাতিল না পারে সামনে থেকে এর মোকাবিলা করতে না পারে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে পরাজিত করতে। কুরআন অধিক দাতা এ দিক দিয়ে যে, মানুষ তার থেকে যত বেশী পথ–নির্দেশনা পাওয়ার চেষ্টা করে সে তাকে ততটাই পথনির্দেশনা দান করে এবং যত বেশী তা অনুসরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সে ততই বেশী লাভ করতে থাকে। এর উপকার ও

কল্যাণের এমন কোন সীমা নেই যেখানে পৌঁছে মানুষ এর মুখাপেক্ষী না হয়েও পারে কিংবা যেখানে পৌঁছার পর এর উপকারিতা শেষ হয়ে যায়।

২. এ আয়াতাংশটি অলংকারময় ভাষার একটি অতি উত্তম নমুনা। অনেক বড় একটি বিষয়কে এতে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে। যে ব্যাপারে কুরআনের শপথ করা হয়েছে তা বর্ণনা করা হয়নি। এ বিষয়টি উল্লেখ করার পরিবর্তে মাঝে একটি সূক্ষ্ম শূন্যতা রেখে পরবর্তী কথা 'আসলে' বা 'বরং' শব্দ দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে। কেউ যদি একটু চিন্তা-ভাবনা করে এবং যে পটভূমিতে একথা বলা হয়েছে সেদিকেও খেয়াল রাখে তাহলে শপথ ও 'বরং' শব্দের মাঝে যে শূন্যতা রেখে দেয়া হয়েছে তার বিষয়বস্তু কি তা সে জানতে পারবে। এখানে মূলত যে ব্যাপারে শপথ করা হয়েছে তাহচ্ছে, মক্কাবাসীরা কোন যুক্তিসংগত কারণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত মানতে অস্বীকার করেনি বরং একেবারেই একটি অযৌক্তিক কারণে অস্বীকার করেছে। অর্থাৎ তাদের স্বজাতির একজন মানুষ এবং তাদের নিজেদের কওমের এক ব্যক্তির আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ককারী হয়ে আসা তাদের কাছে অতি আশ্চর্যজনক ব্যাপার। অথচ, বিস্ময়ের ব্যাপার হতে পারতো যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কল্যাণ অকল্যাণ সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে তাদের সাবধান করার কোন ব্যবস্থা না করতেন, কিংবা মানুষকে সাবধান করার জন্য মানুষ ছাড়া অন্য কিছুকে পাঠাতেন অথবা আরবদের সাবধান করার জন্য কোন চীনাকে পাঠিয়ে দিতেন। তাই অস্বীকৃতির এ কারণ একেবারেই অযৌক্তিক। সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন একজন মানুষ নিশ্চিতভাবেই একথা মানতে বাধ্য যে, বান্দাদেরকে হিদায়াতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্যই ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং সেটা হবে এভাবে যে, যাদের মধ্যে সাবধানকারীকে পাঠানো হয়েছে সে তাদেরই একজন হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই কি সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা এ কাজের জন্য পাঠিয়েছেন ? এ বিষয়টির মীমাংসার জন্য আর কোন সাক্ষের প্রয়োজন নেই, যে মহান ও শ্রেষ্ঠ কল্যাণময় কুরআন তিনি পেশ করছেন সেটিই তার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে, এ আয়াতে কুরআনের শপথ করা হয়েছে একথা বুঝানোর জন্য যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যিই আল্লাহর রসূল এবং তাঁর রিসালাত সম্পর্কে কাফেরদের বিস্ময় অহেতুক। কুরআনের "মজীদ" হওয়াকে এ দাবীর প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

৩. এটা ছিল তাঁদের দ্বিতীয় বিস্ময়। তাদের প্রথম ও প্রকৃত বিস্ময় মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে ছিল না, বরং তা ছিল এ বিষয়ে যে, তাদের নিজেদের কওমের এক ব্যক্তি দাবী করে বসেছে যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে সাবধান করার জন্য এসেছেন। তাছাড়া তারা আরো বিস্মিত হয়েছে এ কারণে যে, তিনি যে বিষয়ে তাদেরকে সাবধান করছিলেন তা হচ্ছে, সমস্ত মানুষকে মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত করা হবে, তাদেরকে একত্রিত করে আল্লাহর আদালতে হাজির করা হবে এবং সেখানে তাদের সমস্ত কাজ-কর্মের হিসেব নিকেশের পর পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে।

৪. অর্থাৎ একথা যদি তাদের বিবেক-বুদ্ধিতে না ধরে তাহলে তা তাদের বিবেক-বুদ্ধির সংকীর্ণতা। তাদের বিবেক-বুদ্ধির সংকীর্ণতার কারণে আল্লাহর জ্ঞান ও

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ﴿٥﴾ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿١٠﴾

এসব লোকেরা তো এমন যে, যখনই তাদের কাছে সত্য এসেছে, তখনই তারা তাকে মিথ্যা মনে করেছে। এ কারণেই তারা এখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে আছে।[৫]

আচ্ছা,[৬] *এরা কি কখনো এদের মাথার ওপরের আসমানের দিকে তাকায়নি? আমি কিভাবে তা তৈরী করেছি এবং সজ্জিত করেছি।*[৭] *তাতে কোথাও কোন ফাটল নেই।*[৮] *ভূপৃষ্ঠকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি, তাতে পাহাড় স্থাপন করেছি এবং তার মধ্যে সব রকম সুদৃশ্য উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন করেছি।*[৯] *এসব জিনিসের সবগুলোই দৃষ্টি উন্মুক্তকারী এবং শিক্ষাদানকারী ঐ সব বান্দার জন্য যারা সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আমি আসমান থেকে বরকতপূর্ণ পানি নাযিল করেছি। অতপর তা দ্বারা বাগান ও খাদ্য শস্য উৎপন্ন করেছি। তাছাড়া থরে থরে সজ্জিত ফলভর্তি কাঁদি বিশিষ্ট দীর্ঘ সুউচ্চ খেজুর গাছ।*

কুদরতও সংকীর্ণ হতে হবে তা নয়। এরা মনে করে, সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মৃত্যুবরণকারী অসংখ্য মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশ যা মাটিতে মিশে গিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও বিক্ষিপ্ত হয়ে মিশে যাবে তা একত্রিত করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, ঐ সব দেহাংশের একেকটি যেখানে যে অবস্থায় আছে আল্লাহ তা'আলা তা সরাসরি জানেন, তাছাড়া আল্লাহর দফতরে তার পূর্ণাংগ রেকর্ডও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। একটি ক্ষুদ্র অণুও তা থেকে বাদ পড়ছে না। যখন আল্লাহর নির্দেশ হবে সেই মুহূর্তেই তাঁর ফেরেশতারা উক্ত রেকর্ড দেখে একেকটি অণুকে খুঁজে বের করবে এবং সমস্ত মানুষ যে দেহ নিয়ে দুনিয়াতে কাজ করেছিল সেই দেহ তারা পুনরায় বানিয়ে দেবে।

আখেরাতের জীবন যে কেবল দুনিয়ার জীবনের মত দৈহিক জীবন হবে তাই নয় বরং দুনিয়াতে মানুষের যে দেহ ছিল আখেরাতেও প্রত্যেক মানুষের হুবহু সে একই দেহ হবে।

কুরআন মজীদের যেসব আয়াতে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এ আয়াতটিও তার একটি। যদি ব্যাপারটি তা না হতো তাহলে কাফেরদের কথার জবাবে একথা বলা একেবারেই অর্থহীন হতো যে, মাটি তোমাদের দেহের যা কিছু খেয়ে ফেলে তা সবই আমার জানা আছে এবং তার প্রতিটি অণু-পরমাণুর রেকর্ড আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হা-মীম আস্ সাজদা, টীকা ২৫)

৫. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশটিতে একটি অতি বড় বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ তারা শুধু বিস্ময় প্রকাশ করা এবং বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী ঠাওরানোকেই যথেষ্ট মনে করেনি। বরং যে সময় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সত্যের দাওয়াত পেশ করেছেন সে সময় তারা কোন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তাকে নির্জলা মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছে। অবশ্যম্ভাবীরূপে তার যে ফল হওয়ার ছিল এবং হয়েছে তা হচ্ছে, এ দাওয়াত এবং এ দাওয়াত পেশকারী রসূলের ব্যাপারে এরা কখনো স্থির ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। কখনো তাঁকে কবি বলে, কখনো বলে গণক কিংবা পাগল। কখনো বলে সে যাদুকর আবার কখনো বলে কেউ তাঁর ওপর যাদু করেছে। কখনো বলে নিজের বড়ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সে এ বাণী নিজে বানিয়ে এনেছে আবার কখনো অপবাদ আরোপ করে যে, অন্যকিছু লোক তার পৃষ্ঠপোষকতা করছে। তারাই তাকে এসব কথা বানিয়ে দেয়। এসব পরস্পর বিরোধী কথাই প্রকাশ করে যে, তারা নিজেদের দৃষ্টিভংগী সম্পর্কেই পুরোপুরি দ্বিধান্বিত। যদি তারা তাড়াহুড়া করে একেবারে প্রথমেই নবীকে অস্বীকার না করতো এবং কোন রকম চিন্তা-ভাবনা না করে আগেভাগেই একটি সিদ্ধান্ত দেয়ার পূর্বে ধীরস্থিরভাবে একথা ভেবে দেখতো যে, কে এ দাওয়াত পেশ করছে, কি কথা সে বলছে এবং তার দাওয়াতের স্বপক্ষে কি দলীল-প্রমাণ পেশ করছে তাহলে তারা কখনো এ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়তো না। এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, তাদের কাছে ঐ ব্যক্তি অপরিচিত কেউ ছিল না। সে অন্য কোনখান থেকে আকস্মিকভাবে উড়ে এসে জুড়ে বসেনি। সে তাদের স্বজাতিরই একজন সদস্য ছিল। তাদের জানা শোনা লোক ছিল। তারা তাঁর চরিত্র ও কর্ম যোগ্যতা সম্পর্কে অনবহিত ছিল না। এমন একজন মানুষের পক্ষ থেকে যখন একটি কথা পেশ করা হয়েছিল তখন সাথে সাথে তা গ্রহণ না করলেও শোনামাত্রই তা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মতও ছিল না। তাছাড়া সেটি যুক্তি-প্রমাণহীন কথাও ছিল না। সে তার পক্ষে দলীল-প্রমাণ পেশ করছিলো। তার প্রমাণাদি কতখানি যুক্তিসংগত তা খোলা কান দিয়ে শোনা এবং পক্ষপাতহীনভাবে যাঁচাই বাছাই করে দেখা উচিত ছিল। কিন্তু এ নীতি গ্রহণ করার পরিবর্তে যখন তারা জিদের বশবর্তী হয়ে প্রথম পর্যায়েই তাকে অস্বীকার করে বসলো তখন তার ফল হলো এই যে, সত্য পর্যন্ত পৌছার একটি দরজা তারা নিজেরাই বন্ধ করে দিল এবং চারদিকে উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ানোর অনেক দরজা খুলে নিল। এখন তারা নিজেদের প্রাথমিক ভুলকে যুক্তিসিদ্ধ করার পর পরস্পর বিরোধী আরো অনেক কথা গড়তে পারে। কিন্তু তিনি সত্য নবীও হতে পারেন এবং তার পেশকৃত কথা সত্যও হতে পারে এ একটি কথা চিন্তা করে দেখার জন্যও তারা প্রস্তুত নয়।

৬. উপরোল্লেখিত পাঁচটি আয়াতে মক্কার কাফেরদের ভূমিকার অযৌক্তিকতা স্পষ্ট করে দেয়ার পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখেরাতের যে খবর দিয়েছেন

তার সত্যতার প্রমাণাদি কি তা বলা হচ্ছে। এখানে একথাটি ভালভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন যে, কাফেররা যে দু'টি বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করছিলো তার মধ্যে একটি অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে প্রারম্ভেই দু'টি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। প্রথম প্রমাণটি হলো, তিনি তোমাদের সামনে কুরআন মজীদ পেশ করছেন যা তাঁর নবী হওয়ার খোলাখুলি প্রমাণ। দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে তিনি তোমাদের নিজেদের স্বজাতি ও জ্ঞাতি গোষ্ঠীর লোক। তিনি হঠাৎ আসমান থেকে কিংবা অন্য কোন অঞ্চল থেকে এসে হাজির হননি যে, তিনি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কিনা আর এ কুরআন তাঁর নিজের রচিত কথা হতে পারে কিনা তা তাঁর জীবন, চরিত্র ও কর্ম যাঁচাই-বাছাই করে বিশ্লেষণ করা কঠিন। অতএব তাঁর নবুওয়াত দাবী সম্পর্কে তোমাদের বিস্ময় অনর্থক। এ যুক্তি-প্রমাণ সবিস্তারে পেশ করার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত দু'টি ইংগিত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, মুহাম্মাদ (সা) যে সময় মক্কায় দাঁড়িয়ে নিজে সেসব লোকদের কুরআন শুনাচ্ছিলেন যারা তাঁর শৈশব থেকে শুরু করে যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত তাঁর গোটা জীবন দেখেছিল, সে সময়ের প্রতিটি ব্যক্তির কাছে এসব ইংগিতের বিস্তারিত পরিবেশ ও পটভূমি আপনা থেকেই সুস্পষ্ট ছিল। তাই তাঁর বর্ণনা বাদ দিয়ে দ্বিতীয় যে জিনিসটিকে ঐ সব লোক অদ্ভুত ও বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী বলছে তার সত্যতার বিস্তারিত যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে।

৭. এখানে আসমান বলতে পুরো উর্ধজগতকে বুঝানো হয়েছে। যা মানুষ রাত-দিন তার মাথার ওপর ছেয়ে থাকতে দেখে। যেখানে দিনের বেলা সূর্য দীপ্তি ছড়ায়, রাতের বেলা চাঁদ এবং অসংখ্য তারকারাজি উজ্জল হয়ে দেখা দেয়। মানুষ যদি এগুলোকে খালি চোখেই দেখে তাহলেও সে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়ে। আর দূরবীন লাগিয়ে দেখলে এমন একটি বিশাল সুবিস্তৃত সৃষ্টিজগত তার সামনে ভেসে ওঠে যার কোন সীমা পরিসীমা নেই। কোথায় শুরু এবং কোথায় শেষ হয়েছে বুঝা যাবে না। আমাদের পৃথিবীর চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড় বিশালকায় গ্রহসমূহ এর মধ্যে বলের মত ঘুরপাক খাচ্ছে। আমাদের সূর্যের চেয়ে হাজার হাজার গুণ অধিক উজ্জল তারকা তার মধ্যে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। আমাদের এ সৌরজগত তার একটি মাত্র ছায়াপথের এক কোণে পড়ে আছে। এ একটি মাত্র ছায়াপথে আমাদের সূর্যের মত কমপক্ষে আরো ৩ শত কোটি তারকা (স্থির বস্তু) বিদ্যমান এবং মানুষের পর্যবেক্ষণ এ পর্যন্ত এরূপ দশ লাখ ছায়াপথের সন্ধান দিচ্ছে। এ লক্ষ লক্ষ ছায়াপথের আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী প্রতিবেশী ছায়াপথটি এত দূরে অবস্থিত যে, তার আলো সেকেণ্ডে এক লাখ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিতে অগ্রসর হয়ে দশ লাখ বছরে আমাদের পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছে। এটা হচ্ছে সৃষ্টিজগতের সেই অংশের বিস্তৃতির অবস্থা যা এ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে। আল্লাহর কর্তৃত্ব কত ব্যাপক ও বিস্তৃত তার কোন অনুমান আমরা করতে পারি না। হতে পারে, সমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দু পানি যতটুকু মানুষের জানা সৃষ্টিজগত গোটা সৃষ্টিজগতের অনুপাতের ততটুকুও নয়। যে আল্লাহ এ বিশাল সৃষ্টিজগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন, ভূপৃষ্ঠের ধীরগতি ও বাকশক্তি সম্পন্ন মানুষ নামে অভিহিত অতি ক্ষুদ্র জীব যদি সেই আল্লাহ সম্পর্কে মত প্রকাশ করে যে, মৃত্যুর পর তিনি তাকে পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না তাহলে সেটা তার নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির সংকীর্ণতা মাত্র। তাতে বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতা কি করে সীমিত হতে পারে।

رِزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ﴿١٢﴾ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٣﴾ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴿١٤﴾ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾

এটা হচ্ছে বান্দাহদেরকে রিযিক দেয়ার ব্যবস্থা। এ পানি দ্বারা আমি মৃত ভূমিকে জীবন দান করি।[১০] (মৃত মানুষের মাটি থেকে) বেরিয়ে আসাও এভাবেই হবে।[১১]

এদের আগে নূহের কওম, আসহাবুর রাস,[১২] সামূদ, আদ, ফেরাউন,[১৩] লূতের ভাই, আইকাবাসী এবং তুব্বা কওমের[১৪] লোকেরাও অস্বীকার করেছিল।[১৫] প্রত্যেকেই রসূলদের অস্বীকার করেছিল[১৬] এবং পরিণামে আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতি তাদের জন্য কার্যকর হয়েছে।[১৭]

আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিলাম? আসলে নতুন করে সৃষ্টির ব্যাপারে এসব লোক সন্দেহে নিপতিত হয়ে আছে।[১৮]

৮. অর্থাৎ এ বিস্ময়কর বিস্তৃতি সত্ত্বেও এ বিশাল ও জাঁকজমকপূর্ণ বিশ্ব ব্যবস্থা এমন সুশৃংখল ও মজবুত এবং তার বন্ধন এমন অটুট যে, তাতে কোথাও কোন চিড় বা ফাটল এবং কোথাও গিয়ে এর ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয় না। একটি উদাহরণের সাহায্যে এ বিষয়টি ভালভাবে বুঝা যেতে পারে, আধুনিক যুগের বেতার সংকেত ভিত্তিক জ্যোতির্বিজ্ঞান–গবেষকগণ একটি ছায়াপথ পর্যবেক্ষণ করেছেন যাকে তারা উৎস ৩গ ২৯৫ (Source 3c 295) নামে আখ্যায়িত করে থাকেন। উক্ত ছায়াপথ সম্পর্কে তাদের ধারণা হচ্ছে, বর্তমানে আমাদের কাছে তার যে আলো এসে পৌঁছেছে তা চারশ' কোটি বছরেরও বেশী সময় পূর্বে সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে থাকবে। এত দূর থেকে এসব আলোক রশ্মির পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছা কি করে সম্ভব হতো যদি পৃথিবী এবং উক্ত ছায়াপথের মাঝে বিশ্ব ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা কোথাও ছিন্ন থাকতো এবং বন্ধনে ফাটল থাকতো। আল্লাহ তা'আলা এ সত্যের দিকে ইংগিত করে প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামনে এ প্রশ্নই রেখেছেন যে, আমার সৃষ্ট বিশ্ব–জাহানের এ ব্যবস্থাপনায় যখন তোমরা একটি সামান্য ছিদ্রও দেখিয়ে দিতে পারো না তখন তোমাদের মগজে আমার দুর্বলতার এ ধারণা কোথা থেকে আসে যে, তোমাদের পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ শেষ হয়ে যাওয়ার পর হিসেব–নিকেশ নেয়ার জন্য আমি তোমাদের জীবিত করে আমার সামনে হাজির করতে চাইলে তা করতে পারবো না।

এটা শুধু আখেরাতের সম্ভাবনার প্রমাণই নয় বরং তাওহীদেরও প্রমাণ। চারশত কোটি আলোক বর্ষের (Light Year) দূরত্ব থেকে এসব আলোক রশ্মির পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছা

এবং এখানে মানুষের তৈরী যন্ত্রপাতিতে ধরা পড়া খোলাখুলি একথা প্রমাণ করে যে, ঐ ছায়াপথ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত গোটা সৃষ্টিজগত একই বস্তুর তৈরী, তার মধ্যে একই রকম শক্তিসমূহ কর্মতৎপর রয়েছে এবং কোন প্রকার পার্থক্য ও ভিন্নতা ছাড়া তা একই রকম নিয়ম-কানুন অনুসারে কাজ করছে। তা না হলে এসব আলোক রশ্মি এ পৃথিবী পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হতো না এবং পৃথিবী ও তার পরিবেশে ক্রিয়াশীল নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষ যেসব যন্ত্রপাতি তৈরী করেছে তাতেও ধরা পড়তো না। এতে প্রমাণিত হয়, একই আল্লাহ গোটা এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা, মালিক, শাসক ও ব্যবস্থাপক।

৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নাহ্‌ল, টীকা ১২, ১৩ ও ১৪; আন নাম্‌ল, টীকা ৭৩ ৭৪; আয্‌ যুখরুফ, টীকা ৭।

১০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নাম্‌ল, টীকা ৭৩, ৭৪, ৮১; আর রূম, টীকা ২৫, ৩৩, ৩৫; ইয়াসীন, টীকা ২৯।

১১. যুক্তি হচ্ছে, যে আল্লাহ এ পৃথিবী-গ্রহটিকে জীবন্ত সৃষ্টির বসবাসের জন্য উপযুক্ত স্থান বানিয়েছেন, যিনি পৃথিবীর প্রাণহীন মাটিকে আসমানের প্রাণহীণ পানির সাথে মিশিয়ে এত উচ্চ পর্যায়ের উদ্ভিদ জীবন সৃষ্টি করেছেন যা তোমরা তোমাদের বাগান ও শস্যক্ষেত রূপে শ্যামলিমায় ভরে উঠতে দেখছো এবং যিনি এ উদ্ভিদরাজিকে মানুষ ও জীব-জন্তু সবার জন্য রিযিকের মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে তোমাদের এ ধারণা যে, মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন। এটা নিরেট নির্বুদ্ধিতামূলক ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা নিজের চোখে অহরহ দেখছো, একটি এলাকা একেবারে শুষ্ক ও প্রাণহীণ পড়ে আছে, বৃষ্টির একটি বিন্দু পড়া মাত্রই তার ভেতর থেকে অকস্মাত জীবনের ঝর্ণাধারা ফুটে বের হয়, যুগ যুগ ধরে মৃত শিকড়সমূহ হঠাৎ জীবন ফিরে পায় এবং মাটির গভীর অভ্যন্তর ভাগ থেকে নানা রকম কীট ও পোকামাকড় বেরিয়ে এসে নর্তন কুর্দন শুরু করে দেয়। মৃত্যুর পরে জীবন যে আবার অসম্ভব নয় এটা তারই স্পষ্ট প্রমাণ। তোমাদের এ স্পষ্ট পর্যবেক্ষণকে যখন তোমরা মিথ্যা বলতে পার না তখন একথা কি করে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে চাও যে, আল্লাহ তা'আলা যখন চাইবেন তখন তোমরা নিজেরাও ঠিক তেমনি মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে যেমনভাবে উদ্ভিদরাজির অঙ্কুর বেরিয়ে আসে। এ প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আরব ভূখণ্ডের বহু অঞ্চল এমন যেখানে কোন কোন সময় পাঁচ বছর পর্যন্ত বৃষ্টি হয় না। এমনকি কখনো কখনো তার চেয়েও বেশী সময় চলে যায় কিন্তু আসমান থেকে একবিন্দু বৃষ্টিও ঝরে না। উত্তপ্ত মরুভূমিতে এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঘাসের মূল এবং কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড়ের জীবিত থাকা কল্পনাতীত। তা সত্ত্বেও কোন সময় যখন সেখানে সামান্য বৃষ্টিও হয় তখন ঘাস ফুটে বের হয় এবং কীট-পতঙ্গ ও পোকা-মাকড় জীবনলাভ করে। সুতরাং এত দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টির অভিজ্ঞতা যাদের নেই তাদের তুলনায় আরবের লোকেরা আরো ভালভাবে এ যুক্তি উপলব্ধি করতে সক্ষম।

১২. এর আগে সূরা ফুরকানের ৩৮ আয়াতে 'আসহাবুর রাসৃসের' আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দ্বিতীয় বারের মত তাদের উল্লেখ করা হচ্ছে। তবে উভয় স্থানেই নবীদের

অস্বীকারকারী জাতিসমূহের সাথে কেবল মাত্র তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের কোন বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করা হয়নি। আরবের কিংবদন্তীতে আর রাস্ নামে দু'টি স্থান সুপরিচিত। একটি নাজদে এবং দ্বিতীয়টি উত্তর হিজাযে। এর মধ্যে নাজদের আর রাস অধিক পরিচিত এবং জাহেলী যুগের কাব্য গাঁথায় এর উল্লেখই বেশী পাওয়া যায়। আসহাবুর রাস্ এ দু'টি স্থানের কোন্‌টির অধিবাসী ছিল তা এখন নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। কোন বর্ণনাতেই তাদের কাহিনীর নির্ভরযোগ্য বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। বড় জোর এতটুকু সঠিকভাবে বলা যেতে পারে যে, তারা ছিল এমন এক জাতি যারা তাদের নবীকে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। তবে তাদের বিষয়ে কুরআন মজীদে শুধু ইংগিত দিয়েই ক্ষান্ত থাকা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, কুরআন নাযিলের সময় আরবরা ব্যাপকভাবে তাদের কাহিনী সম্পর্কে অবহিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে এসব বর্ণনা ও কাহিনী ইতিহাসে সংরক্ষিত হতে পারেনি।

১৩. "ফেরাউনের কওম" বলার পরিবর্তে শুধু ফেরাউনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সে তার জাতির ঘাড়ে এমনভাবে চেপে বসেছিল যে, তার সামনে তার জাতির কোন স্বাধীন বক্তব্য ও দৃঢ়তা অবশিষ্ট ছিল না। সে যে গোমরাহীর দিকেই অগ্রসর হতো তার জাতিও তার পেছনে পেছনে ছুটে চলতো। তাই একা ঐ ব্যক্তিকে গোটা জাতির গোমরাহীর জন্য দায়ী করা হয়েছে। যেখানে জাতির মতামত ও কর্মের স্বাধীনতা আছে সেখানে তার কাজ-কর্মের দায়-দায়িত্ব সে জাতি নিজেই বহন করে। আর যেখানে এক ব্যক্তির একনায়কত্ব জাতিকে অসহায় করে রাখে সেখানে সেই এক ব্যক্তিই গোটা জাতির অপরাধের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেয়। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে, এ বোঝা এক ব্যক্তির ঘাড়ে উত্তোলিত হওয়ার পর জাতি তার দায়-দায়িত্ব থেকে পুরোপুরি অব্যাহতি পেয়ে যায়। না, সে ক্ষেত্রে নিজের ঘাড়ে এক ব্যক্তিকে এভাবে চেপে বসতে দিয়েছে কেন, সেই নৈতিক দুর্বলতার দায়িত্ব জাতির ওপর অবশ্যই বর্তায়। সূরা যুখরুফের ৫৪ আয়াতে এ বিষয়টির প্রতিই ইংগিত দেয়া হয়েছে।

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوْهُ   اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَاسِقِيْنَ

"ফেরাউন তার জাতিকে গুরুত্বহীন মনে করে নিয়েছে এবং তারাও তার আনুগত্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল ফাসেক।"

(ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা যুখরুফের ব্যাখ্যা, টীকা ৫)

১৪. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবার ব্যাখ্যা, টীকা ৩৭; সূরা দুখান, টীকা ৩২।

১৫. অর্থাৎ তারা সবাই তাদের রসূলের রিসালাতকে অস্বীকার করেছে এবং মৃত্যুর পরে তাদেরকে পুনরায় জীবিত করে উঠানো হবে তাঁদের দেয়া এ খবরও অস্বীকার করেছে।

১৬. যদিও প্রত্যেক জাতি কেবল তাদের কাছে প্রেরিত রসূলকেই অস্বীকার করেছিল। কিন্তু তারা যেহেতু এমন একটি খবরকে অস্বীকার করছিল যা সমস্ত রসূল সর্বসম্মতভাবে

পেশ করছিলেন। তাই একজন রসূলকে অস্বীকার করা প্রকৃতপক্ষে সমস্ত রসূলকেই অস্বীকার করার নামান্তর। তাছাড়া এসব জাতির প্রত্যেকে কেবল তাদের কাছে আগমনকারী রসূলের রিসালাত অস্বীকার করেনি, বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের হিদায়াতের জন্য কোন মানুষ যে আদিষ্ট হয়ে আসতে পারে একথা মানতে তারা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং তারা ছিল মূলত রিসালাতেরই অস্বীকারকারী এবং তাদের কারো অপরাধই শুধুমাত্র একজন রসূলের অস্বীকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

১৭. এটা আখেরাতের সপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থাপন। এর পূর্বের ৬টি আয়াতে আখেরাতের সম্ভাবনার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে পেশ করা হয়েছে আখেরাতের বাস্তবতার প্রমাণ। সমস্ত নবী-রসূল আলাইহিমুস সালাম আখেরাত সম্পর্কিত যে আকীদা পেশ করেছেন তা যে সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তব তার প্রমাণ হিসেবে এ আয়াতে আরব ও তার আশেপাশের জাতিসমূহের ঐতিহাসিক পরিণতিকে পেশ করা হয়েছে। কারণ যে জাতিই তা অস্বীকার করেছে সে জাতিই চরম নৈতিক বিকৃতির শিকার হয়েছে। এমনকি পরিশেষে আল্লাহর আযাব এসে তাদেরকে পৃথিবী থেকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। অখেরাতের অস্বীকৃতির সাথে নৈতিক বিকৃতির এ অনিবার্যতা যা ইতিহাসের আবর্তনের সাথে সাথে একের পর এক পরিলক্ষিত হয়—একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এ দুনিয়ায় মানুষকে প্রকৃতপক্ষে দায়িত্বহীন ও কৃতকর্মের জবাবদিহি মুক্ত করে ছেড়ে দেয়া হয়নি, বরং কার্যকাল শেষ হওয়ার পর তাকে তার সমস্ত কাজ-কর্মের জবাব দিতে হবে। এ কারণে যখনই সে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত মনে করে দুনিয়ায় কাজ করে তখনই তার গোটা জীবন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। যখন কোন কাজের ক্রমাগতভাবে খারাপ ফলাফল দেখা দিতে থাকে তখন তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, কাজটি বাস্তবতার পরিপন্থী।

১৮. এটা আখেরাতের সপক্ষে যৌক্তিক প্রমাণ। যে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকার করে না এবং সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত এ বিশ্ব-জাহানে মানুষের সৃষ্টিকে নিছক একটি আকস্মিক ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত করার মত নির্বুদ্ধিতা যাকে পেয়ে বসেনি তার পক্ষে একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, আল্লাহ তা'আলাই আমাদেরকে এবং পুরো এ বিশ্ব-জাহানকে সৃষ্টি করেছেন। আমরা যে এ দুনিয়ায় জীবিতাবস্থায় বর্তমান এবং দুনিয়া ও আসমানের এসব কাজ-কারবার যে আমাদের চোখের সামনেই চলছে, এটা স্বতই প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ আমাদেরকে এবং এ বিশ্ব-জাহানকে সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিলেন না। তা সত্ত্বেও কেউ যদি বলে যে, কিয়ামত সংঘটিত করার পর সেই আল্লাহই আরেকটি জগত সৃষ্টি করতে পারবেন না এবং মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় আমাদের সৃষ্টি করতে পারবেন না তাহলে সে একটি যুক্তি বিরোধী কথাই বলে। আল্লাহ অক্ষম হলে প্রথমবারই তিনি সৃষ্টি করতে অক্ষম থাকতেন। তিনি যখন প্রথমবার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন এবং সেই সৃষ্টিকর্মের বদৌলতেই আমরা অস্তিত্ব লাভ করেছি তখন নিজের সৃষ্ট বস্তুকে ধ্বংস করে তা পুনরায় সৃষ্টি করতে তিনি অপারগ হবেন কেন? এর কি যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে?

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾

২ রুকূ'

আমি[১৯] মানুষকে সৃষ্টি করেছি আর তাদের মনে যেসব কুমন্ত্রণা উদিত হয় তা আমি জানি। আমি তার ঘাড়ের রগের চেয়েও তার বেশী কাছে আছি।[২০] (আমার এ সরাসরি জ্ঞান ছাড়াও) দু'জন লেখক তার ডান ও বাঁ দিকে বসে সবকিছু লিপিবদ্ধ করছে। এমন কোন শব্দ তার মুখ থেকে বের হয় না যা সংরক্ষিত করার জন্য একজন সদা প্রস্তুত রক্ষক উপস্থিত থাকে না।[২১] তারপর দেখো, মৃত্যুর যন্ত্রণা পরম সত্য নিয়ে হাজির হয়েছে।[২২] এটা সে জিনিস যা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলে।[২৩] এরপর শিংগায় ফুৎকার দেয়া হলো।[২৪] এটা সেদিন যার ভয় তোমাদের দেখানো হতো।

১৯. আখেরাতের সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার পর বলা হচ্ছে, তোমরা আখেরাতকে মেনে নাও বা অস্বীকার করো সর্বাবস্থায় তা অবধারিত এবং তা এমন একটি বাস্তব ঘটনা যা তোমাদের অস্বীকার করা সত্ত্বেও সংঘটিত হবে। নবী-রসূলদের অগ্রিম সতর্ক বাণী বিশ্বাস করে সেই সময়ের জন্য পূর্বাহ্নেই প্রস্তুতি গ্রহণ করলে তোমরা নিজেদেরই কল্যাণ করবে এবং বিশ্বাস না করলে নিজেরাই নিজেদের দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে। না মানলে আখেরাতের আগমন থেমে থাকবে না এবং আল্লাহর ন্যায়ের বিধান অচল হয়ে যাবে না।

২০. অর্থাৎ আমার ক্ষমতা ও জ্ঞান ভিতর ও বাহির থেকে এমনভাবে মানুষকে পরিবেষ্টিত করে আছে যে, আমার ক্ষমতা ও জ্ঞান তার যতটা নিকটে ততটা নিকটে তার ঘাড়ের শিরাও নয়। তার কথা শোনার জন্য আমাকে কোথাও থেকে আসতে হয় না। তার মনের মধ্যে উদিত কল্পনাসমূহ পর্যন্ত আমি সরাসরি জানি। অনুরূপভাবে তাকে যদি কোন সময় পাকড়াও করতে হয় তখনও আমাকে কোথাও থেকে এসে তাকে পাকড়াও করতে হয় না। সে যেখানেই থাকুক, সর্বদা আমার আয়ত্বাধীনেই আছে যখন ইচ্ছা আমি তাকে বন্দী করবো।

২১. অর্থাৎ এক দিকে আমি নিজে সরাসরি মানুষের প্রতিটি গতিবিধি এবং চিন্তা ও কল্পনা সম্পর্কে অবহিত। অপর দিকে প্রত্যেক মানুষের জন্য দু'জন করে ফেরেশতা নিয়োজিত আছে যারা তার প্রত্যেকটি তৎপরতা লিপিবদ্ধ করছে। তার কোন কাজ ও কথাই তাদের রেকর্ড থেকে বাদ পড়ে না। অর্থাৎ আল্লাহর আদালতে যে সময় মানুষকে পেশ করা হবে তখন কে কি করে এসেছে সে বিষয়ে আল্লাহ নিজ থেকেই অবহিত থাকবেন। তাছাড়া সে বিষয়ে সাক্ষ দেয়ার জন্য এমন দু'জন সাক্ষীও উপস্থিত থাকবেন যারা তার কাজ-কর্মের লিখিত নথিভুক্ত প্রমাণাদি এনে সামনে পেশ করবেন। লিখিত এ প্রমাণাদি কেমন ধরনের হবে তার সঠিক ধারণা করা আমাদের জন্য কঠিন। তবে আজ আমাদের সামনে যেসব সত্য উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে তা দেখে এ বিষয়টি একেবারে নিশ্চিত মনে হয় যে, যে পরিবেশে মানুষ অবস্থান ও কাজ-কর্ম করে তাতে চতুর্দিকের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ওপর তার কণ্ঠস্বর, ছবি ও গতিবিধির ছাপ পড়ে যাচ্ছে। এসব জিনিসের প্রত্যেকটিকে পুনরায় হুবহু সেই আকার-আকৃতি ও স্বরে এমনভাবে পেশ করা যেতে পারে যে, আসল ও নকলের মধ্যে সামান্যতম পার্থক্যও থাকবে না। মানুষ যন্ত্রপাতির সাহায্যে এ কাজটি অত্যন্ত সীমিত মাত্রায় করছে। কিন্তু আল্লাহর ফেরেশতারা এসব যন্ত্রপাতিরও মুখাপেক্ষী নয়, এসব প্রতিবন্ধকতায়ও আবদ্ধ নয়। মানুষের নিজ দেহ এবং তার চারপাশের প্রতিটি জিনিস তাদের জন্য টেপ ও ফিল্ম স্বরূপ। তারা এসব টেপ ও ফিল্মের ওপর প্রতিটি শব্দ এবং প্রতিটি ছবি অতি সূক্ষ্ম ও খুঁটিনাটি বিষয়সহ অবিকল ধারণ করতে পারে এবং পৃথিবীতে ব্যক্তি যেসব কাজ করতো কিয়ামতের দিন তাকে তার নিজ কানে নিজ কণ্ঠস্বরে সেসব কথা শুনিয়ে দিতে পারে, নিজ চোখে তার সকল কর্মকাণ্ডের এমন জ্বলজ্যান্ত ছবি তাকে দেখিয়ে দিতে পারে যা অস্বীকার করা তার জন্য সম্ভব হবে না।

এখানে একথাটিও ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, আল্লাহ তা'আলা আখেরাতের আদালতে কোন ব্যক্তিকে কেবল নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে শাস্তি প্রদান করবেন না, বরং ন্যায় বিচারের সমস্ত পূর্বশর্ত পূরণ করে তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। এ কারণে দুনিয়াতেই প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত কথা ও কাজের পূর্ণাংগ রেকর্ড তৈরী করা হচ্ছে যাতে অনস্বীকার্য সাক্ষের ভিত্তিতে তার সমস্ত কর্মকাণ্ডের প্রমাণাদি পেশ করা যায়।

২২. পরম সত্য নিয়ে হাজির হওয়ার অর্থ হচ্ছে মৃত্যুর যন্ত্রণা সেই পরম সূচনা বিন্দু যেখান থেকে দুনিয়ার জীবনে পর্দার আড়ালে লুকানো মহাসত্য উন্মুক্ত হতে আরম্ভ করে। এ সময় মানুষ সেই জগতটিকে স্পষ্ট দেখতে পায় যার খবর নবী-রসূলগণ দিয়েছিলেন। তখন সে একথাও জানতে পারে যে, আখেরাত পুরোপুরি সত্য। জীবনের এ দ্বিতীয় পর্যায়ে সে সৌভাগ্যবান হিসেবে প্রবেশ করছে, না হতভাগ্য হিসেবে, সে সত্যও সে জানতে পারে।

২৩. অর্থাৎ এটা সেই চরম সত্য যা মানতে তুমি টালবাহানা করছিলে। তুমি পৃথিবীতে বন্ধনমুক্ত বলদের মত অবাধে বিচরণ করতে চাচ্ছিলে, আরো চাচ্ছিলে মৃত্যুর পরে যেন আর কোন জীবন না থাকে যেখানে তোমাকে নিজের সমস্ত কাজ-কর্মের পরিণতি ভোগ করতে হবে। এ কারণে তুমি আখেরাতের ধ্যান-ধারণা থেকে দূরে অবস্থান করতে এবং কোন সময় এ জগত বাস্তব রূপ লাভ করবে তা কোনক্রমেই মানতে প্রস্তুত ছিলে না। এখন দেখো, সেই আরেকটি জগতই তোমার সামনে বাস্তব হয়ে দেখা দিচ্ছে।

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿٢٣﴾ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٤﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾

প্রত্যেক ব্যক্তি এমন অবস্থায় এসে হাজির হলো যে, তাদের সাথে হাঁকিয়ে নিয়ে আসার মত একজন এবং সাক্ষ দেয়ার মত একজন ছিল।[২৫] এ ব্যাপারে তুমি অজ্ঞ ছিলে। তাই তোমার সামনে যে আবরণ ছিল তা আমি সরিয়ে দিয়েছি। তাই আজ তোমার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর।[২৬] তার সাথী বললো : এতো সে হাজির আমার ওপরে যার তদারকীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।[২৭] নির্দেশ দেয়া হলো : "জাহান্নামে নিক্ষেপ করো,[২৮] প্রত্যেক কট্টর কাফেরকে[২৯]—যে সত্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো, কল্যাণের প্রতিবন্ধক[৩০] ও সীমালংঘনকারী ছিল,[৩১] সন্দেহ সংশয়ে নিপতিত ছিল[৩২] এবং আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ বানিয়ে বসেছিল। নিক্ষেপ কর তাকে কঠিন আযাবে।[৩৩] তার সহগামী আরয করলো : হে প্রভু, আমি তাকে বিদ্রোহী করিনি বরং সে নিজেই চরম গোমরাহীতে ডুবে ছিল।[৩৪] জবাবে বলা হলো : আমার সামনে ঝগড়া করো না। আমি আগেই তোমাদেরকে মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিলাম।[৩৫] আমার কথার কোন রদবদল হয় না।[৩৬] আর আমি আমার বান্দাদের জন্য অত্যাচারী নই।[৩৭]

২৪. এর অর্থ শিংগার ফুৎকার। এ ফুৎকারের সাথে সাথে সমস্ত মৃত লোক দৈহিক জীবন পেয়ে পুনরায় উঠে দাঁড়াবে। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, টীকা ৪৭; ইবরাহীম, টীকা ৫৭; ত্বাহা, টীকা ৭৮; আল হাজ্জ, টীকা ১; ইয়াসীন, টীকা ৪৬ ও ৪৭; আয্ যুমার, টীকা ৭৯।

২৫. সম্ভবত এর দ্বারা সেই দু'জন ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে যারা পৃথিবীতে ঐ ব্যক্তির সমস্ত কথা ও কাজের রেকর্ড প্রস্তুত করতে নিযুক্ত ছিল। কিয়ামতের দিন সিংগায়

ফুৎকারের আওয়াজ উত্থিত হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক মানুষ যখন তার কবর থেকে উঠবে তৎক্ষণাৎ উক্ত দু' ফেরেশতা এসে তাকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে নিয়ে নেবে। একজন তাকে আল্লাহ তায়ালার আদালতের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে এবং অন্যজন তার 'আমলনামা' সাথে নিয়ে যাবে।

২৬. অর্থাৎ এখন তুমি খুব ভাল করেই দেখতে পাচ্ছ যে, আল্লাহর নবী তোমাকে যে খবর দিতেন তার সব কিছুই আজকে এখানে বিদ্যমান।

২৭. মুফাস্সিরদের কেউ কেউ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন এই যে, সাথী অর্থ ২১ আয়াতে বর্ণিত সাক্ষদাতা ফেরেশতা। সে বলবে ঃ এইতো এ ব্যক্তির 'আমলনামা' আমার কাছে প্রস্তুত আছে। অপর কিছু সংখ্যক মুফাস্সির বলেন ঃ যে শয়তান পৃথিবীতে তার সাথে অণুক্ষণ লেগেছিল সাথী অর্থ সেই শয়তান। সে বলবে, এ ব্যক্তি সে-ই যাকে আমি আমার কব্জায় রেখে জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত করেছি এখন সে আপনার সামনে হাজির। তবে কাতাদা ও ইবনে যায়েদ থেকে উদ্ধৃত ব্যাখ্যাই এর পূর্বাপর প্রসংগের সাথে সংগতিপূর্ণ। তারা বলেন, সাথী বলতে বুঝানো হয়েছে সে ফেরেশতাকে যে তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসবে এবং সে নিজেই আল্লাহর আদালতে হাজির হয়ে আরয করবে, এ ব্যক্তি আমার তত্ত্বাবধানে ছিল। এখন সে মহান প্রভুর দরবারে হাজির।

২৮. মূল আয়াতের বাক্যাংশ হচ্ছে أَلْقِيَا فِى جَهَنَّمَ "তোমরা দু'জন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।" বক্তব্যের ধারাবাহিকতাই বলে দিচ্ছে যে, কবর থেকে উঠতেই অপরাধীকে যে দু'জন ফেরেশতা গ্রেফতার করেছিলো এবং আদালতে হাজির করেছিলো তাদের লক্ষ করে এ নির্দেশ দেয়া হবে।

২৯. মূল আয়াতে كَفَّار শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটির দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে চরম অকৃতজ্ঞ। অপরটি হচ্ছে চরম সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।

৩০.আরবী ভাষায় خَير শব্দটি সম্পদ অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং কল্যাণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে, তারা নিজেদের অর্থ-সম্পদ থেকে বান্দা ও আল্লাহ কারো হকই আদায় করতো না। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে, তারা কল্যাণের পথ থেকে নিজেরাই যে কেবল বিরত থাকতো তাই নয়, বরং অন্যদেরকেও তা থেকে বিরত রাখতো। তারা পৃথিবীর কল্যাণের পথে বাধা হয়েছিলো। কোনভাবেই যেন কল্যাণ ও সুকৃতি বিস্তার লাভ করতে না পারে এ উদ্দেশ্যেই তারা তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করছিলো।

৩১. অর্থাৎ নিজের প্রতিটি কাজে নৈতিকতার সীমালংঘনকারী। নিজের স্বার্থ, উদ্দেশ্যাবলী ও আশা-আকাংখ্যার জন্য যে কোন কাজ করতে সে প্রস্তুত থাকতো। হারাম পন্থায় অর্থ-সম্পদ উপার্জন করতো এবং হারাম পথেই তা ব্যয় করতো। মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতো। না তার মুখ কোন বাধ্য-বাধকতায় সীমাবদ্ধ ছিল, না তার হাত কোন প্রকার জুলুম ও বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকতো। কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকেই সে যথেষ্ট মনে করতো না, বরং আরো অগ্রসর হয়ে সততা ও কল্যাণের পথের অনুসারীদেরকে সে উত্যক্ত করতো এবং কল্যাণের জন্য যারা কাজ করতো তাদের ওপর নির্যাতন চালাতো।

৩২. মূল আয়াতে مُرِيْب শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটির দু'টি অর্থ। এক, সন্দেহপোষণকারী। দুই, সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপকারী। এখানে দু'টি অর্থই গ্রহণীয়। অর্থাৎ নিজেও সন্দেহের মধ্যে পতিত ছিলো এবং অন্যদের মনেও সন্দেহ সৃষ্টি করতো। তার কাছে আল্লাহ, আখেরাত, ফেরেশতা, অহী এক কথায় ইসলামের সব সত্যই ছিল সন্দেহজনক। নবী–রসূলদের পক্ষ থেকে ন্যায় ও সত্যের যে কথাই পেশ করা হতো তার ধারণায় তা বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। তাই সে আল্লাহর অন্য বান্দাদের মধ্যেও এ রোগ ছড়িয়ে বেড়াতো। সে যার সাথেই মেলামেশার সুযোগ পেতো তার অন্তরেই কোন না কোন সন্দেহ এবং কোন না কোন দ্বিধা–সংশয় সৃষ্টি করে দিতো।

৩৩. যেসব বিষয় মানুষকে জাহান্নামের উপযুক্ত বানায় এ আয়াত ক'টিতে আল্লাহ তা'আলা সেগুলো নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছেন ঃ (১) সত্যকে অস্বীকার, (২) আল্লাহর প্রতি অকৃজ্ঞতা, (৩) সত্য ও সত্যপন্থীদের সাথে শত্রুতা, (৪) কল্যাণের পথের বাধা হয়ে দাঁড়ানো, (৫) নিজের অর্থ–সম্পদ দ্বারা আল্লাহ ও বান্দার হকসমূহ আদায় না করা, (৬) নিজের আচার আচরণে সীমালংঘন করা, (৭) মানুষের ওপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করা, (৮) ইসলামের বিধানসমূহের সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা, (৯) অন্যদের মনে সন্দেহ–সংশয় সৃষ্টি করা এবং (১০) প্রভুত্বে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা।

৩৪. এখানে বক্তব্যের ধরন থেকে স্বতঃই প্রকাশ পাচ্ছে যে, 'সাথী' অর্থ শয়তান—যে পৃথিবীতে তার পেছনে লেগেছিলো। বক্তব্যের ধরন থেকে একথারও ইংগিত পাওয়া যায় যে, ঐ ব্যক্তি ও তার শয়তান উভয়ে আল্লাহর আদালতে পরস্পর ঝগড়া করছে। সে বলছে, জনাব, এ জালেম আমার পেছনে লেগেছিলো এবং শেষপর্যন্ত সে–ই আমাকে পথভ্রষ্ট করে ক্ষান্ত হয়েছে। সুতরাং শাস্তি পাওয়া উচিত তার। শয়তান তার জবাবে বলছে ঃ জনাব, আমার তো তার ওপরে কোন হাত ছিল না যে, সে বিদ্রাহী হতে না চাইলেও আমি জোর করে তাকে বিদ্রাহী বানিয়ে দিয়েছি। এ দুর্ভাগার তো নিজেরই সৎকাজের প্রতি ঘৃণা এবং মন্দকাজের প্রতি আসক্তি ছিলো। তাই নবী–রসূলদের কোন কথাই তার মনোপুত হয়নি এবং আমার প্ররোচনায় সে ক্রমাগত বিপথগামী হয়েছে।

৩৫. অর্থাৎ তোমাদের দু'জনকেই আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম যে, তোমাদের মধ্যে যে অন্যকে বিভ্রান্ত করবে সে কি শাস্তি পাবে এবং যে বিভ্রান্ত হবে তাকে কি পরিণাম ভোগ করতে হবে। আমার এ সতর্কবাণী সত্ত্বেও তোমরা উভয়েই যখন অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত হওনি তখন এ মুহূর্তে ঝগড়া করে কি লাভ। এখন বিভ্রান্ত ও বিভ্রান্তকারী উভয়কে বিভ্রান্ত হওয়া ও বিভ্রান্ত করার শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে।

৩৬. অর্থাৎ আমার কাছে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোন নিয়ম নেই। তোমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপের যে নির্দেশ আমি দিয়েছি তা এখন প্রত্যাহার করা যেতে পারে না। তা ছাড়া বিপথগামী করার ও বিপথগামী হওয়ার শাস্তি আখেরাতে কি হবে সে বিষয়ে আমি পৃথিবীতে যে নিয়মের ঘোষণা দিয়েছিলাম তাও আর এখন পরিবর্তন করা যেতে পারে না।

৩৭. মূল আয়াতে ظَلاَّم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ চরম অত্যাচারী। একথার অর্থ এ নয় যে, আমি আমার বান্দার ব্যাপারে চরম অত্যাচারী নই বরং অত্যাচারী। এর অর্থ বরং এই যে, সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হয়ে যদি আমি আমার প্রতিপালিত সৃষ্টির ওপরে

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾

৩ রুকূ'

সেদিনের কথা স্মরণ করো, যখন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো যে, তোমার পেট কি ভরেছে? সে বলবে, "আরো কিছু আছে না কি?"[৩৮] আর বেহেশতকে আল্লাহভীরুদের নিকটতর করা হবে—তা মোটেই দূরে থাকবে না।[৩৯] তখন বলা হবে : এ হচ্ছে সেই জিনিস, যার কথা তোমাদেরকে আগাম জানানো হতো। এটা প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী[৪০] ও সংরক্ষণকারীর[৪১] জন্য, যে অদেখা দয়াময়কে ভয় করতো,[৪২] যে অনুরক্ত হৃদয় নিয়ে এসেছে।[৪৩] বেহেশতে ঢুকে পড় শান্তির সাথে।[৪৪] সেদিন অনন্ত জীবনের দিন হবে। সেখানে তাদের জন্য যা চাইবে তাই থাকবে। আর আমার কাছে আরো কিছু অতিরিক্ত জিনিসও থাকবে।[৪৫]

জুলুম করি সে ক্ষেত্রে আমি হবো চরম জালেম। তাই আমি আমার বান্দার ওপরে আদৌ কোন জুলুম করি না। যে শাস্তি তোমাকে আমি দিচ্ছি তা ঠিক ততখানি যার উপযুক্ত তুমি নিজেই নিজেকে বানিয়েছো। তোমার প্রাপ্য শাস্তির চাইতে সামান্য অধিক শাস্তিও তোমাকে দেয়া হচ্ছে না। আমার আদালত নির্ভেজাল ও পক্ষপাতহীন ইনসাফের আদালত। কোন ব্যক্তি এখানে এমন কোন শাস্তি পেতে পারে না আসলেই সে যার উপযুক্ত নয় এবং নিশ্চিত সাক্ষ দ্বারা যা প্রমাণ করা হয়নি।

৩৮. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, এখন আমার মধ্যে আর অধিক মানুষের স্থান সংকুলানের অবকাশ নেই। অপরটি হচ্ছে আরো যত অপরাধী আছে তাদের নিয়ে আসুন। প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে একথা থেকে যে ধারণা পাওয়া যায় তাহলো অপরাধীদেরকে এমন গাদাগাদি করে জাহান্নামে ভরা হয়েছে যে, সেখানে একটি সূঁচ পরিমাণ স্থানও আর অবশিষ্ট নেই। তাই জাহান্নামকে যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তোমার উদর কি পূর্ণ হয়েছে? তখন সে বিব্রত হয়ে জবাব দিচ্ছে এখনো কি আরো মানুষ আছে? দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলে মনে এরূপ একটি ধারণা সৃষ্টি হয় যে, সে সময় জাহান্নাম অপরাধীদের প্রতি এমন ভীষণভাবে রুষ্ট থাকবে যে, সে 'আরো কেউ আছে কি' বলে চাইতে থাকবে এবং সেদিন যেন কোন অপরাধী রেহাই না পায় তাই কামনা করবে।

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ তা'আলার এ প্রশ্ন এবং জাহান্নামের এ জবাবের ধরন কি হবে? এটা কি শুধু রূপক বর্ণনা? না কি বাস্তবে জাহান্নাম প্রাণ সত্তাধারী বাকশক্তিসম্পন্ন কোন বস্তু যাকে সম্বোধন করা যেতে পারে এবং সে–ও কথার জবাব দিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে অকাট্যভাবে কোন কিছু বলা যেতে পারে না। হতে পারে এটা একটা রূপক কথা। পরিস্থিতির সঠিক চিত্র তুলে ধরার জন্য প্রশ্নোত্তর আকারে জাহান্নামের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন কোন লোক যদি বলে, আমি গাড়ীকে বললাম তুমি চলছো না কেন? সে জবাব দিল; আমার মধ্যে পেট্রোল নেই। তবে এটাও পুরোপুরি সম্ভব যে, কথাটি বাস্তব ভিত্তিকই হবে। কারণ, পৃথিবীর যেসব জিনিস আমাদের কাছে অচেতন জড় পদার্থ এবং বাকশক্তিহীন সেসব জিনিস সম্পর্কে আমাদের এ ধারণা পোষণ করা ঠিক নয় যে, তা আল্লাহর কাছেও অবশ্যই তদ্রূপ অচেতন জড় ও বাকশক্তিহীন পদার্থ হবে। স্রষ্টা তাঁর প্রতিটি সৃষ্টির সাথে কথা বলতে পারেন এবং তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি তাঁর কথার জবাবও দিতে পারে। তার ভাষা আমাদের কাছে যতই দুর্বোধ্য হোক না কেন?

৩৯. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আদালতে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যেই মাত্র ফায়সালা হবে যে, সে মুত্তাকী এবং জান্নাতলাভের উপযুক্ত, তৎক্ষণাত সে তার সামনে জান্নাতকে বিদ্যমান পাবে। জান্নাত পর্যন্ত পৌছার জন্য তাকে কোন দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে না যে, তাকে পায়ে হেঁটে কিংবা কোন বাহনে বসে ভ্রমণ করে সেখানে পৌছতে হবে তাই ফায়সালার সময় ও জান্নাতে প্রবেশের সময়ের মধ্যে কিছু সময়ের ব্যবধান থাকবে। বরং একদিকে ফায়সালা হবে অন্যদিকে সে তখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে। যেন তাকে জান্নাতে পৌছানো হয়নি, জান্নাতকেই উঠিয়ে তার কাছে নিয়ে আসা হয়েছে। এ থেকেই অনুমান করা যায় যে, আখেরাতের স্থান ও কালের ধারণা আমাদের এ পৃথিবীর স্থান ও কালের ধারণা থেকে কতটা ভিন্ন হবে। দ্রুততা ও বিলম্ব এবং দূর ও নিকট সম্পর্কে এ পৃথিবীতে আমাদের যে জ্ঞান আছে সেখানে তা সবই অর্থহীন হবে।

৪০. মূল আয়াতে أَوَّابٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা অনেক ব্যাপক অর্থবহ। এর অর্থ এমন ব্যক্তি যে নাফরমানী এবং প্রবৃত্তির আকাংখা চরিতার্থ করার পথ পরিহার করে আনুগত্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ অবলম্বন করেছে, যে আল্লাহর পছন্দ নয় এমন প্রতিটি জিনিস পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহ যা পছন্দ করে তা গ্রহণ করে, বন্দেগীর পথ থেকে পা সামান্য বিচ্যুত হলেই যে বিচলিত বোধ করে এবং তাওবা করে বন্দেগীর পথে ফিরে আসে, যে অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের সমস্ত ব্যাপারে তাঁর স্মরণাপন্ন হয়।

৪১. মূল আয়াতে حفيظ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ "রক্ষাকারী"। এর দ্বারা এমন লোককে বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা, তাঁর ফরযসমূহ, হারামসমূহ এবং তার দায়িত্বে ন্যস্ত আমানতসমূহ রক্ষা করে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর আরোপিত অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করে, যে ঈমান এনে তার রবের সাথে যে চুক্তি ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে তা রক্ষা করে, যে তার শক্তি, শ্রম ও চেষ্টা–সাধনার পাহারাদারি করে যাতে এসবের কোনটি ভ্রান্ত কাজে নষ্ট না হয়, যে তাওবা করে তা রক্ষা

করে এবং তা ভঙ্গ হতে দেয় না, যে সর্বাবস্থায় আত্মসমালোচনা করে দেখতে থাকে যে, সে তার কথায় ও কাজে কোথাও তার রবের নাফরমানী তো করছে না?

৪২. অর্থাৎ সে কোথাও রহমান বা পরম দয়ালু আল্লাহর দেখা পেতো না এবং নিজের ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও কোনভাবেই তাঁকে অনুভব করতে পারতো না। তা সত্ত্বেও তাঁর নাফরমানী করতে সে ভয় পেতো। অন্যান্য অনুভূত শক্তি এবং প্রকাশ্যে দৃষ্টিগোচর হয় এমন সব শক্তি ও সত্তার তুলনায় তার মনে অদেখা রহমানের ভয় অধিক প্রবল ছিল। তিনি 'রহমান' বা দয়ালু একথা জানা সত্ত্বেও তাঁর রহমতের ভরসায় সে গোনাহর কাজে লিপ্ত হয়নি, বরং সবসময়ই তাঁর অসন্তুষ্টিকে ভয় পেয়েছে। এভাবে আয়াতটি ঈমানদার ব্যক্তির দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গুণের প্রতি ইংগিত করে। একটি হচ্ছে, অনুভূত ও দৃষ্টিগোচর না হওয়া সত্ত্বেও সে আল্লাহকে ভয় করে। অপরটি হচ্ছে, সে আল্লাহর রহমত গুণটি সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও গোনাহ করার দুঃসাহস করে না। এ দু'টি গুণই তাকে আল্লাহর কাছে মর্যাদার অধিকারী করে তোলে। তাছাড়াও এ আয়াতের মধ্যে আরো একটি সূক্ষ্ম বিষয়ও আছে যা ইমাম রাযী বর্ণনা করেছেন। বিষয়টি হচ্ছে, আরবী ভাষায় ভয় বুঝাতে خوف ও خشيت এ দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ দু'টি শব্দের অর্থে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। خوف শব্দটি সাধারণত এমন ভয় বুঝাতে ব্যবহৃত হয় যা কারো শক্তির সামনে নিজের দুর্বলতার অনুভূতির কারণে নিজের মধ্যে সৃষ্টি হয়। আর خشيت বলা হয় এমন ভীষণ ভয়কে যা কারো বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা থেকে মানুষের মনে সৃষ্টি হয়। এখানে خوف এর পরিবর্তে خشيت শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, শুধু শাস্তির আশংকায়ই মু'মিন বান্দার অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয় না। তার চেয়েও বড় জিনিস অর্থাৎ আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব ও মর্যাদার অনুভূতি সবসময় তার মনে এক ভয়ানক ভীতিভাব জাগিয়ে রাখে।

৪৩. মূল কথাটি হচ্ছে قلب منيب নিয়ে এসেছে। منيب শব্দটির উৎপত্তি انابت থেকে যার অর্থ একদিকে মুখ করা এবং বারবার সেদিকেই ফিরে যাওয়া। যেমন কম্পাসের কাঁটা সবসময় মেরুর দিকেই মুখ করে থাকে। আপনি তাকে যতই নাড়া চাড়া বা ঝাঁকুনি দেন না কেন তা ঘুরে ফিরে মেরুর দিকে চলে আসে। অতএব قلب منيب অর্থ এমন হৃদয়-মন যা সব দিক থেকে এক আল্লাহর দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। অতপর সারা জীবন তার ওপর যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন তাতে সে বার বার তাঁর দিকেই ফিরে এসেছে। এ বিষয়টাকেই আমরা "অনুরক্ত মন" কথাটি দিয়ে ব্যক্ত করেছি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর কাছে প্রকৃত সম্মানের অধিকারী সে ব্যক্তি যে শুধু মুখে নয় বরং পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে সরল মনে তাঁর একান্ত আপনজন হয়ে যায়।

৪৪. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ। سَلَامٌ শব্দটিকে যদি নিরাপত্তা অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার অর্থ হবে, সব রকম দুঃখ, দুশ্চিন্তা, চিন্তা ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ হয়ে এ জান্নাতে প্রবেশ করো। তবে যদি শান্তি অর্থেই গ্রহণ করা হয় তাহলে অর্থ হবে, এ জান্নাতে এসো, আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে তোমাকে সালাম।

যে গুণাবলী থাকলে কোন ব্যক্তি জান্নাতলাভের উপযুক্ত হয় এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সে গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। ঐগুলো হচ্ছে : (১) তাকওয়া, (২) আল্লাহর

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ﴿٣٨﴾ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴿٤٠﴾

আমি তাদের আগে আরো বহু জাতিকে ধ্বংস করেছি। তারা ওদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিধর ছিল এবং তারা সারা দুনিয়ার দেশগুলো তন্ন তন্ন করে ঘুরেছে।[৪৬] *অথচ তারা কি কোন আশ্রয়স্থল পেলো?*[৪৭] *যাদের হৃদয় আছে কিংবা যারা একাগ্র চিত্তে কথা শোনে*[৪৮] *তাদের জন্য এ ইতিহাসে অনেক শিক্ষা রয়েছে।*

আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যকার সকল জিনিসকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি।[৪৯] *অথচ তাতে আমি ক্লান্ত হইনি। কাজেই তারা যেসব কথা তৈরী করছে তার ওপর ধৈর্যধারণ করো।*[৫০] *আর স্বীয় প্রভুর প্রশংসা সহকারে গুণগান করতে থাকো সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে, আবার রাতে পুনরায় তার গুণগান করো এবং সিজ্‌দা দেয়ার পরেও করো।*[৫১]

দিকে প্রত্যাবর্তন, (৩) আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্কের সযত্ন পাহারাদারী, (৪) আল্লাহকে না দেখে এবং তাঁর ক্ষমা পরায়ণতায় বিশ্বাসী হয়েও তাঁকে ভয় করা এবং (৫) অনুরক্ত হৃদয়-মন নিয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছা অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত অনুরক্ত থাকার আচরণ করে যাওয়া।

৪৫. অর্থাৎ তারা যা চাইবে তাতো পাবেই। কিন্তু আমি তাদেরকে আরো এমন কিছু দেব যা পাওয়ার আকাংখা পোষণ করা তো দূরের কথা তাদের মন-মগজে তার কল্পনা পর্যন্ত উদিত হয়নি।

৪৬. অর্থাৎ তারা শুধু নিজেদের দেশেই শক্তিমান ছিল না পৃথিবীর অন্য অনেক দেশেও প্রবেশ করে দখল জমিয়েছিলো এবং ভূপৃষ্ঠের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাদের লুট-তরাজের অপকর্ম বিস্তার লাভ করেছিলো।

৪৭. অর্থাৎ যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে পাকড়াও করার সময় সমুপস্থিত হলো তখন কি তাদের শক্তি তাদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলো? পৃথিবীতে কোথাও

কি তারা আশ্রয় লাভ করেছিলো? তাহলে কোন্ ভরসায় তোমরা এ আশা পোষণ করো যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তোমরা কোথাও আশ্রয় পেয়ে যাবে?

৪৮. অন্য কথায় যাদের নিজেদের অন্তত এতটুকু বিবেক-বুদ্ধি আছে যে সঠিক চিন্তা করতে পারে কিংবা উদাসীনতা ও পক্ষপাত থেকে এতটা পবিত্র ও মুক্ত যে, যখন অন্য কেউ তাকে প্রকৃত সত্য বুঝায় তখন একাগ্রভাবে তার কথা শোনো। এমনভাবে নয় যে, শ্রোতার মন–মগজ অন্য দিকে ব্যস্ত থাকায় উপদেশদাতার কথা কানের পর্দার ওপর দিয়েই চলে যায়।

৪৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হা–মীম আস সাজদার তাফসীর, টীকা ১১ থেকে ১৫ পর্যন্ত।

৫০. অর্থাৎ প্রকৃত ব্যাপার হলো, আমি গোটা এ বিশ্ব–জাহান মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং তা সৃষ্টি করে আমি ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়িনি যে, পুনরায় তা সৃষ্টি করার সাধ্য আর আমার নেই। এখন এসব নির্বোধরা যদি তোমার কাছে মৃত্যুর পরের জীবনের খবর শুনে তোমাকে বিদ্রূপ করে এবং পাগল বলে আখ্যায়িত করে তাহলে ধৈর্য অবলম্বন করো। ঠাণ্ডা মাথায় এদের প্রতিটি অর্থহীন কথা শোন এবং তোমাকে যে সত্যটি পেশ করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে তা পেশ করতে থাকো।

এ আয়াতে আনুষঙ্গিকভাবে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি একটি সূক্ষ্ম বিদ্রূপও প্রচ্ছন্ন আছে। কারণ, ইহুদী ও খৃষ্টানদের বাইবেলে এ কল্পকাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ছয় দিনে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছেন (আদিপুস্তক, ২ঃ২)। বর্তমানে যদিও খৃষ্টান পাদরীরা এতে লজ্জাবোধ করতে শুরু করেছে এবং তারা পবিত্র বাইবেলের উর্দূ অনুবাদে 'বিশ্রাম নিয়েছেন'কে 'বিরত হয়েছেন' কথায় পরিবর্তন করেছে। তা সত্ত্বেও কিং জেমসের নির্ভরযোগ্য ইংরেজী বাইবেলে (And he rested on seventh day) কথাটি স্পষ্ট বর্তমান আছে। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ইহুদীরা ফিলাডেলফিয়া থেকে যে অনুবাদ প্রকাশ করেছে তাতেও একথাটি আছে। আরবী অনুবাদেও فَاسْتَرَحَ فِى الْيَوْمِ السَّابِعِ কথাটি আছে।

৫১. এটাই সেই পন্থা যার মাধ্যমে মানুষ ন্যায় ও সত্যের জন্য আন্দোলনে মর্মান্তিক ও নিদারুণ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার এবং নিজের চেষ্টা–সাধনার সুফল অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সারা জীবন ন্যায় ও সত্যের বাণী সমুন্নত করার এবং পৃথিবীকে কল্যাণের পথে আহবান জানানোর ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার শক্তি অর্জন করতে পারে। এখানে রবের প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা অর্থ নামায। কুরআন মজীদের যেখানেই প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করাকে নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত করে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেই এর অর্থ হয়ে থাকে নামায। "সূর্যোদয়ের পূর্বে" ফজরের নামায। "সূর্যাস্তের পূর্বে দু'টি নামায আছে। একটি যোহরের নামায এবং অপরটি আসরের নামায" রাতে আছে মাগরিব ও এশার। তাছাড়া তৃতীয় আরেকটি নামায হিসেবে তাহাজ্জুদের নামাযও রাতের তাসবীহর অন্তরভুক্ত। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, সূরা বানী ইসরাঈল, টীকা ৯১ থেকে ৯৭ পর্যন্ত। ত্বাহা, টীকা ১১১; আর রূম, টীকা ২৩ ও ২৪। তাছাড়া সিজদা শেষ করার পরে যে তাসবীহ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার অর্থ

নামাযের পরের যিকরও হতে পারে এবং ফরযের পরে নফল নামায আদায় করাও হতে পারে। হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত হাসান ইবনে আলী, হযরত আবু হুরাইরা, ইবনে আব্বাস, শা'বী, মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান বাসরী, কাতাদা, ইবরাহীম নাখয়ী' ও আওযায়ী এর অর্থ বলেছেন মাগরিবের পরের দু' রাকআত নামায। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস এবং অপর একটি রেওয়ায়াত অনুসারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ধারণাও এই যে, এর অর্থ নামাযের পরের যিকর। ইবনে যায়েদ বলেন, একথার উদ্দেশ্য হচ্ছে ফরযের পরেও নফল আদায় করা হোক।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার গরীব মুহাজিররা এসে বললো হে আল্লাহর রাসূল, বড় বড় মর্যাদা তো বিত্তবান লোকেরাই লুফে নিল। নবী (সা) বললেন ঃ কি হয়েছে? তারা বললো ঃ আমরা যেমন নামায পড়ি বিত্তবান লোকেরাও তেমনি নামায পড়ে। আমরা যেমন রোযা রাখি তারাও তেমনি রোযা রাখে। কিন্তু তারা দান করে আমরা দান করতে পারি না এবং তারা ক্রীতদাস মুক্ত করে আমরা করতে পারি না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন কাজ বলে দেব, যা করলে তোমরা অন্য লোকদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যাবে? তবে যারা সে কাজটিও করবে তাদেরকে বাদ দিয়ে। সে কাজটি হচ্ছে তোমরা প্রত্যেক নামাযের পরে ৩৩ বার করে 'সুবহানাল্লাহ' 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' বলো। কিছুদিন পরে তারা এসে বললো, এ আমলের কথা আমাদের বিত্তবান ভাইয়েরাও শুনেছে এবং তারাও এ আমল করতে শুরু করেছে। একথা শুনে তিনি বললেন ঃ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء । একটি রেওয়ায়াতে এ তাসবীহর সংখ্যা ৩৩ বারের পরিবর্তে দশবার করে পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে প্রত্যেক নামাযের পরে ৩৩ বার করে সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়তে বলেছিলেন। পরে এক আনসারী বলেছিলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি কেউ যেন আমাকে বলছে যদি তুমি এ তিনটি তাসবীহ ২৫ বার করে পড় এবং তারপর ২৫ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড় তাহলে অধিক উত্তম হবে। নবী (সা) বললেন ঃ ঠিক আছে, সেভাবেই করতে থাকো। (আহমাদ, নাসায়ী, দারেমী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শেষ করে বসতেন তখন আমি তাঁকে এ দোয়া পড়তে শুনতাম ঃ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (احكام القران للجصاص)

এ ছাড়াও নামাযের পরবর্তী যিকরের আরো কতিপয় পন্থা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে। যারা কুরআন মজীদের এ নির্দেশনা অনুসারে আমল করতে ইচ্ছুক তারা যেন হাদীসগ্রন্থ মিশকাতের আয যিকর বা'দাস সালাত অনুচ্ছেদ থেকে নিজের সবচেয়ে মনমত একটি দোয়া বেছে নেয় এবং সেটি আমল করে।

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٤﴾ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ ۖ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥﴾

আর শোনো যেদিন আহবানকারী (প্রত্যেক মানুষের) নিকট স্থান থেকে আহবান করবে,[৫২] যেদিন সকলে হাশরের কোলাহল ঠিকমত শুনতে পাবে,[৫৩] সেদিনটি হবে কবর থেকে মৃতদের বেরুবার দিন। আমিই জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু ঘটাই। এবং আমার কাছেই সবাইকে ফিরে আসতে হবে সেদিন—যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে, এবং লোকেরা তার ভেতর থেকে বেরিয়ে জোর কদমে ছুটতে থাকবে, এরূপ হাশর সংঘটিত করা আমার নিকট খুবই সহজ।[৫৪] হে নবী ! ওরা যেসব কথা বলে, তা আমি ভালো করেই জানি,[৫৫] বস্তুত তাদের কাছ থেকে বলপ্রয়োগে আনুগত্য আদায় করা তোমার কাজ নয়। কাজেই তুমি এ কুরআন দ্বারা আমার হুশিয়ারীকে যারা ডরায়, তাদেরকে তুমি উপদেশ দাও।[৫৬]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের বর্ণিত দোয়ার চাইতে ভাল দোয়া আর কি হতে পারে? তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, দোয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট কিছু শব্দ মুখে উচ্চারণ করাই নয়। বরং ঐ সব শব্দে যে অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে মন-মগজে তা দৃঢ় ও বদ্ধমূল করা। তাই যে দোয়াই করা হোক না কেন ভাল করে তার অর্থ বুঝে নিতে হবে এবং তা মনে রেখেই দোয়া পড়তে হবে।

৫২. অর্থাৎ যেখানেই যে ব্যক্তি মরে পড়ে থাকবে কিংবা পৃথিবীতে যেখানেই তার মৃত্যু সংঘটিত হয়েছিল সেখানেই তার কাছে আল্লাহর ঘোষকের এ আওয়াজ পৌছবে যে, উঠ এবং তোমার রবের কাছে হিসেব দেয়ার জন্য চলো। এ আওয়াজ হবে এমন যে, ভূপৃষ্ঠের আনাচে-কানাচে যেখানেই যে ব্যক্তি জীবিত হয়ে উঠবে সেখানেই সে মনে করবে যে, আহবানকারী নিকটেই কোথাও থেকে তাকে আহবান করেছে। একই সময়ে গোটা পৃথিবীর সব জায়গায় সমানভাবে এ আওয়াজ শোনা যাবে। এ থেকেও কিছুটা অনুমান করা যায় যে, আখিরাতের স্থান ও কাল বর্তমানে আমাদের এ পৃথিবীর স্থান ও কালের তুলনায় কতটা পরিবর্তিত হবে এবং সেখানে কেমন সব শক্তি কি ধরনের আইনানুসারে তৎপর ও সক্রিয় থাকবে।

৫৩. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ । এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, সমস্ত মানুষই মহাসত্য সম্পর্কিত আহবান শুনতে পাবে। অপর অর্থটি হচ্ছে হাশরের কলরব ঠিকমতই শুনতে পাবে। প্রথম অর্থ অনুসারে বক্তব্যের সারমর্ম দাঁড়ায়, মানুষ নিজ কানে সেই মহাসত্যের আহবান শুনতে পাবে যা তারা পৃথিবীতে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না, যা অস্বীকার করতে তাদের ছিল চরম একগুঁয়েমী এবং যার সংবাদদাতা নবী–রসূলদের তারা বিদ্রূপ করতো। দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে এর প্রতিপাদ্য বিষয় দাঁড়ায় এই যে, নিশ্চিতভাবেই তারা হাশরের কলরব–কোলাহল শুনবে, তারা নিজেরাই জানতে পারবে, এটা কোন কাল্পনিক বিষয় নয়, বরং প্রকৃতই হাশরের কলরব–কোলাহল। ইতিপূর্বে তদেরকে যে হাশরের খবর দেয়া হয়েছিলো তা যে সত্যিই এসে হাজির হয়েছে এবং এই যে তারই শোরগোল উত্থিত হচ্ছে সে ব্যাপারে তাদের কোন সন্দেহই থাকবে না।

৫৪. তিন নম্বর আয়াতে কাফেরদের যে কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে এটা তারই জবাব। তারা বলতো, আমরা যখন মরে মাটিতে মিশে যাবো তখন আমাদেরকে আবার জীবিত করে উঠানো হবে তা কি করে হতে পারে! এভাবে পুনরুত্থান তো অসম্ভব ও অযৌক্তিক। তাদের এ বক্তব্যের জবাবে বলা হয়েছে, এ হাশর অর্থাৎ একই সময়ে আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে জীবিত করে একত্রিত করা আমার জন্য একেবারেই সহজ। কোন ব্যক্তির মাটি কোথায় পড়ে আছে তা জানা আমার জন্য আদৌ কোন কঠিন ব্যাপার নয়। এসব বিক্ষিপ্ত অণু–পরমাণুর মধ্যে কোন্‌গুলো যায়েদের আর কোন্‌গুলো বকরের তা জানতেও আমার কোন কষ্ট হবে না। এসব অণু–পরমাণুকে আলাদাভাবে একত্রিত করে একেকজন মানুষের দেহ পুনরায় তৈরী করা এবং ঐ দেহে হুবহু আগের ব্যক্তিত্ব নতুনভাবে সৃষ্টি করে দেয়া আমার জন্য কোন শ্রমসাধ্য ব্যাপার নয়, বরং আমার একটি মাত্র ইংগিতেই তৎক্ষণাৎ তা হতে পারে। আদমের সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ সৃষ্টি হয়েছে আমার একটি মাত্র আদেশে তারা সবাই অতি সহজে সমবেত হতে পারে। তোমাদের অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধি–বিবেক একে অসম্ভব মনে করলে মনে করুক। বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টার ক্ষমতার কাছে তা অসম্ভব নয়।

৫৫. এ আয়াতাংশে যুগপৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সান্ত্বনা এবং কাফেরদের জন্য হুমকি বিদ্যমান। নবীকে (সা) উদ্দেশ করে বলা হচ্ছে যে, এসব লোক তোমার বিরুদ্ধে যেসব মিথ্যা রটনা করছে মোটেই তার পরোয়া করো না। আমি সবকিছু শুনছি। তাদের সাথে বুঝা পড়া করা আমার কাজ। কাফেরদের হুঁশিয়ার করে দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা আমার নবীর বিরুদ্ধে যেসব বিদ্রূপাত্মক উক্তি করছো সে জন্য তোমাদেরকে অনেক মূল্য দিতে হবে। আমি নিজে প্রতিটি কথা শুনছি। তোমাদেরকে তার মাশুল দিতে হবে।

৫৬. এর অর্থ এ নয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জোর করে নিজের কথা মানুষকে মানাতে চাইতেন কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা থেকে তাঁকে বিরত রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে নবীকে (সা) সম্বোধন করে কাফেরদের একথা শুনানো হচ্ছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমাদের কাছে আমার নবীকে শক্তি প্রয়োগকারী করে পাঠানো হয়নি। তোমাদেরকে জোর করে মু'মিন বানানো তার কাজ নয় যে, তোমরা মানতে না চাইলেও

তিনি তোমাদেরকে তা মানতে বাধ্য করবেন। তাঁর দায়িত্ব কেবল এতটুকু যে, সাবধান করে দিলে যারা সতর্ক হয়ে যাবে তিনি তাদেরকে কুরআন শুনিয়ে প্রকৃত সত্য বুঝিয়ে দেবেন। এরপরও যদি তোমরা না মানো তাহলে নবী তোমাদের সাথে বুঝাপড়া করবেন না, বরং আমি নিজে তোমাদের সাথে বুঝাপড়া করবো।

আয যারিয়াত

৫১

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ وَالذَّارِيَاتِ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যা الذَّارِيَاتِ শব্দ দ্বারা শুরু হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গী থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসলামী আন্দোলনের মোকাবিলা অস্বীকৃতি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও মিথ্যা অভিযোগ আরোপের মাধ্যমে অত্যন্ত জোরে শোরেই করা হচ্ছিলো ঠিকই কিন্তু তখনো জুলুম ও নিষ্ঠুরতার যাঁতাকলে নিষ্পেষণ শুরু হয়নি, ঠিক সেই যুগে এ সূরাটি নাযিল হয়েছিলো। এ কারণে যে যুগে সূরা ক্বাফ নাযিল হয়েছিলো এটিও সে যুগের নাযিল হওয়া সূরা বলে প্রতীয়মান হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর অধিকাংশটাই জুড়ে আছে আখেরাত সম্পর্কিত আলোচনা এবং শেষভাগে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে। সাথে সাথে মানুষকে এ বিষয়েও হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে যে, নবী-রসূলদের (আ) কথা না মানা এবং নিজেদের জাহেলী ধ্যান-ধারণা আকড়ে ধরে একগুঁয়েমি করা সেসব জাতির নিজেদের জন্যই ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়েছে যারা এ নীতি অবলম্বন করেছিলো।

এ সূরার ছোট ছোট কিন্তু অত্যন্ত অর্থপূর্ণ আয়াতসমূহে আখেরাত সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে, মানব জীবনের পরিণাম ও পরিণতি সম্পর্কে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করে। এটাই প্রমাণ করে যে, এসব আকীদা-বিশ্বাসের কোনটিই জ্ঞানগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রত্যেকেই নিজের অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে নিজনিজ অবস্থানে যে মতবাদ গড়ে নিয়েছে সেটাকেই সে তার আকীদা-বিশ্বাস বানিয়ে আঁকড়ে ধরেছে। কেউ মনে করে নিয়েছে, মৃত্যুর পরে কোন জীবন হবে না। কেউ আখেরাত মানলেও জন্মান্তর বাদের ধারণা সহ মেনেছে। কেউ আখেরাতের জীবন এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা বিশ্বাস করলেও কর্মের প্রতিফল থেকে বাঁচার জন্য নানা রকমের সহায় ও অবলম্বন কল্পনা করে নিয়েছে। যে বিষয়ে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত ভুল হলে তার গোটা জীবনকেই ব্যর্থ এবং চিরদিনের জন্য তার ভবিষ্যতকে ধ্বংস

করে দেয় এমন একটি বড় ও সর্বাধিক গুরুত্ববহ মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান ছাড়া শুধু অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোন আকীদা-বিশ্বাস গড়ে নেয়া একটি সর্বনাশা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। এর অর্থ হলো, মানুষ একটি বড় ভ্রান্তিতে ডুবে থেকে গোটা জীবন জাহেলী ঔদাসীন্যে কাটিয়ে দেবে এবং মৃত্যুর পর হঠাৎ এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে যার জন্য সে আদৌ প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি। এরূপ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটিই মাত্র পথ আছে, তা হচ্ছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবী আখেরাত সম্পর্কে যে জ্ঞান দান করছেন সে বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ধীর মস্তিষ্কে গভীরভাবে ভেবে দেখবে এবং আসমান ও যমীনের ব্যবস্থাপনা এবং নিজের সত্তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে উন্মুক্ত চোখে দেখবে যে, চার পাশে সেই জ্ঞানটির যথার্থতার স্বপক্ষে প্রমাণ বিদ্যমান আছে কিনা? এ ক্ষেত্রে বাতাস ও বৃষ্টির ব্যবস্থাপনা, পৃথিবীর গঠনাকৃতি এবং তার সৃষ্টিকূল, মানুষ নিজে, আসমানের সৃষ্টি এবং পৃথিবীর সকল বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করাকে আখেরাতের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে এবং মানবেতিহাস থেকে উদাহরণ পেশ করে বলা হয়েছে যে, একটা কর্মফল ব্যবস্থা থাকা যে অত্যাবশ্যক এটা এ বিশ্ব-সাম্রাজ্যের স্বভাব-প্রকৃতির স্বতস্ফূর্ত দাবী বলেই প্রতীয়মান হয়।

এরপর অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করে বলা হয়েছে তোমাদের স্রষ্টা তোমাদেরকে অন্যদের বন্দেগী ও দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেননি, বরং নিজের বন্দেগী ও দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের মিথ্যা উপাস্যদের মত নন। তোমাদের মিথ্যা উপাস্যরা তোমাদের থেকে রিযিক গ্রহণ করে এবং তোমাদের সাহায্য ছাড়া তাদের প্রভুত্ব অচল। তিনি এমন উপাস্য যিনি সবার রিযিকদাতা। তিনি কারো নিকট থেকে রিযিক গ্রহণের মুখাপেক্ষী নন এবং নিজ ক্ষমতাবলেই তার প্রভুত্ব চলছে।

এ প্রসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, যখনই নবী-রসূলদের বিরোধিতা করা হয়েছে, তা যুক্তির ভিত্তিতে না করে একগুঁয়েমি, হঠকারিতা এবং জাহেলী অহংকারের ভিত্তিতে করা হয়েছে। ঠিক যেমনটি আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে করা হচ্ছে। অথচ এর উৎস ও চালিকা শক্তি বিদ্রোহাত্মক মনোভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। অতপর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন তিনি এসব বিদ্রোহীদের আদৌ ভ্রূক্ষেপ না করেন এবং নিজের দাওয়াত ও নসীহতের কাজ চালিয়ে যান। কারণ, তা এ লোকদের কোন উপকারে না আসলেও ঈমানদারদের জন্য অবশ্যই উপকারে আসবে। কিন্তু যেসব জালেম তাদের বিদ্রোহের ওপর অটল তাদের প্রাপ্য শাস্তি প্রস্তুত হয়ে আছে। কারণ, তাদের পূর্বে এ নীতি ও আচরণ অবলম্বনকারী জালেমরাও তাদের প্রাপ্য আযাব পুরোপুরি লাভ করেছে।

আয়াত ৬০ — **সূরা আয যারিয়াত–মক্কী** — রুকূ' ৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ۝١ فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۝٢ فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۝٣ فَالْمُقَسِّمٰتِ أَمْرًا ۝٤ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۝٥ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۝٦ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝٧ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝٨ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۝٩

শপথ সে বাতাসের যা ধূলাবালি উড়ায়। আবার পানি ভরা মেঘরাশি বয়ে নিয়ে যায়[১] তারপর ধীর মৃদুমন্দ গতিতে বয়ে যায়। অতপর একটি বড় জিনিস (বৃষ্টি) বন্টন করে।[২] প্রকৃত ব্যাপার হলো, তোমাদেরকে যে জিনিসের ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে[৩] তা সত্য। কর্মফল প্রদানের সময় অবশ্যই আসবে।[৪]

শপথ বিবিধ আকৃতি ধারণকারী আসমানের।[৫] (আখেরাত সম্পর্কে) তোমাদের কথা পরস্পর ভিন্ন।[৬] তার ব্যাপারে সে–ই বিরক্ত যে হকের প্রতি বিমুখ।[৭]

১. এ ব্যাপারে সমস্ত তাফসীরকার একমত যে, الذاريات অর্থ বিক্ষিপ্তকারী ও ধূলাবালি ছড়ানো বাতাস এবং الحملت وقرا (ভারী বোঝা বহনকারী) অর্থ সেই বাতাস যা সমুদ্র থেকে লক্ষ কোটি গ্যালন বাষ্প মেঘের আকারে বহন করে আনে। হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, হাসান বাসরী, কাতাদা ও সুদ্দী প্রমুখ মুফাস্‌সিরগণের থেকে বর্ণত হয়েছে।

২. اَلْجَارِيَات يُسْرًا ও اَلْمُقَسِّمٰت اَمْرًا এর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ এ কথাটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন বা এ অর্থ গ্রহণ করা জায়েয মনে করেছেন যে, এ দু'টি বাক্যাংশের অর্থও বাতাস। অর্থাৎ এ বাতাসই আবার মেঘমালা বহন করে নিয়ে যায় এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর নির্দেশানুসারে যেখানে যতটুকু বর্ষণের নির্দেশ দেয়া হয় ততটুকু পানি বন্টন করে। আরেক দল اَلْجَارِيَات يُسْرًا আয়াতাংশের অর্থ করেছেন দ্রুতগতিশীল নৌকাসমূহ এবং اَلْمُقَسِّمٰت اَمْرًا অর্থ করেছেন সেসব ফেরেশতা যারা আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাঁর সমস্ত সৃষ্টির জন্য বরাদ্দকৃত জিনিস তাদের মধ্যে বন্টন করে। একটি রেওয়ায়াত অনুসারে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ দু'টি আয়াতাংশের এ অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন, আমি এ

অর্থ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে না শুনে থাকলে বর্ণনা করতাম না। এর ওপর ভিত্তি করে আল্লামা আলূসী এ ধারণা প্রকাশ করেন যে, এটি ছাড়া এ আয়াতাংশ দু'টির আর কোন অর্থ গ্রহণ করা জায়েয নয়। যারা অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করেছেন তারা অনর্থক দুঃসাহস দেখিয়েছেন। কিন্তু হাফেয ইবনে কাসীর বলেন, এ রেওয়ায়াতের সনদ দুর্বল এবং এর ওপর ভিত্তি করে অকাট্যভাবে বলা যায় না যে, নবী (সা) সত্যিই এসব আয়াতাংশের এ ব্যাখ্যাই বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, সাহাবা ও তাবেয়ীদের একটি উল্লেখযোগ্য দল কর্তৃক এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাফসীরকারদের বড় দল প্রথম তাফসীরটিও বর্ণনা করেছেন। আর কথার ধারাবাহিকতার সাথে এ অর্থটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। শাহ রাফীউদ্দিন সাহেব, শাহ আবদুল কাদের সাহেব এবং মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবও তাঁদের অনুবাদে প্রথম অর্থটিই গ্রহণ করেছেন।

৩. মূল আয়াতে تُوعَدُونَ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি যদি মূল ধাতু وَعد থেকে গঠিত হয়ে থাকে তাহলে তার অর্থ হবে তোমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে, আর যদি وعِيد থেকে গঠিত হয়ে থাকে তাহলে অর্থ হবে, "তোমাদেরকে যে জিনিসের ভয় দেখানো হচ্ছে।" ভাষাগতভাবে দু'টি অর্থই যথাযথ ও নির্ভুল। কিন্তু প্রয়োগ ক্ষেত্রের সাথে দ্বিতীয় অর্থটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, যারা কুফর, শিরক ও পাপাচারে ডুবে ছিল এবং কখনো নিজ কৃতকর্মের প্রতিফল পেতে হবে এবং সে জন্য জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে একথা মানতে প্রস্তুত ছিল না এখানে তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। এ কারণে আমরা تُوعَدُونَ শব্দটিকে প্রতিশ্রুতি অর্থে গ্রহণ না করে ভীতি অর্থে গ্রহণ করেছি।

৪. এটাই সেই মূল কথা যে জন্য শপথ করা হয়েছে। এ শপথের অর্থ হচ্ছে, যে নজিরবিহীন শৃংখলা ও নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে বৃষ্টিপাতের এ মহা ব্যবস্থাপনা তোমাদের চোখের সামনে চলছে এবং তার মধ্যে যে যুক্তি, কৌশল ও উদ্দেশ্য সক্রিয় দেখা যাচ্ছে তা প্রমাণ করছে যে, এ পৃথিবী কোন উদ্দেশ্যহীন ও অনর্থক বালু মাটির খেলাঘর নয় যেখানে লক্ষ কোটি বছর থেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে অতি বড় একটা খেলা চলছে, বরং প্রকৃতপক্ষে এটা একটা পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা যেখানে প্রতিটি কাজ কোন না কোন উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা সামনে রেখে হচ্ছে। এ ব্যবস্থাপনায় কোনক্রমেই এটা সম্ভব নয় যে, এখানে মানুষের মত একটা সৃষ্টিকে বিবেক বুদ্ধি, চেতনা-বিবেচনা, বাছ-বিচার কর্মের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব খাটানোর অধিকার দিয়ে তার মধ্যে ভাল ও মন্দের নৈতিক অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং তাকে সব রকম ন্যায় ও অন্যায় এবং ভুল ও নির্ভুল কাজ করার সুযোগ দিয়ে পৃথিবীতে যথেচ্ছা আচরণ করার জন্য একেবারে উদ্দেশ্যহীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাকে কখনো একথা জিজ্ঞেস করা হবে না যে, তাকে যে মন-মগজ ও দৈহিক শক্তি দেয়া হয়েছিল, পৃথিবীতে কাজ করার জন্য যে ব্যাপক উপায়-উপকরণ তার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল এবং আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টির ওপর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব খাটানোর যেসব ইখতিয়ার তাকে দেয়া হয়েছিল তা সে কিভাবে ব্যবহার করেছে। যে বিশ্ব-ব্যবস্থায় সবকিছুর পেছনেই একটা উদ্দেশ্য কার্যকর সেখানে শুধু মানুষের মত একটি মহাসৃষ্টির আবির্ভাব কিভাবে উদ্দেশ্যহীন হতে পারে? যে ব্যবস্থায় প্রতিটি জিনিস জ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর

সেখানে শুধুমাত্র মানুষের সৃষ্টি অর্থহীন হতে পারে কি করে? যেসব সৃষ্টির জ্ঞান–বুদ্ধি ও বোধশক্তি নেই এ বস্তুজগতেই তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায়। এ কারণে তাদের আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পর যদি তাদের ধ্বংস করে দেয়া হয় তাহলে তা যথাযথ ও যুক্তিসংগত। কারণ তাদেরকে কোন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দেয়া হয়নি। তাই তাদের জবাবদিহিরও কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু জ্ঞান–বুদ্ধি, চেতনা ও বিবেক এবং ক্ষমতা–ইখতিয়ারের অধিকারী সৃষ্টি—যার কাজ–কর্ম শুধু বস্তুজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যার নৈতিক প্রভাবও আছে এবং যার নৈতিক ফলাফল সৃষ্টিকারী কাজ–কর্মের ধারাবাহিকতা শুধু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চলে না, মৃত্যুর পরও তার নৈতিক ফলাফল উদ্ভব হতে থাকে এমন সৃষ্টিকে শুধু তার বস্তুগত তৎপরতা শেষ হয়ে যাওয়ার পর উদ্ভিদ ও জীব–জন্তুর মত কি করে ধ্বংস করা যেতে পারে? সে তার নিজের ক্ষমতা ও ইচ্ছায় যে নেক কাজ বা বদ কাজই করে থাকুক না কেন তার সঠিক ও ন্যায়সংগত প্রতিদান তার অবশ্যই পাওয়া উচিত। কারণ যে উদ্দেশ্যে তাকে অন্যসব সৃষ্টির মত না করে ক্ষমতা ও ইখতিয়ার সম্পন্ন সৃষ্টি হিসেবে বানানো হয়েছে এটা তার মৌলিক দাবী। তাকে যদি জবাবদিহি করতে না হয়, তার নৈতিক কাজ–কর্মের জন্য যদি পুরস্কার ও শাস্তি না হয় এবং ক্ষমতা ও ইখতিয়ারবিহীন সৃষ্টিকূলের মত স্বাভাবিক জীবন শেষ হওয়ার পর তাকে ধ্বংস করে দেয়া হয় তাহলে তাকে সৃষ্টি করা অবশ্যই অর্থহীন হবে। কিন্তু একজন মহাজ্ঞানী ও বিচক্ষণ স্রষ্টার কাছে এরূপ নিরর্থক কাজের আশা করা যায় না।

এ ছাড়াও আখেরাত এবং পুরস্কার ও শাস্তি সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সৃষ্টির এ চারটি নিদর্শনের নামে শপথ করার আরো একটি কারণ আছে। আখেরাত অস্বীকারকারীরা যে কারণে মৃত্যুর পরের জীবনকে অসম্ভব মনে করে তা এই যে, মৃত্যুর পর আমরা যখন মাটিতে বিলীন হয়ে যাবো এবং আমাদের অণু–পরমাণু যখন মাটিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে তখন কি করে সম্ভব যে, দেহের এসব বিক্ষিপ্ত অংশ পুনরায় একত্রিত হবে এবং পুনরায় আমাদেরকে সৃষ্টি করা হবে। আখেরাতের প্রমাণ হিসেবে সৃষ্টির যে চারটি নিদর্শনকে পেশ করা হয়েছে সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করলে আপনা থেকেই এ সন্দেহ ও ভ্রান্তি দূর হয়ে যায়। ভূপৃষ্ঠের যতগুলো পানির ভাণ্ডারে সূর্যের কিরণ পৌঁছে ততগুলো পানির ভাণ্ডারে সূর্যের তাপ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় পানির অগণিত বিন্দু তার ভাণ্ডারে পড়ে না থেকে শূন্যে উড়ে যায়। কিন্তু তা নিঃশেষ হয়ে যায় না, বরং বাষ্পে রূপান্তরিত হয়ে প্রতিটি বিন্দু বাতাসের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে। অতপর আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে এ বাতাসই বাষ্পে রূপান্তরিত ঐ সব বারিবিন্দুকে একত্রিত করে গাঢ় মেঘের সৃষ্টি করে, ঐ মেঘরাশিকে নিয়ে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সময় নির্ধারিত আছে ঠিক সেই সময় প্রতিটি বিন্দুকে ঠিক সেই আকৃতিতে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয় যে আকৃতিতে তা পূর্বে ছিল। প্রতিনিয়ত এই যে দৃশ্য মানুষের চোখের সামনে অতিক্রান্ত হচ্ছে তা সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত মানুষদের দেহের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গও আল্লাহর একটি মাত্র ইংগিতে একত্রিত হতে পারে এবং ঐ সব মানুষ আগে যেমন ছিল ঠিক সেই আকৃতিতেই তাদেরকে পুনরায় জীবিত করা যেতে পারে। এসব অংগ–প্রত্যংগ মাটি, বাতাস বা পানি যার মধ্যেই মিশে যেয়ে থাক না কেন সর্বাবস্থায়ই তা এ পৃথিবী এবং এর পরিমণ্ডলেই আছে। যে আল্লাহ পানি থেকে বাষ্পরাশি তৈরী করে তা বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার পর পুনরায় সেই বাতাসের সাহায্যেই তা

একত্রিত করেন, এবং পরে পানির আকারে তা বর্ষণ করেন, তাঁর জন্য মানব-দেহের অংগ-প্রত্যংগকে বাতাস, পানি ও মাটির মধ্য থেকে বেছে একত্রিত এবং পূর্বের মত সংযোজিত করে দেয়া কঠিন হবে কেন?

৫. মূল আয়াতে ذَاتِ الْحُبُكِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। حبك রাস্তাসমূহ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বায়ু প্রবাহের কারণে মরুভূমির বালুকারাশি এবং বদ্ধ পানিতে যে ঢেউ সৃষ্টি হয় তাকেও বলে। আবার কোঁকড়া চুলে যে গুচ্ছ ও ভাঁজের সৃষ্টি হয় তা বুঝানোর জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখানে আসমানকে حبك এর অধিকারী বলার কারণ হচ্ছে যে, অধিকাংশ সময় আসমানে নানা আকৃতির মেঘরাশি ছেয়ে থাকে এবং বাতাসের প্রভাবে বারবার তার আকৃতি পরিবর্তিত হতে থাকে এবং কখনো কোন আকৃতি না স্থায়িত্ব লাভ করে না অন্য আকৃতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়। অথবা এ কারণে বলা হয়েছে যে, রাতের বেলা যখন আকাশে তারকাসমূহ চড়িয়ে থাকে তখন মানুষ তার নানা রকম আকৃতি দেখতে পায় যাঁর কোনটি অন্যগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় না।

৬. এ ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্যের ব্যাপারে বিভিন্ন আকৃতির আসমানের শপথ করা হয়েছে উপমা হিসেবে। অর্থাৎ আসমানের মেঘমালা ও তারকাপুঞ্জের আকৃতি যেমন ভিন্ন এবং তাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য ও মিল দেখা যায় না, তোমরাও আখেরাত সম্পর্কে অনুরূপ রকমারি মতামত ও বক্তব্য পেশ করছো এবং তোমাদের একজনের কথা আরেকজনের থেকে ভিন্ন। তোমাদের কেউ বলে এ পৃথিবী অনাদি ও চিরস্থায়ী। তাই কোন রকম কিয়ামত সংঘটিত হতে পারে না। কেউ বলে, এ ব্যবস্থা ধ্বংসশীল এবং এক সময় এটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তবে মানুষসহ যেসব জিনিস ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তার পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। কেউ পুনরুজ্জীবনকে সম্ভব বলে মনে করে কিন্তু তার আকীদা-বিশ্বাস এই যে, মানুষ তার ভাল কাজের ফলাফল ভোগের জন্য এ পৃথিবীতে বারবার জন্ম নেয়। কেউ জান্নাত এবং জাহান্নামও বিশ্বাস করে, কিন্তু তার সাথে আবার জন্মান্তরবাদেরও সমন্বয় সাধন করে অর্থাৎ তার ধারণা হচ্ছে গোনাহগার ব্যক্তি জাহান্নামেও শাস্তি ভোগ করে এবং এ পৃথিবীতেও শাস্তি পাওয়ার জন্য বারবার জন্ম লাভ করতে থাকে। কেউ বলে, দুনিয়ার এ জীবনটাই তো একটা শাস্তি। মানবাত্মার যতদিন পর্যন্ত বস্তু জীবনের সাথে সম্পর্ক থাকে ততদিন পর্যন্ত মরে মরে পুনরায় এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে থাকে। তার প্রকৃত মুক্তি (নির্বান লাভ) হচ্ছে অস্তিত্বহীন হয়ে যাওয়া। কেউ আখেরাত এবং জান্নাত ও জাহান্নাম বিশ্বাস করে ঠিকই, কিন্তু বলে, আল্লাহ তাঁর একমাত্র পুত্রকে ক্রুশে মৃত্যু দান করে মানুষের সর্বকালের গোনাহর কাফ্ফারা আদায় করে দিয়েছেন। মানুষ আল্লাহর সেই পুত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নিজের কুকর্মের মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। কিছু লোক আছে যারা আখেরাত এবং শাস্তি ও পুরস্কারে বিশ্বাস করেও এমন কিছু বুযর্গ ব্যক্তিকে সুপারিশকারী মনে করে নেয়—তাদের ধারণায় তারা আল্লাহর এতই প্রিয় বা আল্লাহর কাছে এমন ক্ষমতার অধিকারী যে, যারাই তাদের ভক্ত হয়ে যাবে তারা পৃথিবীতে সবকিছু করেও শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। এসব সম্মানিত সত্তা সম্পর্কে এ আকীদা পোষণকারীদের মধ্যে মতের মিল নেই। প্রত্যেক গোষ্ঠীই তাদের নিজেদের আলাদা আলাদা সুপারিশকারী বানিয়ে রেখেছে। মতের এ ভিন্নতাই প্রমাণ করে যে, অহী ও রিসালাতের তোয়াক্কা না করে মানুষ তার নিজের এবং এ পৃথিবীর পরিণতি সম্পর্কে

قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ﴿١٠﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ﴿١١﴾ يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٢﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ﴿١٣﴾ ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ۭ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٤﴾ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٥﴾ اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ﴿١٦﴾

ধ্বংস হয়েছে অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা,[৮] যারা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত এবং গাফলতিতে বিভোর।[৯] তারা জিজ্ঞেস করে, তবে সেই কর্মফল দিবস কবে আসবে? তা সেদিন আসবে যেদিন তাদের আগুনে ভাজা হবে।[১০] (এদের বলা হবে) এখন তোমাদের ফিতনার[১১] স্বাদ গ্রহণ করো। এটা সেই বস্তু যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে।[১২] তবে মুত্তাকীরা[১৩] সেদিন বাগান ও ঝর্ণাধারার মধ্যে অবস্থান করবে। তাদের রব যা কিছু তাদের দান করবেন তা সানন্দে গ্রহণ করতে থাকবে।[১৪] সেদিনটি আসার পূর্বে তারা ছিল সৎকর্মশীল।

যখনই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা অজ্ঞতা প্রসূত হয়েছে। অন্যথায়, মানুষের কাছে সত্যিই যদি এ ব্যাপারে সরাসরি জ্ঞানলাভের কোন মাধ্যম থাকতো তাহলে এত ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী আকীদা-বিশ্বাস সৃষ্টি হতো না।

৭. মূল আয়াতের বাক্য হলো يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ। এ আয়াতাংশে ব্যবহৃত عَنْهُ সর্বনাম দ্বারা দু'টি জিনিস বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। এক, কৃতকর্মের প্রতিদান। দুই, ভিন্ন ভিন্ন কথা ও বক্তব্য। প্রথম ক্ষেত্রে এ বাণীর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, কৃতকর্মের প্রতিদান অবশ্যই সামনে আসবে, যদিও তোমরা সে প্রতিদান প্রাপ্তি সম্পর্কে নানা রকমের ভিন্ন ভিন্ন আকীদা পোষণ করে থাকো। তবে তা মেনে নিতে কেবল সেই ব্যক্তিই বিদ্রোহ করে যে ন্যায় ও সত্য বিমুখ। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এ বাণীর অর্থ দাঁড়ায় এই নানা রকমের বক্তব্য ও মতামত দেখে কেবল সেই ব্যক্তিই বিভ্রান্ত হয় যে ন্যায় ও সত্যের প্রতি বিমুখ।

৮. এ বাক্যটি দ্বারা কুরআন মজীদ মানুষকে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্য সম্পর্কে সাবধান করছে। পার্থিব জীবনের ছোট ছোট ক্ষেত্রে অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোন পরিমাপ ও মূল্যায়ণ করা কিছুটা চলতে পারে যদিও তা জ্ঞানের বিকল্প হতে পারে না। কিন্তু গোটা জীবনের কৃতকর্মের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে কিনা এবং যদি করতে হয় তাহলে কার কাছে কখন জবাবদিহি আমাদেরকে করতে হবে? সেই জবাবদিহিতে আমাদের সফলতা ও ব্যর্থতার ফলাফল কি হবে? এটা এমন কোন প্রশ্ন নয় যে, এ সম্পর্কে মানুষ শুধু অনুমান ও ধারণা অনুসারে একটা কিছু ঠিক করে নেবে এবং জুয়ার বাজি ধরার মত নিজের জীবনরূপ পুঁজির সবটাই বাজি ধরে বসবে। কারণ, এ

অনুমান যদি ভ্রান্ত হয় তাহলে তার অর্থ হবে, ব্যক্তি নিজেকেই নিজে ধ্বংস করে ফেললো। তাছাড়া মানুষ যেসব বিষয়ে শুধু অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে এটি আদৌ সে ধরনের নয়। কারণ, যা মানুষের ধরা–ছোঁয়ার গণ্ডির মধ্যে কেবল সেসব ক্ষেত্রেই অনুমান চলতে পারে। কিন্তু এটি এমন একটি বিষয় যার কোনকিছুই ধরা–ছোঁয়ার গণ্ডিভুক্ত নয়। তাই এর কোন অনুমান ভিত্তিক মূল্যায়ণ সঠিক হতে পারে না। এখন প্রশ্ন থাকে তাহলে অনুভূতি ও উপলব্ধির বাইরের এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঠিক উপায় কি? কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় এ প্রশ্নের যে জবাব দেয়া হয়েছে এবং এ সূরা থেকেও এ জওয়াবেরই ইংগিত পাওয়া যায় যে, মানুষ নিজে সরাসরি ন্যায় ও সত্য পর্যন্ত পৌছতে পারে না। আল্লাহ তাঁর নবীর মাধ্যমে ন্যায় ও সত্যের জ্ঞান দান করে থাকেন। এ জ্ঞানের সত্যতা সম্পর্কে মানুষ তার নিজের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে এভাবে যে, যমীন, আসমান ও তার নিজের মধ্যে যে অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান তা গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে নিরপেক্ষভাবে ভেবে দেখবে যে, নবী যা বলছেন এসব নিদর্শন কি সেই সত্যই প্রমাণ করছে, না এ বিষয়ে অন্যেরা যেসব ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ পেশ করেছে সেগুলোকেই সমর্থন করছে? আল্লাহ ও আখেরাত সম্পর্কে জ্ঞানগত বিশ্লেষণের এটিই একমাত্র পন্থা যা কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পন্থা বাদ দিয়ে যে ব্যক্তিই নিজের আন্দাজ–অনুমান অনুসারে চলেছে সে–ই ধ্বংস হয়েছে।

৯. অর্থাৎ তারা জানে না যে, নিজেদের এ ভুল মূল্যায়ণের কারণে তারা কোন্‌ পরিণামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কেউ এভাবে মূল্যায়ণ করে যে পথই অবলম্বন করেছে তা তাকে সোজা ধ্বংসের গহবরে নিয়ে গেছে। যে ব্যক্তি আখেরাত অস্বীকার করে সে কোন প্রকার জবাবদিহির জন্য আদৌ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে না, এবং এ চিন্তায় মগ্ন আছে যে, মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন হবে না। কিন্তু সেই সময়টি আকস্মিকভাবে এসে হাজির হবে যখন তার আশা–আকাংখা ও চিন্তা–ভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীত আরেকটি জীবনে তার চোখ খুলবে এবং সে জানতে পারবে যে, এখানে তাকে এক এক করে প্রতিটি কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। যে ব্যক্তি এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে গোটা জীবন অতিবাহিত করছে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় এ দুনিয়ায় ফিরে আসবো, সে মৃত্যুর সাথে সাথে জানতে পারবে যে, এখন ফিরে যাওয়ার সব দরজা বন্ধ। নতুন কোন কাজের দ্বারা অতীত জীবনের কাজের ক্ষতিপূরণের কোন সুযোগই আর এখন নেই এবং সামনে আরো একটি জীবন আছে যেখানে চিরদিনের জন্য তাকে নিজের পার্থিব জীবনের কর্মফল দেখতে ও ভোগ করতে হবে। যে ব্যক্তি এ আশায় নিজের জীবনকে ধ্বংস করে ফেলে যে, যদি নফস এবং তার প্রবৃত্তিসমূহকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলি তাহলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আমি দৈহিক আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে যাবো। কিন্তু মৃত্যুর দরজা পার হওয়া মাত্রই সে দেখতে পাবে সামনে ধ্বংস নেই আছে শুধু চিরস্থায়ী জীবন ও অস্তিত্ব। আর তাকে এখন এ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে যে, তোমাকে জীবন ও অস্তিত্বের নিয়ামত কি এ জন্যই দেয়া হয়েছিলো যে, তুমি তাকে গড়ার ও সুসজ্জিত করার পরিবর্তে ধ্বংস করার জন্য নিজের সমস্ত শ্রম ব্যয় করবে? অনুরূপ যে ব্যক্তি তথাকথিত কোন ঈশ্বর পুত্রের কাফ্‌ফারা হওয়ার কিংবা কোন বুযর্গ ব্যক্তির শাফায়াতকারী হওয়ার ভরসায় সারা জীবন আল্লাহর নাফরমানী করতে থাকলো আল্লাহর সামনে হাজির হওয়া মাত্র সে জানতে পারবে যে, এখানে না কেউ কারো কাফ্‌ফারা আদায়কারী আছে, না কারো এমন শক্তি আছে যে

নিজের শক্তিতে অথবা নিজে কারো ভালবাসায় ধন্য হওয়ার কারণে কাউকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে। অতএব, অনুমান ভিত্তিক এসব আকীদা-বিশ্বাস প্রকৃতপক্ষে এক আফিম, যার নেশায় এসব লোক বুঁদ হয়ে আছে। তারা জানে না আল্লাহ ও নবী-রসূল প্রদত্ত সঠিক জ্ঞানকে উপেক্ষা করে এরা যে মূর্খতার মধ্যে নিমগ্ন আছে তা তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

১০. প্রতিদান দিবস কবে আসবে কাফেরদের এ প্রশ্ন আসলে প্রকৃত তথ্য জানার জন্য ছিল না, বরং তা ছিল-বিদ্রূপ ও হাসি ঠাট্টার উদ্দেশ্যে। তাই তাদেরকে এ ভঙ্গিতে জবাব দেয়া হয়েছে। এটা ঠিক সেরূপ যখন আপনি কোন ব্যক্তিকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন, একদিন এ আচরণের খারাপ পরিণতি দেখতে পাবে। কিন্তু সে বিদ্রূপ করে আপনাকে জিজ্ঞেস করছে ঃ জনাব, কবে আসবে সেদিন? সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, "খারাপ পরিণতি কবে আসবে" তার এ প্রশ্ন সেই খারাপ পরিণতি আসার তারিখ জানার জন্য নয়। বরং আপনার উপদেশকে বিদ্রূপ করার জন্য। সুতরাং এর সঠিক জবাব হবে এই যে, তা সেদিন আসবে যেদিন তোমার দুর্ভাগ্য আসবে। এখানে একথাটিও ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, আখেরাত অস্বীকারকারী কোন ব্যক্তি যদি ভদ্রতা ও যুক্তি সহকারে বিতর্ক করে তাহলে সে এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দিয়ে কথা বলতে পারে। কিন্তু তার মস্তিষ্ক খারাপ না হলে সে এ প্রশ্ন কখনো করতে পারে না যে, আখেরাত কোন্ তারিখে সংঘটিত হবে তা বলো। তার পক্ষ থেকে যখনই এ ধরনের প্রশ্ন আসবে, বিদ্রূপ ও হাসি-তামাশা হিসেবেই আসবে। তাই আখেরাত সংঘটিত হওয়া না হওয়ার তারিখ বলে দেয়াতে মূল বিষয়ের ওপর কোন প্রভাবই পড়ে না। কেউ এ কারণে আখেরাত অস্বীকার করে না যে, তা সংঘটিত হওয়ার সন, মাস এবং দিন বলে দেয়া হয়নি। আবার তা অমুক সন, অমুক মাস ও অমুক তারিখে সংঘটিত হবে তা শুনে কেউ তা মেনে নিতে পারে না। তারিখ নির্দিষ্ট করে বলে দেয়া আদৌ কোন প্রমাণ নয় যে, তা কোন অস্বীকারকারীকে স্বীকার করে নিতে আগ্রহী করে তুলবে। কারণ, এরপরে এ প্রশ্নও দেখা দেয় যে, ঐ দিনটি আসার আগে কিভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, সেদিন সত্যি সত্যিই তা সংঘটিত হবে।

১১. এখানে 'ফিত্না' শব্দটি দু'টি অর্থ প্রকাশ করছে। একটি অর্থ হচ্ছে, নিজের এ আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো। অপর অর্থটি হচ্ছে, তোমরা পৃথিবীতে যে বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি করে রেখেছিলে তার স্বাদ গ্রহণ করো। আরবী ভাষায় এ শব্দটির এ দু'টি অর্থ গ্রহণের সমান অবকাশ আছে।

১২. "তাহলে প্রতিদানের সেদিনটি কবে আসবে" কাফেরদের এ প্রশ্নে এ অর্থও বহন করছিলো যে, তা আসতে বিলম্ব হচ্ছে কেন? আমরা যখন তা অস্বীকার করছি এবং তার অস্বীকৃতির শাস্তি আমাদের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়েছে তখন তা আসছে না কেন? এ কারণে তারা যখন জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হতে থাকবে তখন বলা হবে, এটি সেই জিনিস যা তোমরা দ্রুত কামনা করছিলে। এ আয়াতাংশ থেকে স্বতই এ অর্থ প্রকাশ পায় যে, এটা নিছক আল্লাহর করুণা ছিল যে, তোমাদের অবাধ্যতা প্রকাশের সাথে সাথে তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করেননি। বরং তোমাদেরকে ভেবে-চিন্তে দেখার, বুঝার এবং নিজেকে সামলে নেয়ার জন্য তিনি দীর্ঘ অবকাশ দিয়ে এসেছেন। কিন্তু তোমরা এমন নির্বোধ

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿١٨﴾ وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿١٩﴾ وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٢١﴾ وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ﴿٢٢﴾ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ﴿٢٣﴾

রাতের বেলা তারা কমই ঘুমাতো।[১৫] তারপর তারাই আবার রাতের শেষ প্রহরগুলোতে ক্ষমা প্রার্থনা করতো।[১৬] তাদের সম্পদে অধিকার ছিল প্রার্থী ও বঞ্চিতদের।[১৭] দৃঢ় প্রত্যয় পোষণকারীদের জন্য পৃথিবীতে বহু নিদর্শন রয়েছে।[১৮] এবং তোমাদের সত্তার মধ্যেও।[১৯] তোমরা কি দেখ না? আসমানেই রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং সে জিনিসও যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেয়া হচ্ছে।[২০] তাই আসমান ও যমীনের মালিকের শপথ, একথা সত্য এবং তেমনই নিশ্চিত যেমন তোমরা কথা বলছো।

যে, সে অবকাশ থেকে উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে সে সময়টি যেন দ্রুত নিয়ে আসা হয় সেই দাবী করে এসেছো। এখন দেখে নাও, যে জিনিসের দ্রুত আগমন কামনা করছিলে তা কেমন জিনিস।

১৩. এখানে 'মুত্তাকী' শব্দটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে, এর অর্থ সেসব লোক যারা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের দেয়া খবরের প্রতি বিশ্বাস করে অখেরাতকে মেনে নিয়েছে এবং আখেরাতের জীবনের সফলতার জন্য তাদেরকে যে আচরণ করতে বলা হয়েছিলো তারা তাই করেছিলো এবং যে আচরণ ও নীতি সম্পর্কে বলে দেয়া হয়েছিলো যে, তা আল্লাহর আযাবের মধ্যে নিমজ্জিত করে তা বর্জন করেছিলো।

১৪. যদিও আয়াতের মূল বাক্যাংশ হচ্ছে اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ এবং যার শাব্দিক অনুবাদ শুধু এই যে, "তাদের রব যা দিবেন তা তারা নিতে থাকবে।" কিন্তু এ ক্ষেত্রে নেয়ার অর্থ শুধু নেয়া নয়, বরং সানন্দচিত্তে নেয়া। যেন কোন দানশীল ব্যক্তি কিছু লোককে হাতে তুলে পুরস্কার দিচ্ছেন আর তারা লাফালাফি করে তা নিচ্ছে। কোন ব্যক্তিকে যখন তার পছন্দের জিনিস দেয়া যায় সে মুহূর্তে নেয়ার মধ্যে আপনা থেকেই সানন্দে নেয়ার অর্থ সৃষ্টি হয়ে যায়। কুরআন মজীদে একস্থানে বলা হয়েছে ঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ

"মানুষ কি জানে না, আল্লাহই তো বান্দার তাওবা কবুল করেন এবং তাদের সাদকা গ্রহণ করেন। (তাওবা ঃ ১০৪)

এখানে সাদকা গ্রহণ করার অর্থ তা শুধু নেয়া নয়, বরং সন্তুষ্ট হয়ে তা গ্রহণ করা।

১৫. মুফাস্সিরদের এক দল এ আয়াতের যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা হচ্ছে তারা শুধু শুয়ে শুয়ে সারারাত কাটিয়ে দিত এবং রাতের প্রারম্ভে, মধ্যভাগে বা শেষভাগে কম হোক বা বেশী হোক কিছু সময় জেগে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করে কাটাতো না, এমন খুব কমই ঘটতো। হযরত ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালেক, মুহাম্মাদ আল বাকের, মাতরাফ ইবনে আবদুল্লাহ, আবুল আলিয়া, মুজাহিদ, কাতাদা, রাবী' ইবনে আনাস প্রমুখ থেকে সামান্য শাব্দিক তারতম্য সহ এ তাফসীরই বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় দল এর অর্থ বর্ণনা করেছেন এই যে, তারা রাতের বেশীর ভাগ সময়ই মহান আল্লাহর ইবাদাতে কাটাতেন এবং অল্প সময় ঘুমাতেন। এটা হযরত হাসান বাসরী, আহনাফ ইবনে কায়েস এবং ইবনে শিহাব যুহরীর বক্তব্য। পরবর্তীকালের মুফাস্সির ও অনুবাদকগণ এ ব্যাখ্যাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ, আয়াতের শব্দসমূহ এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্র বিবেচনায় এ ব্যাখ্যাই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। সুতরাং অনুবাদেও আমরা এই অর্থ গ্রহণ করেছি।

১৬. অর্থাৎ যারা তাদের রাতসমূহ পাপ-পঙ্কিলতা ও অশ্লীল কাজ-কর্মে ডুবে থেকে কাটায় এবং তারপরও মাগফিরাত প্রার্থনা করার চিন্তাটুকু পর্যন্ত তাদের মনে জাগে না এরা তাদের শ্রেণীভুক্ত ছিল না। পক্ষান্তরে এদের অবস্থা ছিল এই যে, তারা রাতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আল্লাহর ইবাদাতে ব্যয় করতো এবং এরপরও রাতের শেষাংশে আপন প্রভুর কাছে এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতো যে, তোমার যতটুকু ইবাদাত বন্দেগী করা আমাদের কর্তব্য ছিল তা করতে আমাদের ত্রুটি হয়েছে। هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ কথাটির মধ্যে এ বিষয়েও একটি ইংগিত আছে যে, তাদের জন্য এ আচরণই শোভনীয় ছিল। তারাই ছিল আল্লাহর দাসত্বের এরূপ পরাকাষ্ঠা দেখাবার যোগ্য যে আল্লাহর বন্দেগীতে জীবনপাতও করবে এবং তা সত্ত্বেও এ জন্য কোন রকম গর্বিত হওয়া এবং নিজের নেক কাজের জন্য অহংকার করার পরিবর্তে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমার জন্য বিনীতভাবে প্রার্থনা করবে। যারা গোনাহ করার পরও বুকটান করে চলে সে নির্লজ্জ পাপীদের আচরণ এরূপ হতে পারতো না।

১৭. অন্য কথায় একদিকে তারা এভাবে তাদের প্রভুর অধিকার স্বীকার ও আদায় করতো, অন্যদিকে আল্লাহর বান্দাদের সাথে তাদের আচরণ ছিল এই। কম হোক বা বেশী হোক আল্লাহ তাদের যা কিছুই দান করেছিলেন তাতে তারা কেবল নিজেদের এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততির অধিকার আছে বলে মনে করতো না বরং তাদের মধ্যে এ অনুভূতিও ছিল যে, যারা তাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী এমন প্রত্যেক আল্লাহর বান্দার তাদের সম্পদে অধিকার আছে। আল্লাহর বান্দাদের সাহায্য তারা দান-খয়রাত হিসেবে করতো না। তাই তারা তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রত্যাশী ছিল না কিংবা তাদেরকে নিজেদের অনুগ্রহের পাত্র মনে করতো না। একে তারা তাদের অধিকার মনে করতো এবং নিজেদের কর্তব্য মনে করে পালন করতো। তাছাড়া যারা প্রার্থী হয়ে তাদের কাছে এসে সাহায্যের জন্য হাত পাততো শুধু এসব লোকের মধ্যেই তাদের সমাজ সেবা সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং যার সম্পর্কেই তারা জানতে পারতো যে, সে তার রুটি রুজি অর্জন করা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে তাকেই সাহায্য করার জন্য তারা অস্থির হয়ে পড়তো। যে ইয়াতীম শিশু অসহায় হয়ে পড়েছে, যে বিধবার কোন আশ্রয় নেই, যে অক্ষম ব্যক্তি নিজের

রুজি-রোজগারের জন্য চেষ্টা-সাধনা করতে পারে না, যে ব্যক্তি বেকার ও কর্মহীন হয়ে পড়েছে কিংবা যার উপার্জন প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হচ্ছে না, যে ব্যক্তি কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে এবং নিজে নিজের ক্ষতিপূরণে সক্ষম নয়, মোট কথা এমন অভাবী যে কোন ব্যক্তির অবস্থা তার গোচরীভূত হয়েছে সে তার সাহায্য লাভের অধিকার স্বীকার করেছে। সে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেছে।

এ তিনটি বিশেষ গুণের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে 'মুত্তাকী ও মুহসিন' বলে আখ্যায়িত করে বলছেন, এ গুণাবলীই তাদেরকে জান্নাতলাভের অধিকারী বানিয়েছে।

প্রথম গুণটি হচ্ছে, তারা আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করেছেন এবং এমন প্রতিটি আচরণ বর্জন করেছেন আল্লাহ ও তাঁর রসূল যাকে আখেরাতের জীবনের জন্য ধ্বংসাত্মক বলে বর্ণনা করেছিলেন। দ্বিতীয় গুণটি হচ্ছে, তারা নিজেদের জীবনপাত করে আল্লাহর বন্দেগীর হক আদায় করেছেন এবং সে জন্য অহংকার প্রকাশ করার পরিবর্তে ক্ষমা প্রার্থনাই করেছেন। তৃতীয় গুণটি হলো, তারা আল্লাহর বান্দাদের সেবা ইহসান মনে করে করেননি, বরং তাদের অধিকার ও নিজেদের কর্তব্য মনে করে করেছেন।

এখানে একথাটিও জেনে নেয়া দরকার যে, ঈমানদারদের অর্থ-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের যে অধিকারের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তার অর্থ যাকাত নয় যা শরীয়াতের নির্দেশ অনুসারে তাদের ওপর ফরয করে দেয়া হয়েছে। যাকাত আদায় করার পরও আর্থিক সংগতি সম্পন্ন একজন ঈমানদার তার অর্থ-সম্পদে অন্যদের যে অধিকার আছে বলে উপলব্ধি করে এবং শরীয়াত বাধ্যতামূলক না করে থাকলেও সে মনের একান্ত আগ্রহ সহকারে তা আদায় করে; এখানে সে অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ইবনে আব্বাস মুজাহিদ এবং যায়েদ ইবনে আসলাম প্রমুখ মনীষীগণ এ আয়াতটির এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর এ বাণীটির সারকথা হলো, একজন মুত্তাকী ও পরোপকারী মানুষ কখনো এরূপ ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত হয় না যে, তার সম্পদে আল্লাহ ও তাঁর বান্দার যে অধিকার ছিল যাকাত আদায় করে সে তা থেকে পুরোপুরি অব্যাহতি লাভ করেছে। ভুখা, নাংগা ও বিপদগ্রস্ত প্রতিটি মানুষকেই সাধ্যমত সাহায্য করে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সে স্বীকার করে। আল্লাহর মুত্তাকী ও মুহসিন বান্দা তার সাধ্যমত পরোপকারমূলক কাজ করতে সর্বদা মনে প্রাণে প্রস্তুত থাকে এবং পৃথিবীতে নেক কাজ করার যে সুযোগই সে লাভ করে তা হাতছাড়া হতে দেয় না। সে কখনো এরূপ চিন্তা-ভাবনা করে না যে, যে নেক কাজ করা তার জন্য ফরয করে দেয়া হয়েছিলো তা সে সম্পাদন করেছে, এখন আর কোন নেক কাজ সে কেন করবে?

যে ব্যক্তি নেক কাজের মূল্য বুঝতে পেরেছে সে তা বোঝা মনে করে বরদাশত করেনা, বরং নিজের লাভজনক ব্যবসায় মনে করে আরো অধিক উপার্জনের জন্য লালায়িত হয়ে পড়ে।

১৮. নিদর্শন অর্থ সেসব নিদর্শন যা আখেরাতের সম্ভাবনা এবং তার অবশ্যম্ভাবিতা ও অনিবার্যতার সাক্ষ দিচ্ছে। পৃথিবীর অস্তিত্ব এবং তার গঠন ও আকার-আকৃতি সূর্য থেকে তাকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে এবং বিশেষ কোণে স্থাপন, তার ওপর উষ্ণতা ও আলোর ব্যবস্থা করা, সেখানে বিভিন্ন মওসূম, ঋতুর আগমন ও প্রস্থান, তার ওপর বাতাস

ও পানি সরবরাহ করা, তার অভ্যন্তর ভাগে নানা রকমের অগণিত সম্পদের ভাণ্ডার সরবরাহ করা, তার উপরিভাগ একটি উর্বর আবরণ দিয়ে মুড়ে দেয়া এবং তার পৃষ্ঠদেশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের অসংখ্য ও অগণিত উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন করে দেয়া, তাতে স্থল, জল ও বায়ুতে বিচরণকারী জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গের অসংখ্য প্রজাতির বংশধারা চালু করা, প্রত্যেক প্রজাতির জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা, সেখানে মানুষকে অস্তিত্ব দানের পূর্বে এমন সব উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করা যা ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে কেবল তার দৈনন্দিন প্রয়োজনই পূরণ নয় বরং তার তাহযীব তামাদ্দুনের ক্রমবিবর্তনের ক্ষেত্রে সহযোগিতাও করতে থাকবে, এসব এবং এ ধরনের এত অগণিত নির্দশনাদি আছে যে, চক্ষুষ্মান ব্যক্তি পৃথিবী ও এর পরিমণ্ডলে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করে তা তার মনকে আকৃষ্ট করতে থাকে। যে ব্যক্তি তার বিবেক-বুদ্ধির দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, কোনক্রমেই বিশ্বাস করতে চায় না, তার কথা ভিন্ন। সে এর মধ্যে আর সবকিছুই দেখতে পাবে। কিন্তু দেখবে না শুধু সত্যের প্রতি ইংগিত প্রদানকারী কোন নিদর্শন। তবে যার হৃদয়-মন সংকীর্ণতা ও পক্ষপাত মুক্ত এবং সত্যের জন্য অবারিত ও উন্মুক্ত সে এসব জিনিস দেখে কখনো এ ধারণা পোষণ করবে না যে, এসবই কয়েকশ' কোটি বছর পূর্বে বিশ্ব-জাহানে সংঘটিত একটি আকস্মিক মহা বিস্ফোরণের ফল। বরং এসব দেখে তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে যে, এ চরম উন্নত মানের এ বৈজ্ঞানিক কীর্তি মহা শক্তিমান ও মহাজ্ঞানী এক আল্লাহরই সৃষ্টি। যে আল্লাহ এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি যেমন মৃত্যুর পরে পুনরায় মানুষকে সৃষ্টি করতে অক্ষম হতে পারেন না, তেমনি এমন নির্বোধ হতে পারেন না যে, তাঁর পৃথিবীতে বুদ্ধি-বিবেক ও উপলব্ধির অধিকারী একটি সৃষ্টিকে স্বাধীনতা ও এখতিয়ার দিয়ে লাগামহীন বলদের মত ছেড়ে দিবেন। স্বাধীনতা ও ইখতিয়ারের অধিকারী হওয়ার স্বতস্ফূর্ত ও অনিবার্য দাবী হলো জবাবদিহি। জবাবদিহির ব্যবস্থা না থাকলে স্বাধীনতা ও এখতিয়ার যুক্তি ও ইনসাফের পরিপন্থী হবে। আর অসীম শক্তির বিদ্যমানতা স্বভাবতই একথা প্রমাণ করে যে, পৃথিবীতে মানবজাতির কাজ শেষ হওয়ার পর সে যেখানেই মরে পড়ে থাকুক না কেন যখন ইচ্ছা তার মহাশক্তিধর স্রষ্টা জবাবদিহির জন্য সমস্ত মানুষকে পৃথিবীর প্রতিটি কোণ থেকে পুনরুজ্জীবিত করে আনতে সক্ষম।

১৯. অর্থাৎ বাইরে দেখারও প্রয়োজন নেই। শুধু নিজের মধ্যে দেখলেই তুমি এ সত্য প্রমাণকারী অসংখ্য নিদর্শন দেখতে পাবে। কিভাবে একটি অণুবীক্ষণিক কীট এবং অনুরূপ একটি অণুবীক্ষণিক ডিম্বকে মিলিয়ে একত্রিত করে মাতৃদেহের একটি নিভৃত কোণে তোমাদের সৃষ্টির সূচনা করা হয়েছিল। অন্ধকার সেই নিভৃত কোণে কিভাবে লালন পালন করে তোমাদেরকে ক্রমান্বয়ে বড় করা হয়েছে। কিভাবে তোমাদেরকে অনুপম আকৃতি ও কাঠামোর দেহ এবং বিস্ময়কর কর্মশক্তি সম্পন্ন প্রাণ শক্তি দেয়া হয়েছে। কিভাবে তোমাদের দেহাবয়বের পূর্ণতা প্রাপ্তি মাত্রই তাকে মাতৃগর্ভের সংকীর্ণ ও অন্ধকার জগত থেকে বের করে এ বিশাল ও বিস্তৃত জগতে এমন সময় আনা হয়েছে যখন তোমাদের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। এ যন্ত্র তোমাদের জন্ম থেকে যৌবন ও বার্ধক্য পর্যন্ত শ্বাস গ্রহণ করা, খাদ্য পরিপাক করা, রক্ত তৈরী করে শিরা উপশিরায় প্রবাহিত করা, মল নির্গমন করা, দেহের ক্ষয়িত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশসমূহ আবার নির্মাণ করা ভিতর থেকে উদ্ভূত কিংবা বাইরে থেকে আগমনকারী বিপদাপদ-

সমূহের প্রতিরোধ করা, ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা এমনকি পরিশ্রান্ত হওয়ার পর আরামের জন্য শুইয়ে দেয়ার কাজ পর্যন্ত আপনা থেকেই সম্পন্ন করে যাচ্ছে। জীবনের এ মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণের জন্য তোমাদের মনোযোগ ও চেষ্টা–সাধনার সামান্যতম অংশও ব্যয়িত হয় না। তোমাদের মাথার খুলির মধ্যে একটি বিস্ময়কর মস্তিষ্ক বসিয়ে দেয়া হয়েছে যার জটিল ভাঁজে ভাঁজে জ্ঞান–বুদ্ধি, চিন্তা–ভাবনা, কল্পনা, উপলব্ধি, ন্যায়–অন্যায় বোধ, ইচ্ছা, স্মৃতিশক্তি, আকাংখা, অনুভূতি, আবেগ, ঝোঁক ও প্রবণতা এবং আরো অনেক শক্তির এক বিশাল ভাণ্ডার কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে আছে। তোমাদেরকে জ্ঞান অর্জন করার অনেক মাধ্যম দেয়া হয়েছে যা চোখ, নাক, কান এবং গোটা দেহের স্নায়ুতন্ত্রীর সাহায্যে তোমাদেরকে সব রকমের সংবাদ পৌঁছিয়ে থাকে। তোমাদেরকে ভাষা এবং বাকশক্তি দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে তোমরা নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে পার। সর্বোপরি তোমাদের সত্তার এ গোটা সাম্রাজ্যের ওপর তোমার আমিত্ব বা অহংকে নেতা বানিয়ে বসিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে সবগুলো শক্তি কাজে লাগিয়ে মতামত গঠন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পার যে, কোন্ পথে তোমাদের সময়, শ্রম ও চেষ্টা–সাধনা ব্যয় করতে হবে, কোন্‌টি বর্জন করতে হবে এবং কোন্‌টি গ্রহণ করতে হবে, কোন্ বস্তুকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ বানাতে হবে এবং কোন্‌টিকে নয়।

একটু লক্ষ করো এরূপ একটি সত্তা বানিয়ে তোমাদেরকে যখন পৃথিবীতে আনা হলো তখনই তোমাদের সত্তার লালন–পালন, প্রবৃদ্ধি, উন্নতি ও পূর্ণতা সাধনের জন্য কত সাজ–সরঞ্জাম এখানে প্রস্তুত পেয়েছো। এসব সাজ–সরঞ্জামের বদৌলতে জীবনের একটি পর্যায়ে পৌঁছে তোমরা নিজেদের ক্ষমতা ইখতিয়ার কাজে লাগানোর উপযুক্ত হয়েছো।

এসব ক্ষমতা ইখতিয়ার কাজে লাগানোর জন্য পৃথিবীতে তোমাদেরকে নানা উপায়–উপকরণ দেয়া হয়েছে, সুযোগ দেয়া হয়েছে, বহু জিনিসের ওপর তোমাদের কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। বহু মানুষের সাথে তোমরা নানা ধরনের আচরণ করেছো। তোমাদের সামনে কুফরী ও ঈমান, পাপাচার ও আনুগত্য, জুলুম ও ইনসাফ, নেকী ও কুকর্ম এবং হক ও বাতিলের সমস্ত পথ খোলা ছিল। এসব পথের প্রত্যেকটির দিকে আহবানকারী এবং প্রত্যেকটির দিকে নিয়ে যাওয়ার মত কার্যকারণসমূহ বিদ্যমান ছিল। তোমাদের মধ্যে যে–ই যেপথ বেছে নিয়েছে নিজের দায়িত্বেই বেছে নিয়েছে। কারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাছাই করার ক্ষমতা তার মধ্যে পূর্ব থেকেই দেয়া ছিলো। প্রত্যেকের নিজের পছন্দ অনুসারে তার নিয়ত ও ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করার যে সুযোগ সে লাভ করেছে তা কাজে লাগিয়ে কেউ সৎকর্মশীল হয়েছে এবং কেউ দুষ্কর্মশীল হয়েছে। কেউ কুফরী, শিরক ও নাস্তিকতার পথ গ্রহণ করেছে। কেউ তার প্রবৃত্তিকে অবৈধ আকাংখা চরিতার্থ করা থেকে বিরত রেখেছে আর কেউ প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে গিয়ে সবকিছু করে বসেছে। কেউ জুলুম করেছে আর কেউ জুলুম বরদাশত করেছে। কেউ অধিকার দিয়েছে আর কেউ অধিকার নস্যাত করেছে। কেউ মৃত্যু পর্যন্ত পৃথিবীতে কল্যাণের কাজ করেছে আবার কেউ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কুকর্ম করেছে। কেউ ন্যায়কে সমুন্নত করার জন্য জীবনপাত করেছে। আবার কেউ বাতিলকে সমুন্নত করার জন্য ন্যায়ের অনুসারীদের ওপর জুলুম চালিয়ে গেছে।

هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرٰهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا
سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ فَرَاغَ إِلٰىٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ
سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ
قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلٰمٍ عَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍ
فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾ قَالُوا كَذٰلِكِ ۖ قَالَ رَبُّكِ ۖ
إِنَّهُۥ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

২ রুকূ'

হে নবী,[২১] ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী কি তোমার কাছে পৌঁছেছে?[২২] তারা যখন তার কাছে আসলো, বললো ঃ আপনার প্রতি সালাম। সে বললো ঃ "আপনাদেরকেও সালাম—কিছু সংখ্যক অপরিচিত লোক।[২৩] পরে সে নীরবে তার পরিবারের লোকদের কাছে গেল[২৪] এবং একটা মোটা তাজা বাছুর[২৫] এনে মেহমানদের সামনে পেশ করলো। সে বললো ঃ আপনারা খান না কেন? তারপর সে মনে মনে তাদের ভয় পেয়ে গেল।[২৬] তারা বললো ঃ ভয় পাবেন না। তাছাড়া তারা তাকে এক জ্ঞানবান পুত্র সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিল।[২৭] একথা শুনে তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে অগ্রসর হলো। সে আপন গালে চপেটাঘাত করে বললো ঃ বুড়ী বন্ধ্যা।[২৮] তারা বললো ঃ তোমার রব একথাই বলেছেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।[২৯]

এমন কোন ব্যক্তি যার বিবেকের চোখ একেবারেই অন্ধ হয়ে যায়নি সে কি একথা বলতে পারে যে, এ ধরনের একটি সত্তা আকস্মিকভাবে পৃথিবীতে অস্তিত্ব লাভ করেছে? এর পেছনে কোন যুক্তি ও পরিকল্পনা কার্যকর নেই? তার হাতে পৃথিবীতে যেসব কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে তা সবই ফলাফল এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীনভাবে শেষ হয়ে যাবে? কোন ভাল কাজের ভাল ফল এবং কোন মন্দ কাজের মন্দ ফল নেই? কোন জুলুমের কোন প্রতিকার এবং কোন জালেমের কোন জবাবদিহি নেই? যুক্তিবুদ্ধির ধার ধারে না এমন লোকই কেবল এ ধরনের কথা বলতে পারে। কিংবা বলতে পারে এমন লোক যে আগে থেকেই শপথ করে বসে আছে যে, মানব সৃষ্টির পেছনে যত বড় বৈজ্ঞানিক লক্ষ থাকার কথা বলা হোক, তা অস্বীকার করতেই হবে। কিন্তু গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতামুক্ত একজন লোকের পক্ষে একথা না মেনে উপায় নেই যে, মানুষকে যেভাবে

যেসব ক্ষমতা ও যোগ্যতা দিয়ে পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যে মর্যাদা তাকে এখানে দেয়া হয়েছে তা নিশ্চিতভাবেই একটি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা। যে আল্লাহ এমন পরিকল্পনা করতে পারেন, তাঁর বিচক্ষণতা অনিবার্যরূপে দাবী করে যে, মানুষকে তার কাজ–কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আর সেই আল্লাহর শক্তি–সামর্থ সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা মোটেই ঠিক নয় যে, তিনি যে মানুষকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখার মত একটি কোষ থেকে সৃষ্টি করে এ পর্যায়ে পৌছিয়েছেন তাকে তিনি পুনরায় অস্তিত্ব দান করতে পারবেন না।

২০. এখানে আসমান অর্থ উর্ধজগত। মানুষকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার এবং কাজ করার জন্য যা কিছু দেয়া হয় রিযিক অর্থে তার সবকিছুই বুঝায়। আর সমস্ত আসমানী কিতাব ও এ কুরআনে কিয়ামত, হাশর ও পুনরুত্থান, হিসেব–নিকেশ ও জবাবদিহি, পুরস্কার ও শাস্তি এবং জান্নাত ও জাহান্নামের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে مَا تُوعَدُونَ বলে সেসবকেই বুঝানো হয়েছে। আল্লাহর এ বাণীর অর্থ হচ্ছে, দুনিয়ায় তোমাদের কাকে কি দিতে হবে তার ফায়সালা উর্ধজগত থেকেই হয়। তাছাড়া জবাবদিহি ও কর্মফল দেয়ার জন্য কখন তলব করা হবে সে ফায়সালাও সেখান থেকেই হবে।

২১. এখান থেকে দ্বিতীয় রুকূ'র শেষ পর্যন্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং কিছু সংখ্যক অতীত জাতির পরিণতির প্রতি একের পর এক সংক্ষিপ্তভাবে ইংগিত দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য মানুষের মনে দু'টি জিনিস বদ্ধমূল করে দেয়া।

একটি হচ্ছে, মানব ইতিহাসে আল্লাহর প্রতিদানের বিধান সবসময় কার্যকর আছে। এ বিধানে নেককারদের জন্য পুরস্কার এবং জালেমদের জন্য শাস্তির দৃষ্টান্ত সবসময় কার্যকর দেখা যায়। এটি এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে, এ পার্থিব জীবনেও মানুষের সাথে তার স্রষ্টার আচরণ কেবল প্রাকৃতিক বিধান (Physical Law) অনুসারে হয় না, বরং তার সাথে নৈতিক বিধানও (Moral Law) সক্রিয়। তাছাড়া এ গোটা বিশ্ব–জাহান সাম্রাজ্যের স্বভাবই যখন এই যে, যে সৃষ্টিকে বস্তুগত দেহে অবস্থান করে নৈতিক কাজ–কর্মের সুযোগ দেয়া হয়েছে তার সাথে পশু ও উদ্ভিদরাজির মত কেবল প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে আচরণ করা হবে না, বরং তার নৈতিক কাজ–কর্মের ওপর নৈতিক প্রতিফলের বিধানও কার্যকর করা হবে তখন এ দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, এ সাম্রাজ্যে এমন একটা সময় অবশ্যই আসতে হবে যখন এ প্রাকৃতিক জগতে মানুষের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর নিরেট নৈতিক আইনানুসারে তার নৈতিক কাজ–কর্মের ফলাফল পূর্ণরূপে প্রকাশ পাবে। কারণ এ বস্তুজগতে তা পূর্ণরূপে প্রকাশ পেতে পারে না।

এ ঐতিহাসিক ইংগিতসমূহের মাধ্যমে দ্বিতীয় যে জিনিসটি মানুষের মনে বদ্ধমূল করানো হয়েছে তা হচ্ছে, যেসব জাতিই আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের কথা মানেনি এবং নিজেদের জীবনের গোটা আচরণ তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত অস্বীকৃতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছে শেষ পর্যন্ত তারা ধ্বংসের উপযুক্ত হয়ে গিয়েছে। নবী–রসূলদের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নৈতিক বিধান দেয়া হয়েছে এবং সে বিধানানুসারে আখেরাতে মানুষের কাজ–কর্মের যে জবাবদিহি করতে হবে তা যে বাস্তব ও সত্য ইতিহাসের এ নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাই তার সাক্ষী। কারণ যে জাতিই এ বিধানের তোয়াক্কা না করে নিজেকে দায়িত্ব ও জবাবদিহি মুক্ত মনে করে এ পৃথিবীতে তার

করণীয় নির্ধারণ করেছে পরিণামে সে জাতি সরাসরি ধ্বংসের পথের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

২২. ইতিপূর্বে কুরআন মজীদের তিনটি স্থানে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হূদ, ৬৯ থেকে ৭৬ আয়াত; সূরা আল হিজর, আয়াত ৫১ থেকে ৬০; সূরা আল আনকাবূত, আয়াত ৩১ ও ৩২ টীকাসহ।

২৩. পূর্বাপর প্রসংগ অনুসারে এ আয়াতাংশের দুটি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজেই সে মেহমানদের বলেছিলেন যে, পূর্বে কখনো আপনাদের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। আপনারা হয়তো এ এলাকায় নতুন এসেছেন। অপরটি হচ্ছে, তাদের সালামের জবাব দেয়ার পর হযরত ইবরাহীম মনে মনে বললেন কিংবা বাড়ীতে মেহমানদারির ব্যবস্থা করার জন্য যাওয়ার সময় তাদের খাদেমদের বললেন, এরা অপরিচিত লোক। আগে কখনো এ এলাকায় এরূপ জাঁকজমক ও বেশভূষার লোক দেখা যায়নি।

২৪. অর্থাৎ নিজের মেহমানদের একথা বলেননি যে, আপনাদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। বরং তাদেরকে বসিয়ে রেখে নীরবে মেহমানদারির ব্যবস্থা করতে চলে গিয়েছেন যাতে মেহমান সৌজন্যের খাতিরে একথা না বলে যে, এ কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন কি?

২৫. সূরা হূদে عِجْلٍ حَنِيذٍ (ভূনা বাছুর) কথাটি আছে। এখানে বলা হয়েছে যে, তিনি ভালভাবে বাছাই করে মোটা তাজা গো-বৎস ভূনা করিয়েছিলেন।

২৬. অর্থাৎ তাদের হাত যখন খাবারের দিকে এগুলো না, তখন হযরত ইবরাহীমের মনে ভয়ের সঞ্চার হলো। গোত্রীয় জীবনধারায় কারো বাড়ীতে অপরিচিত মুসাফিরের খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকা কোন অসদুদ্দেশ্যে আগমনের লক্ষণ বলে মনে করা হয়। এটাও তাঁর ভয়ের একটা কারণ হতে পারে। তবে খুব সম্ভব, খাবার গ্রহণ থেকে তাদের বিরত থাকাতেই হযরত ইবরাহীম বুঝে ফেলেছিলেন যে, তারা ফেরেশতা, মানুষের রূপ ধরে এখানে এসেছে। তাছাড়া মানুষের আকৃতিতে ফেরেশতাদের আগমন যেহেতু অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই হয়ে থাকে তাই তিনি আশংকা করেছিলেন, কোন ভয়ংকর পরিস্থিতি আসন্ন, যার কারণে এসব ফেরেশতা এভাবে আগমন করেছে।

২৭. সূরা হূদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এটা ছিল হযরত ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সুসংবাদ। এর মধ্যে এ সুসংবাদও আছে যে, হযরত ইসহাকের ঔরসে তিনি হযরত ইয়া'কুব আলাইহিস সালামের মত নাতিও লাভ করবেন।

২৮. অর্থাৎ একদিকে আমি বুড়ী অপর দিকে বন্ধ্যা। এমন অবস্থায় আমার সন্তান হবে? বাইবেলে বলা হয়েছে, সে সময় হযরত ইবরাহীমের বয়স ছিল এক শ' বছর এবং হযরত সারার বয়স ছিল ৯০ বছর। (আদি পুস্তক, ১৮ ঃ ১৭)

২৯. এ কাহিনী বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর যে বান্দা দুনিয়ায় আল্লাহর বন্দেগীর হক যথাযথভাবে আদায় করেছিল আখেরাতে তার সাথে যে আচরণ হবার তাতো হবেই। এ দুনিয়াতেও তাকে এভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে যে, সাধারণ প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে যে বয়সে সন্তান হওয়ার কথা ছিল না এবং তার স্ত্রীও সারা জীবন নিঃসন্তান থেকে চূড়ান্তভাবে নিরাশ হয়ে পড়েছিলো, সেই বয়সে আল্লাহ তাকে সন্তান দান করেছেন শুধু

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾

ইবরাহীম বললো ঃ হে আল্লাহর প্রেরিত দূতগণ, আপনাদের অভিপ্রায় কি?[৩০] তারা বললো ঃ আমাদেরকে একটি পাপী জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে[৩১] যাতে আমরা তাদের ওপর পোড়ানো মাটির পাথর বর্ষণ করি—যা আপনার রবের কাছে সীমালংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত আছে।[৩২] অতপর[৩৩] ঐ জনপদে যারা মু'মিন ছিলো তাদের সবাইকে বের করে নিলাম। আমি সেখানে একটি পরিবার ছাড়া আর কোন মুসলিম পরিবার পাইনি।[৩৪] অতপর যারা কঠোর আযাবকে ভয় করে তাদের জন্য সেখানে একটি নিদর্শন রেখে দিয়েছি।[৩৫]

তাই নয় এমন নজীরবিহীন সন্তান দান করেছেন যা আজ পর্যন্ত কারো ভাগ্যে জোটেনি। এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় এমন কোন মানুষ নেই যার বংশে পর পর চারজন নবী জন্মলাভ করেছেন। হযরত ইবরাহীমই (আ) ছিলেন এমন ব্যক্তিত্ব যার বংশে অধস্তন তিন পুরুষ পর্যন্ত নবুওয়াতের ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছিলো এবং তার পরিবারেই হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়া'কুব এবং হযরত ইউসুফ আলাইহিমুস সালামের মত মহা সম্মানিত নবীদের জন্ম হয়েছিলো।

৩০. মানুষের আকৃতিতে ফেরেশতাদের আগমন যেহেতু কোন বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য হয়ে থাকে তাই তাদের আগমনের উদ্দেশ্য অবহিত হওয়ার জন্য হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম خطب শব্দ ব্যবহার করেছেন। আরবী ভাষায় خطب শব্দটি কোন মামুলি কাজের জন্য ব্যবহৃত হয় না, বরং কোন বড় গরুত্বপূর্ণ কাজ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

৩১. অর্থাৎ লূতের (আ) জাতি। তাদের অপরাধ এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিলো যে, 'অপরাধী জাতি' শুধু এ শব্দটাই জাতি হিসেবে তাদের পরিচয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল। এর আগে কুরআন মজীদের নিম্ন বর্ণিত স্থানসমূহে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তাফহীমুল কুরআন, সূরা সা'দ, আয়াত ৮০ থেকে ৮৪; হূদ, ৭৩ থেকে ৮৩; সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত ৭৪, ৭৫; সূরা আশ শু'আরা, ১৬০ থেকে ১৭৫; আন নামল, ৫৪ থেকে ৫৮ ও ৬৩ থেকে ৬৮; সূরা সাফ্‌ফাত, ১৩৩ থেকে ১৩৮ টীকাসহ।

৩২. অর্থাৎ কোন্ পাথরটি কোন্ অপরাধীর মস্তক চূর্ণ করবে আপনার রবের পক্ষ থেকে তা ঐ পাথরের গায়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। সূরা হূদ ও আল হিজরে এ আযাবের যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে, তাদের জনপদসমূহ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে এবং ওপর থেকে পোড়ানো মাটির পাথর বর্ষণ করা হয়েছে। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, প্রচণ্ড ভূমিকম্পে গোটা অঞ্চল উলটপালট করে দেয়া হয়েছে এবং যারা ভূমিকম্প থেকে রক্ষা পেয়ে পালিয়েছিল আগ্নেয়গিরির লাভার সাথে নির্গত পাথর–বৃষ্টি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

৩৩. এ ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নিকট থেকে কিভাবে হযরত লূতের (আ) কাছে পৌছলো এবং সেখানে তাদের ও লূতের (আ) জাতির মাঝে কি ঘটলো সেসব কাহিনীর বর্ণনা এখানে বাদ দেয়া হয়েছে। সূরা হূদ, আল হিজ্‌র ও আল আনকাবূতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আগেই করা হয়েছে। যে সময় এ 'জাতির ওপর আযাব নাযিল হতে যাচ্ছে এখানে শুধু সেই চরম মুহূর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৪. অর্থাৎ গোটা জাতি ও এলাকায় একটি মাত্র পরিবার ছিল যেখানে ইসলামের আলো বিদ্যমান ছিল। আর সেটা ছিল হযরত লূত আলাইহিস সালামের পরিবার। এ ছাড়া গোটা জাতি অশ্লীলতা ও পাপাচারে ডুবে ছিল এবং তাদের গোটা দেশ পঙ্কিলতায় ভরে উঠেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা সেই একটি পরিবারের লোকজনকে রক্ষা করে বের করে নিলেন এবং তারপর সেই দেশে এমন প্রলয়ঙ্করী আযাব নাযিল করলেন যে, এ দুশ্চরিত্র জাতির একটি লোকও রক্ষা পায়নি। এ আয়াতটিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে ঃ

এক ঃ আল্লাহর প্রতিফল বিধান কোন জাতিকে ততদিন পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস করার ফায়সালা করে না যতদিন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ভালো গুণ বিদ্যমান থাকে। খারাপ লোকদের সংখ্যাধিক্যের মধ্যে নগণ্য সংখ্যক কিছু লোকও যদি অকল্যাণকে প্রতিরোধ করার এবং কল্যাণের পথের দিকে ডাকার জন্য তৎপর থাকে এবং তাদের কল্যাণকারিতা এখনো নিঃশেষ হয়ে না থাকে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে আরো কিছুকাল কাজ করার সুযোগ দেন এবং তাদের অবকাশকাল বাড়িয়ে দিতে থাকেন। কিন্তু অবস্থা যদি এই দাঁড়ায় যে, কোন জাতির মধ্যে যৎসামান্য সদগুণও অবশিষ্ট না থাকে সে ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান হচ্ছে, উক্ত জনপদে যে দু' চারজন লোক অকল্যাণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে নেতিয়ে পড়েছে, তিনি তাঁর মহা ক্ষমতাধীনে কোন না কোনভাবে তাদেরকে রক্ষা করে নিরাপদে বের করেন এবং অবশিষ্ট লোকদের সাথে ঠিক তেমনি আচরণ করেন, যে আচরণ একজন সুস্থ বিবেক–বুদ্ধি সম্পন্ন লোক পঁচা ফলের সাথে করে থাকে।

দুই ঃ 'মুসলমান' কেবল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের নাম নয়। তাঁর পূর্বের সমস্ত নবী–রসূল ও তাঁদের উম্মতও মুসলমান ছিলেন। তাঁদের দীনও ভিন্ন ভিন্ন ছিল না যে, কোনটা ইবরাহীমের দীন, কোনটা মূসার দীন আবার কোনটা 'ঈসার দীন বলে আখ্যায়িত হতে পারে। তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলমান এবং তাদের দীনও ছিল এ ইসলাম। কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় এ সত্যটি এমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নবর্ণিত

وَفِي مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِۦ وَقَالَ سَٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِي ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿٤١﴾ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا۟ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾ فَعَتَوْا۟ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿٤٤﴾ فَمَا ٱسْتَطَٰعُوا۟ مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا۟ مُنتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَٰسِقِينَ ﴿٤٦﴾

এ ছাড়া (তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে) মূসার কাহিনীতে। আমি যখন তাকে স্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে পাঠালাম[৩৬] তখন সে নিজের শক্তিমত্তার ওপর গর্ব প্রকাশ করলো এবং বললো : এ তো যাদুকর কিংবা পাগল।[৩৭] অবশেষে আমি তাকে ও তার সৈন্যদেরকে পাকড়াও করলাম এবং সবাইকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। আর সে তিরস্কৃত ও নিন্দিত হলো।[৩৮]

তাছাড়া (তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে) আদ জাতির মধ্যে। যখন আমি তাদের ওপর এমন অশুভ বাতাস পাঠালাম যে, তা যে জিনিসের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলো তাকেই জরাজীর্ণ করে ফেললো।[৩৯]

তাছাড়া (তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে) সামূদ জাতির মধ্যে। যখন তাদের বলা হয়েছিলো যে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মজা লুটে নাও।[৪০] কিন্তু এ সতর্কীকরণ সত্ত্বেও তারা তাদের রবের হুকুম অমান্য করলো। অবশেষে তারা দেখতে দেখতে অকস্মাত আগমনকারী আযাব[৪১] তাদের ওপর আপতিত হলো। এরপর উঠে দাঁড়ানোর শক্তিও তাদের থাকলো না এবং তারা নিজেদের রক্ষা করতেও সক্ষম ছিল না।[৪২]

আর এদের সবার পূর্বে আমি নূহের কওমকে ধ্বংস করেছিলাম। কারণ তারা ছিল ফাসেক।

আয়াতগুলো দেখুন : আল বাকারা, ১২৮, ১৩১, ১৩২, ও ১৩৩; আলে ইমরান, ৬৭; আল মায়েদা, ৪৪ ও ১১১; ইউনুস, ৭২ ও ৮৪; ইউসুফ, ১০১; আল আ'রাফ, ১২৬ ও আন্ নাহ্ল, ৩১, ৪২ ও ৪৪।

তিন ঃ 'মু'মিন' ও 'মুসলিম' শব্দ দু'টি এ আয়াতে সম্পূর্ণ সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতটি যদি সূরা হুজুরাতের ১৪ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়া যায় তাহলে সেসব লোকদের ধারণার ভ্রান্তি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যারা 'মু'মিন' ও 'মুসলিম' শব্দকে কুরআন মজীদের এমন দু'টি স্বতন্ত্র পরিভাষা বলে মনে করে যা সবখানে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এও মনে করে যে, ঈমান ছাড়াই যে ব্যক্তি বাহ্যত ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করেছে সে-ই নিশ্চিত মুসলিম। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হুজুরাতের ব্যাখ্যা, টীকা ৩১)।

৩৫. এ নিদর্শন অর্থ মরু সাগর (Dead Sea) বর্তমানেও যার দক্ষিণাঞ্চল এক সাংঘাতিক ধ্বংসের নিদর্শন পেশ করছে। প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই যে, লূতের (আ) জাতির বৃহৎ শহর খুব সম্ভবত প্রচণ্ড ভূমিকম্পে ধসে ভূগর্ভে তলিয়ে গিয়েছিলো এবং তার উপরিভাগে মরু সাগরের পানি ছেয়ে গিয়েছিলো। কারণ, এই সাগরের যে অংশ اللسان (আল লিসান) নামক ক্ষুদ্র উপদ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত তা পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট বলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় এবং এ উপদ্বীপের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত প্রাচীন মরু সাগরের যেসব নিদর্শন দেখা যায় তা দক্ষিণের নিদর্শন থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এ থেকে অনুমান করা হয় যে, উপদ্বীপের দক্ষিণের অংশ আগে মরু সাগর পৃষ্ঠ থেকে উঁচু ছিল। পরবর্তীকালে কোন এক সময় ধসে নীচে দেবে গিয়েছে। এর ধসে যাওয়ার সময়টাও খৃষ্টপূর্ব দু' হাজার সনের সম-সাময়িক বলে মনে হয়। ঐতিহাসিকভাবে এটাই হযরত ইবরাহীম ও হযরত লূতের (আ) যুগ। ১৯৬৫ সালে একদল আমেরিকান প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানী আল লিসানে এক বিশাল কবরস্থান আবিষ্কার করেছে যেখানে ২০ হাজারের অধিক কবর আছে। এ থেকে অনুমিত হয় যে, নিকটেই কোন বড় শহর অবশ্যই থাকবে। কিন্তু আশেপাশে কোথাও এমন কোন শহরের নিদর্শন নেই যার পাশেই এত বড় কবরস্থান গড়ে উঠতে পারে। এ থেকেও এ সন্দেহ দৃঢ়মূল হয় যে, এটি যে শহরের কবরস্থান ছিল তা সাগরে নিমজ্জিত হয়েছে। সাগরের দক্ষিণে যে এলাকা অবস্থিত সেখানে এখনো যত্রতত্র ধ্বংসের নিদর্শন বিদ্যমান এবং ভূমিতে গন্ধক, আলকাতরা, কয়লাজাত পিচ ও প্রাকৃতিক গ্যাসের এমন বিপুল মজুদ বর্তমান যা দেখে ধারণা জন্মে যে, এখানে কোন এক সময় বজ্রপাত হওয়ায় কিংবা ভূমিকম্পের কারণে লাভা উদ্‌গীরণ হওয়ায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়ে থাকবে (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আশ্ শু'আরা, টীকা ১১৪)।

৩৬. অর্থাৎ এরূপ সুস্পষ্ট মু'জিযা এবং প্রকাশ্য নিদর্শনসহ পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি যে আসমান ও যমীনের স্রষ্টার পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে এসেছিলেন সে বিষয়টি আর সন্দেহযুক্ত ছিল না।

৩৭. অর্থাৎ কোন সময় সে তাঁকে যাদুকর বলে আখ্যায়িত করেছিলো আবার কখনো বলেছিলো এ ব্যক্তি পাগল।

৩৮. এ ক্ষুদ্র বাক্যাংশটিতে ইতিহাসের একটি পূর্ণাংগ ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনাটা বুঝার জন্য কল্পণার চোখের সামনে এ চিত্রটি একটু নিয়ে আসুন যে, ফেরাউন তৎকালীন পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় কেন্দ্রের শক্তিধর শাসক ছিল, যার জাঁকজমক ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে আশেপাশের সমস্ত জাতি ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। একথা সুবিদিত যে, হঠাৎ একদিন যখন সে তার সৈন্য সামন্তসহ পানিতে ডুবে মরলো, তখন শুধু

মিশরেই নয়, আশেপাশের সমস্ত জাতির মধ্যে এ ঘটনা ব্যাপক প্রচার লাভ করে থাকবে। কিন্তু এতে ডুবে মরা লোকদের নিকটাত্মীয় ছাড়া আর কেউই এমন ছিলো না যারা তাদের নিজের দেশে কিংবা পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে তাদের জন্য শোক প্রকাশ করতো, কিংবা অন্তত এতোটুকুই বলতো যে, হায়! এ দুর্ঘটনার শিকার লোকেরা কত ভাল মানুষ ছিল। পক্ষান্তরে পৃথিবী যেহেতু তাদের জুলুম-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো তাই তাদের এ দৃষ্টান্তমূলক পরিণতিলাভের কারণে প্রতিটি মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলো। প্রতিটি মুখই তাদের ওপর তিরস্কার ও নিন্দাবাদ বর্ষণ করেছে এবং যে-ই খবরটি শুনেছে সে-ই বলে উঠেছে, এ দুরাচার তার উপযুক্ত পরিণতিই ভোগ করেছে। সূরা দুখানে এ অবস্থাটা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ "অতপর না আসমান তাদের জন্য কেঁদেছে না যমীন তাদের জন্য অশ্রু বর্ষণ করেছে।" (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা দুখান, টীকা ২৫)।

৩৯. এ বাতাসের জন্য عَقِيم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা বন্ধ্যা নারীদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অভিধানে এর প্রকৃত অর্থ يَابِس বা শুষ্ক। যদি শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে এর অর্থ হবে, তা ছিল এমন প্রচণ্ড গরম ও শুষ্ক বাতাস যে, তা যে জিনিসের ওপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে তাকে শুষ্ক করে ফেলেছে। আর যদি শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার অর্থ হবে তা ছিল বন্ধ্যা নারীর মত এমন হাওয়া যার মধ্যে কোন কল্যাণ ছিল না। তা না ছিল আরামদায়ক, না ছিল বৃষ্টির বাহক। না ছিল বৃক্ষরাজিকে ফলবানকারী না এমন কোন কল্যাণ তার মধ্যে ছিল যে জন্য বাতাস প্রবাহিত হওয়া কামনা করা হয়। অন্য স্থানসমূহে বলা হয়েছে এ বাতাস শুধু কল্যাণহীন ও শুষ্কই ছিল না বরং তা প্রচণ্ড ঝড়ের আকারে এসেছিলো যা মানুষকে শূন্যে তুলে তুলে সজোরে আছড়িয়ে ফেলেছে এবং এ অবস্থা একাদিক্রমে আটদিন ও সাত রাত পর্যন্ত চলেছে। এভাবে আদ জাতির গোটা এলাকা তছনছ করে ফেলেছে (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হা-মীম আস সাজদার তাফসীর, টীকা ২০-২১ ও আল আহক্বাফ, টীকা ২৫ থেকে ২৮)।

৪০. এখানে কোন্ অবকাশ বুঝানো হয়েছে সে ব্যাপারে মুফাস্সিরদের মধ্যে মতভেদ আছে। হযরত কাতাদা বলেন, এর দ্বারা সূরা হূদের সে আয়াতটির বিষয়বস্তুর প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে সামূদ জাতির লোকেরা হযরত সালেহর (আ) উটনীকে হত্যা করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, তোমরা তিন দিন পর্যন্ত ফূর্তি করে নাও। এরপরই তোমাদের ওপর আযাব আসবে। অপর দিকে হযরত হাসান বাসরী মনে করেন, একথা হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম দাওয়াতের প্রথম দিকেই তাঁর কওমকে বলেছিলেন। এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যদি তোমরা তাওবা ও ঈমানের পথ অবলম্বন করো তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সুযোগ লাভ করবে এবং এরপরেই কেবল তোমাদের দুর্দিন আসবে। এ দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই অধিক বিশুদ্ধ বলে মনে হয়। কারণ, পরবর্তী আয়াত فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ (এরপর তারা তাদের রবের নির্দেশ লংঘন করলো) থেকে বুঝা যায় যে, এখানে যে অবকাশের কথা বলা হচ্ছে তা সীমালংঘনের পূর্বে দেয়া হয়েছিলো। আর তারা সীমালংঘন করেছিল এ সতর্ক বাণীর পরে। অন্যদিকে সূরা হূদের আয়াতে তিনদিনের যে অবকাশের

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾

৩ রুকূ'

আসমানকে[৪৩] আমি নিজের ক্ষমতায় বানিয়েছি এবং সে শক্তি আমার আছে।[৪৪] যমীনকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি। আমি উত্তম সমতলকারী।[৪৫] আমি প্রত্যেক জিনিসের জোড়া বানিয়েছি।[৪৬] হয়তো তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে।[৪৭] অতএব আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমার জন্য স্পষ্ট সাবধানকারী। আল্লাহর সাথে আর কাউকে উপাস্য বানাবে না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সাবধানকারী।[৪৮]

এভাবেই হয়ে এসেছে। এদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের কাছেও এমন কোন রসূল আসেনি যাকে তারা যাদুকর বা পাগল বলেনি।[৪৯]

উল্লেখ করা হয়েছে তা ঐ সব অপরাধীর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্তকর সীমালংঘন হয়ে যাওয়ার পরে দেয়া হয়েছিলো।

৪১. এ আযাবের কথা বুঝাতে কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোথাও একে رجفة (ভীতি প্রদর্শনকারী ও প্রকম্পিতকারী বিপদ) বলা হয়েছে। কোথাও একে صيحة (বিস্ফোরণ ও বজ্রধ্বনি) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কোথাও একে বুঝাতে طاغية (কঠিনতম বিপদ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর এখানে একেই صاعقة বলা হয়েছে যার অর্থ বিদ্যুতের মত অকস্মাত আগমনকারী বিপদ এবং কঠোর বজ্রধ্বনি উভয়ই। সম্ভবত এ আযাব এমন এক ভূমিকম্পের আকারে এসেছিলো যার সাথে আতংক সৃষ্টিকারী শব্দও ছিল।

৪২. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে مَا كَانُوْا مُنْتَصِرِيْنَ। আরবী ভাষায় انتصار শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর একটি অর্থ হচ্ছে নিজেকে কারো আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। অপর অর্থটি হচ্ছে হামলাকারী থেকে প্রতিশোধ নেয়া।

৪৩. আখেরাতের সপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণাদি পেশ করার পর এখন তার সমর্থনে বাস্তব জগতের বিদ্যমান প্রমাণাদি পেশ করা হচ্ছে।

৪৪. মূল আয়াতাংশ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ । مُوسِع অর্থ ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী এবং প্রশস্তকারী উভয়টিই হতে পারে। প্রথম অর্থ অনুসারে এ বাণীর অর্থ হয় আমি কারো সাহায্যে এ আসমান সৃষ্টি করিনি, বরং নিজের ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছি আর তা করা আমার সাধ্যের বাইরে ছিল না। তা সত্ত্বেও তোমাদের মন-মগজে এ ধারণা কি করে আসলো যে, আমি পুনরায় তোমাদের সৃষ্টি করতে পারবো না? দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে একথার অর্থ দাঁড়ায় এ বিশাল বিশ্ব-জাহানকে একবার সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হইনি, বরং ক্রমাগত তার সম্প্রসারণ ঘটাচ্ছি এবং তার মধ্যে প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টির নতুন নতুন বিস্ময়কর দিক প্রকাশ পাচ্ছে। এরূপ মহা পরাক্রমশালী সৃষ্টিকারী সত্তার পুনরায় সৃষ্টি করার ক্ষমতাকে তোমরা অসম্ভব মনে করে নিয়েছো কেন?

৪৫. ১৮নং টীকায় এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নামল, টীকা ৭৪; সূরা ইয়াসীনের ব্যাখ্যা, টীকা ২৯ এবং আয যুখরুফ, টীকা ৭ থেকে ১০।

৪৬. অর্থাৎ জোড়ায় জোড়ায় সৃজনের নীতির ভিত্তিতে পৃথিবীর সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে। একটি জিনিসের সাথে আরেকটি জিনিসের সম্মিলন বা সংযোগ ঘটে এবং তাদের সংযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে নানা রকমের যৌগিক বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে। এখানে কোন বস্তুই এমন স্বতন্ত্র ও একক নয় যে, অন্য কোন জিনিসের সাথে তার জোড়া হয় না। প্রতিটি বস্তুই তার জোড়ার সাথে মিলে ফলপ্রসূ হয়। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, ইয়াসীন, টীকা ৩১; আয যুখরুফ, টীকা ১২)

৪৭. অর্থাৎ গোটা বিশ্ব-জাহানকে জোড়া বেঁধে সৃষ্টি করার নীতির ভিত্তিতে সৃষ্টি করা এবং পৃথিবীর সব জিনিস জোড়ায় জোড়ায় হওয়া এমন একটি সত্য যা আখেরাতের অনিবার্যতার সুস্পষ্ট সাক্ষ দিচ্ছে। তোমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করো তাহলে তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের যখন জোড়া আছে এবং কোন কিছু তার জোড়ার সাথে না মিশে ফলপ্রসূ হতে পারে না তখন দুনিয়ার এ জীবন জোড়াহীন কি করে হতে পারে? আর আখেরাতই এর অনিবার্য জোড়া। আখেরাত না থাকলে এ দুনিয়া একেবারেই নিষ্ফল হবে।

পরবর্তী বিষয় বুঝার জন্য এখানে একথাটিও ভাল করে বুঝে নিতে হবে যে, এ পর্যন্তকার গোটা আলোচনা যদিও আখেরাত সম্পর্কিত বিষয়েই হয়ে আসছে তা সত্ত্বেও এসব আলোচনা ও যুক্তিতর্ক থেকে তাওহীদের প্রমাণও পাওয়া যায়। বৃষ্টির ব্যবস্থাপনা, পৃথিবীর গঠনাকৃতি, আসমানের সৃষ্টি, মানুষের নিজের অস্তিত্ব, গোটা বিশ্ব-জাহানে জোড়া বেঁধে সৃষ্টি নীতির বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড ও ফলাফল, এসব জিনিস যেমন আখেরাতের সম্ভাব্যতা ও অনিবার্যতার সাক্ষী তেমনি তা এ সাক্ষও পেশ করছে যে, এ বিশ্ব-জাহান আল্লাহহীনও নয় কিংবা বহু খোদার রাজত্বও নয় বরং এক মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিমান আল্লাহই এর সৃষ্টিকর্তা, মালিক এবং ব্যবস্থাপক ও শাসক। তাই পরে এসব যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতেই তাওহীদের দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে। তাছাড়া আখেরাত বিশ্বাস করার অনিবার্য ফল হচ্ছে মানুষ আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণ পরিত্যাগ করে আনুগত্য ও দাসত্বের পথ অবলম্বন করে। মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহবিমুখ থাকে যতক্ষণ সে মনে করে যে, তাকে কারো সামনে জবাবদিহি করতে হবে না। এবং তার পার্থিব

জীবনের কাজ–কর্মের হিসেবও কারো কাছে দিতে হবে না। যখনই এ ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হবে সে মুহূর্তেই ব্যক্তির বিবেকের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত হয় যে, সে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত মনে করে বড় ভুল করছিলো। এ অনুভূতিই তাকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে বাধ্য করে। এ কারণেই আখেরাতের সপক্ষে যুক্তি প্রমাণ পেশ করার পর পরই বলা হয়েছে, "অতপর আল্লাহর দিকে দ্রুত অগ্রসর হও।"

৪৮. এ বাক্যাংশ যদিও আল্লাহ তা'আলারই বাণী, কিন্তু এর বক্তা আল্লাহ তা'আলা নন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ব্যাপারটা যেন এই যে, আল্লাহ তাঁর নবীর মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন যে, আল্লাহর দিকে দ্রুত অগ্রসর হও। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি। এ ধরনের কথার উদাহরণ কুরআন মজীদের সর্বপ্রথম সূরা অর্থাৎ সূরা ফাতিহায় বিদ্যমান যেখানে বক্তব্য আল্লাহর কিন্তু বক্তা হিসেবে বান্দা কথাগুলো পেশ করে। إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ – اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ সেখানে যেমন একথা বলা হয়নি যে, হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের রবের কাছে এভাবে দোয়া করো। কিন্তু কথার ধরন থেকে আপনা আপনি একথার ইংগিত পাওয়া যায় যে, এটা একটা দোয়া যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন। ঠিক তেমনি এখানেও বলা হয়নি যে, "হে নবী, তুমি এসব লোককে বলো।" কিন্তু কথার ধরন থেকে ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে যে এতে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনা অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদ গ্রহণের জন্য একটা আহবান পেশ করছেন। সূরা ফাতিহা ছাড়াও কুরআন মজীদের আরো কতিপয় স্থানে এ ধরনের বাণী বিদ্যমান যেখানে বক্তব্য আল্লাহর কিন্তু বক্তা কোথাও ফেরেশতা এবং কোথাও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ঐ সব ক্ষেত্রে বক্তা কে তা সুস্পষ্টভাবে পেশ করা না হলেও কথার ধরন থেকেই স্বতই প্রকাশ পায় যে, কার মুখ দিয়ে আল্লাহ তার বক্তব্য পেশ করছেন। উদাহরণ হিসেবে দেখুন, সূরা মারয়াম, ৬৪, ৬৫; আস সাফ্‌ফাত, ১৫৯ থেকে ১৬৭ ও সূরা আশ শূরা, ১০।

৪৯. অর্থাৎ এ ঘটনা এই প্রথম সংঘটিত হয়নি যে, আল্লাহর প্রেরিত রসূলের মুখে আখেরাতের খবর এবং তাওহীদের দাওয়াত শুনে মানুষ তাঁকে যাদুকর ও পাগল বলছে। রিসালাতের গোটা ইতিহাস সাক্ষী, মানব জাতির হিদায়াতের জন্য যখন থেকে রসূলের আগমন ধারা শুরু হয়েছে জাহেলরা তখন থেকে আজ পর্যন্ত একইভাবে এ নির্বুদ্ধিতার কাজটি বারবার করে যাচ্ছে। যে রসূলই এসে এ মর্মে সাবধান করেছেন যে, তোমরা বহু সংখ্যক খোদার বান্দা নও, বরং একমাত্র আল্লাহই তোমাদের স্রষ্টা, উপাস্য এবং তোমাদের ভাগ্যের মালিক ও নিয়ন্তা, জাহেলরা তখনই এ মর্মে হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছে যে, এ ব্যক্তি যাদুকর। সে তার যাদুর সাহায্যে আমাদের বিবেক–বুদ্ধি বিকৃত করতে চায়। যে রসূলই এসে সাবধান করেছেন যে, তোমাদেরকে পৃথিবীতে দায়িত্ব মুক্ত করে ছেড়ে দেয়া হয়নি বরং জীবনের কাজ–কর্ম শেষ করার পর তোমাদেরকে তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের সামনে হাজির হয়ে হিসেব দিতে হবে এবং সে হিসেবের পরিণামে নিজের কাজ–কর্মের প্রতিদান বা শাস্তি পেতে হবে, তাতে নির্বোধ লোকেরা বলে উঠেছে—এ লোকটি পাগল, এর বিবেক বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আরে মৃত্যুর পরে কি আমরা পুনরায় জীবিত হবো?

أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴿٥٤﴾ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

এরা কি এ ব্যাপারে পরস্পর কোন সমঝোতা করে নিয়েছে? না, এরা সবাই বরং বিদ্রোহী।[৫০] অতএব, হে নবী, তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। এ জন্য তোমার প্রতি কোন তিরস্কার বাণী নেই।[৫১] তবে উপদেশ দিতে থাকো। কেননা উপদেশ ঈমান গ্রহণকারীদের জন্য উপকারী।[৫২]

৫০. অর্থাৎ একথা সুস্পষ্ট যে, হাজার হাজার বছর ধরে প্রতিটি যুগে বিভিন্ন দেশ ও জাতির লোকদের নবী–রসূলদের দাওয়াতের মোকাবিলায় একই আচরণ করা এবং তাঁদের বিরুদ্ধে একই রকমের কথা বলার কারণ এ নয় যে, একটি সম্মেলন করে আগের ও পরের সমস্ত মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যখনই কোন নবী এসে এ দাওয়াত পেশ করবে তখনই তাঁকে এ জবাব দিতে হবে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে তাদের আচরণের এ সাদৃশ্য এবং একই প্রকৃতির জবাবের ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি কেন? এর একমাত্র জবাব এই যে, অবাধ্যতা ও সীমালংঘন এদের সবার সাধারণ বৈশিষ্ট। তাছাড়া এ আচরণের আর কোন কারণ নেই। প্রত্যেক যুগের অজ্ঞ লোকেরাই যেহেতু আল্লাহর দাসত্ব থেকে মুক্ত ও তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে পৃথিবীতে লাগামহীন পশুর মত জীবন যাপন করতে আগ্রহী, তাই শুধু এ কারণে যিনিই তাদেরকে আল্লাহর দাসত্ব ও আল্লাহভীতিমূলক জীবন যাপনের আহবান জানিয়েছেন তাঁকেই তারা একই ধরাবাঁধা জবাব দিয়ে এসেছে।

এ আয়াত থেকে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের ওপর আলোকপাত হয়। সেটি হচ্ছে, হিদায়াত ও গোমরাহী, নেক কাজ ও বদ কাজ, জুলুম ও ন্যায় বিচার এবং এ ধরনের আরো অনেক কাজ–কর্মের যেসব প্রবণতা ও উদ্দীপনা স্বভাবসুলভভাবেই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে, উপায়–উপকরণের উন্নতির কারণে বাহ্যত তার রূপ–প্রকৃতি যত ভিন্নই প্রতীয়মান হোক না কেন প্রত্যেক যুগে ও পৃথিবীর প্রতিটি কোণে একইভাবে তার বহিপ্রকাশ ঘটে। আজকের মানুষ ট্যাংক, বিমান ও হাইড্রোজেন বোমার সাহায্যে যুদ্ধ করলেও এবং প্রাচীন যুগের মানুষ লাঠি ও পাথরের সাহায্যে লড়াই করলেও যে মৌলিক কারণে মানুষে মানুষে লড়াই বাধে, তাতে চুল পরিমাণ পার্থক্যও আসেনি। আজ থেকে ৬ হাজার বছর পূর্বে কোন নাস্তিকের নাস্তিকতা গ্রহণের পেছনে যে চালিকা শক্তি কাজ করেছে বর্তমান যুগের কোন নাস্তিক তার নাস্তিকতার সপক্ষে যত যুক্তিই পেশ করুক না কেন, তাকে এ পথে পরিচালিত করার পেছনেও হুবহু সেসব চালিকা শক্তিই কাজ করে। যুক্তি–প্রমাণ পেশের ক্ষেত্রেও সে তার পূর্বসূরীদের চেয়ে মৌলিকভাবে ভিন্ন কিছু বলে না।

৫১. এ আয়াতে দীনের তাবলীগের একটি নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। বিষয়টি ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। হকের দাওয়াত পেশকারী যখন যুক্তিসংগত প্রমাণাদিসহ কারো সামনে সুস্পষ্টভাবে দাওয়াত পেশ করে এবং তার সন্দেহ–সংশয়, আপত্তি ও যুক্তি–প্রমাণের

জবাবও পেশ করে তখন সত্য প্রকাশ করার যে দায়িত্ব ও কর্তব্য তার ওপরে থাকে তা থেকে সে অব্যাহতি লাভ করে। এরপরও যদি সেই ব্যক্তি তার আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার প্রতি অটল থাকে, তার দায়-দায়িত্ব হকের দাওয়াত পেশকারীর ওপর বর্তায় না। এরপরও ঐ ব্যক্তির পেছনে লেগে থাকা, তার সাথে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করে নিজের সময় ব্যয় করা এবং কোন না কোনভাবে ঐ একজন মাত্র ব্যক্তিকে নিজের সমমনা বানানোকে নিজের একমাত্র কাজ মনে করা তার জন্য জরুরী নয়। এ ক্ষেত্রে দাওয়াত পেশকারী তাঁর কর্তব্য পালন করেছে। সে মানতে না চাইলে না মানবে। তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করার কারণে দাওয়াত পেশকারীকে এ অপবাদ দেয়া যাবে না যে, সে একজন মানুষকে গোমরাহীর মধ্যে ডুবে থাকতে দিয়েছে। কেননা, এখন সে নিজেই তার গোমরাহীর জন্য দায়ী।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ করে এ নিয়মটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, তিনি দীনের তাবলীগের জন্য অনর্থক মানুষের পেছনে লেগে যেতেন। তাই আল্লাহ তাঁকে এ থেকে বিরত রাখতে চাইতেন। প্রকৃতপক্ষে একথা বলার কারণ হচ্ছে, ন্যায় ও সত্যের দিকে আহবানকারী যখন যথাসাধ্য সর্বাধিক যুক্তিসংগত পন্থায় কিছু লোককে বুঝানোর দায়িত্ব পালন করেন এবং তাদের মধ্যে হঠকারিতা ও ঝগড়াটে মনোবৃত্তির লক্ষণ দেখে তাদেরকে এড়িয়ে যান তখন তারা তাঁর পেছনে লেগে যায় এবং তাঁর প্রতি এ বলে দোষারোপ করতে থাকে যে, আরে ভাই আপনি তো দেখছি ন্যায় ও সত্যের আচ্ছা ঝাণ্ডাবাহী। কথা বুঝার জন্য আমরা আপনার সাথে আলোচনা করতে চাই। কিন্তু আপনি আমাদের দিকে ফিরেও দেখেন না। অথচ তাদের উদ্দেশ্য কথা বুঝা নয়, বরং নিজেদের উদ্দেশ্যমূলক বিতর্কের মধ্যে ন্যায় ও সত্যের দাওয়াত পেশকারীকে জড়ানো এবং শুধু তার সময় নষ্ট করাই তাদের লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কালামের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, "এ ধরনের মানুষের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না, তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করায় তোমাকে তিরস্কার করা যেতে পারে না।" এরপর কোন ব্যক্তি একথা বলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দোষারোপ করতে পারতো না যে, আপনি তো আমাদেরকে আপনার দীন বুঝানোর জন্য আদিষ্ট। তা সত্ত্বেও আপনি আমাদের কথার জবাব দেন না কেন?

৫২. এ আয়াতে দীন প্রচারের আরেকটি নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে। ন্যায় ও সত্যের দাওয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য সেসব পূণ্যাত্মাদের কাছে ঈমানের নিয়ামত পৌছিয়ে দেয়া, যারা এ নিয়ামতের মূল্য বুঝে এবং নিজেরা তা অর্জন করতে চায়। কিন্তু দাওয়াত পেশকারী জানে না মানব সমাজের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে সেসব পূণ্যাত্মা কোথায় আছে। তাই তার কাজ হচ্ছে, ব্যাপকভাবে তার দাওয়াতের কাজ ক্রমাগত চালিয়ে যাওয়া। যাতে যেখানে যেখানে ঈমান গ্রহণ করার মত লোক আছে সেখানেই যেন তার কথা পৌছে যায়। এ লোকেরাই তার প্রকৃত সম্পদ। তাদের খুঁজে বের করাই তার মূল কাজ। এদের বাছাই করে এনে আল্লাহর রাস্তায় দাঁড় করানো তার লক্ষ হওয়া উচিত। মাঝ পথে আদম সন্তানদের যেসব বাজে উপাদানের সাথে তার সাক্ষাত হবে তাদের প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত তার মনোযোগ দেয়া উচিত যতক্ষণ সে অভিজ্ঞতা দ্বারা না জানবে যে, এগুলো বাজে জিনিস। তাদের বাজে ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী হওয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর এ প্রকৃতির

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿٥٩﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

জিন ও মানুষকে আমি শুধু এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার দাসত্ব[৫৩] করবে। আমি তাদের কাছে কোন রিযিক চাই না কিংবা তারা আমাকে খাওয়াবে[৫৪] তাও চাই না। আল্লাহ নিজেই রিযিকদাতা এবং অত্যন্ত শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।[৫৫] তাই যারা জুলুম করেছে[৫৬] তাদের প্রাপ্য হিসেবে ঠিক তেমনি আযাব প্রস্তুত আছে যেমনটি এদের মত লোকেরা তাদের অংশ পুরো লাভ করেছে। সে জন্য এসব লোক যেন আমার কাছে তাড়াহুড়ো না করে।[৫৭] যেদিনের ভয় তাদের দেখানো হচ্ছে পরিণামে সেদিন তাদের জন্য ধ্বংস রয়েছে।

লোকদের পেছনে তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট না করা উচিত। কারণ, এরা তার উপদেশে উপকৃত হওয়ার মত মানুষ নয়। এদের পেছনে শক্তি ব্যয় করায় বরঞ্চ সেসব লোকের ক্ষতি হয় যারা এ উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয়।

৫৩. অর্থাৎ আমি তাদেরকে অন্য কারো দাসত্বের জন্য নয় আমার নিজের দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করেছি। তারা আমার দাসত্ব করবে এ জন্য যে, আমি তাদের স্রষ্টা। যখন অন্য কেউ এদের সৃষ্টি করেনি তখন তার দাসত্ব করার কি অধিকার এদের আছে? তাছাড়া তাদের জন্য এটা কি করে বৈধ হতে পারে যে, এদের স্রষ্টা আমি অথচ এরা দাসত্ব করবে অন্যদের!

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা শুধু জিন ও মানুষের স্রষ্টা নন। তিনি সমগ্র বিশ্ব–জাহান ও তার প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। কিন্তু এখানে কেবল জিন ও মানুষ সম্পর্কে কেন বলা হয়েছে যে, আমি তাদেরকে আমার ছাড়া আর কারো দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করিনি? অথচ গোটা সৃষ্টির প্রতিটি অণু–পরমাণু শুধু আল্লাহর দাসত্বের জন্য। এর জবাব হচ্ছে পৃথিবীতে জিন ও মানুষই শুধু এমন সৃষ্টি যাদের স্বাধীনতা আছে। তারা তাদের ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের গণ্ডির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব করতে চাইলে কিংবা তাঁর দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাইলে নেবে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যদের দাসত্ব করতে চাইলেও করতে পারে। জিন ও মানুষ ছাড়া এ পৃথিবীতে আর যত সৃষ্টি আছে তাদের এ ধরনের কোন স্বাধীনতা নেই। তাদের আদৌ কোন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার নেই যে, তারা আল্লাহর দাসত্ব করবে না অন্য কারো দাসত্ব করতে পারবে। তাই এখানে শুধু জিন ও মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা তাদের ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের গণ্ডির মধ্যে তাদের

নিজ স্রষ্টার আনুগত্য ও দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে এবং স্রষ্টা ছাড়া অন্যদের দাসত্ব করে নিজেরা নিজেদের স্বভাব প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তাদের জানা উচিত যে, তাদেরকে একমাত্র স্রষ্টা ছাড়া আর কারো দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। তাদের জন্য সোজা পথ হচ্ছে যে স্বাধীনতা তাদেরকে দেয়া হয়েছে তার অন্যায় ব্যবহার যেন না করে। বরং স্বাধীনতার এ সীমার মধ্যে নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে ঠিক তেমনিভাবে যেন আল্লাহর দাসত্ব করে যেভাবে তার দেহের প্রতিটি লোম তার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার বিহীন সীমার মধ্যে তাঁর দাসত্ব করছে।

এ আয়াতে 'ইবাদাত' শব্দটিকে শুধু নামায রোযা এবং এ ধরনের অন্যান্য ইবাদাত অর্থে ব্যবহার করা হয়নি। তাই কেউ এর এ অর্থ গ্রহণ করতে পারে না যে জিন ও মানুষকে শুধু নামায পড়া, রোযা রাখা এবং তাসবীহ তাহলীল করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। এ অর্থটিও এর মধ্যে শামিল আছে বটে, তবে এটা তার পূর্ণাংগ অর্থ নয়। এর পূর্ণাংগ অর্থ হচ্ছে, জিন ও মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের পূজা আনুগত্য আদেশ পালন ও বিনীত প্রার্থনার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। অন্য কোরো সামনে নত হওয়া, অন্য কারো নির্দেশ পালন করা, অন্য কাউকে ভয় করা, অন্য কারো রচিত দীন বা আদর্শের অনুসরণ করা, অন্য কাউকে নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা মনে করা এবং অন্য কোন সত্তার কাছে প্রার্থনার জন্য হাত বাড়ানো তাদের কাজ নয়। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবার ব্যাখ্যা, টীকা ৬৩; আয যুমার, টীকা ২; আল জাসিয়া, টীকা ৩০)।

এ আয়াত থেকে আরো একটি অনুষাঙ্গিক বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তা হচ্ছে জিনেরা মানুষ থেকে স্বতন্ত্র একটি সৃষ্টি। যারা দাবি করে মানব জাতিরই কিছু সংখ্যক লোককে কুরআনে জিন বলা হয়েছে, এর দ্বারা তাদের ধারণার ভ্রান্তি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যায়। কুরআন মজীদের নিম্ন বর্ণিত আয়াতসমূহও এ সত্যেরই অনস্বীকার্য প্রমাণ পেশ করে। (আল আন'আম, ১০০, ১২৮; আল আ'রাফ, ৩৮, ১৭৯; হূদ, ১১৯; আল হিজ্‌র, ২৭ থেকে ৩৩; বনী ইসরাঈল, ৮৮; আল কাহ্‌ফ, ৫০; আস সিজদা, ১৩; সাবা, ৪১; সাদ, ৭৫ ও ৭৬; হা-মীম আস সাজদা, ২৫; আল আহক্বাফ ১৮; আর রহমান ১৫, ৩৯, ৫৬; (এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল্ আম্বিয়া, টীকা ২১; আন নামল, টীকা ২৩, ৪৫; সূরা সাবার ব্যাখ্যা, টীকা ২৪)

৫৪. অর্থাৎ জিন ও মানুষের কাছে আমার কোন উদ্দেশ্য বাঁধা পড়ে নেই যে, এরা আমার দাসত্ব করলে আমার প্রভুত্ব চলবে আর এরা আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আমি আর আল্লাহ থাকতে পারবো না। আমি তাদের বন্দেগী বা দাসত্বের মুখাপেক্ষী নই। বরং আমার বন্দেগী করা তাদের প্রকৃতির দাবি। এ উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। নিজ প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করা তাদের নিজেদেরই ক্ষতি।

"আমি তাদের কাছে রিযিক চাই না, কিংবা তারা আমাকে খাবার দান করুক তাও চাই না" একথাটির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত আছে। আল্লাহবিমুখ লোকেরা পৃথিবীতে যাদের বন্দেগী করছে তারা সবাই প্রকৃতপক্ষে এসব বান্দার মুখাপেক্ষী। এরা যদি তার প্রভুত্ব না চালায় তাহলে তা একদিনও চলবে না। সে এদের রিযিক দাতা নয় এরাই বরং তাকে রিযিক পৌঁছিয়ে থাকে। সে এদের খাওয়ায় না, এরাই তাকে খাইয়ে থাকে। সে এদের প্রাণের রক্ষক নয়, বরং এরাই তাদের প্রাণ রক্ষা করে থাকে। এরাই তাদের সৈন্য

সামন্ত। এদের ওপর নির্ভর করেই তাদের প্রভুত্ব চলে। যেখানেই কেউ এ মিথ্যা প্রভুদের সহযোগী বান্দা হয়নি কিংবা বান্দারা তাদেরকে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থেকেছে সেখানেই তাদের সব জৌলুস হারিয়ে গিয়েছে এবং দুনিয়ার মানুষ তাদের পতন দেখতে পেয়েছে। সমস্ত উপাস্যের মধ্যে একমাত্র মহান ও মহা পরাক্রমশালী আল্লাহই এমন উপাস্য, নিজের ক্ষমতায়ই যাঁর প্রভুত্ব চলছে। যিনি তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে কিছু নেন না, বরং তিনিই তাদের সবকিছু দেন।

৫৫. মূল আয়াতে مَتِيْن শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ দৃঢ় ও অটল যা কেউ নড়াতে পারে না।

৫৬. এখানে জুলুম অর্থ বাস্তব ও সত্যের প্রতি জুলুম করা এবং নিজে নিজের প্রকৃতির প্রতি জুলুম করা। পূর্বাপর প্রসংগ থেকে একথা প্রকাশ পাচ্ছে যে, এখানে জুলুম-নির্যাতনকারী বলতে সেসব মানুষকে বুঝানো হয়েছে যারা বিশ্ব-জাহানের রবকে বাদ দিয়ে অন্যদের দাসত্ব করছে, যারা আখেরাত অস্বীকার করছে, পৃথিবীতে নিজেদেরকে দায়িত্ব মুক্ত মনে করছে এবং সেসব নবী-রসূলদের অস্বীকার করছে যারা তাদেরকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে সতর্ক করার চেষ্টা করেছেন।

৫৭. কাফেররা দাবি করে বলতো যে, সে প্রতিফল দিবস আসার পথে কোথায় আটকে গেল, তা এসে পড়ছে না কেন? এটা কাফেরদের সে দাবিরই জবাব।

আত্ তূর

৫২

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ والطور থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বিষয়বস্তুর আভ্যন্তরীণ সাক্ষ–প্রমাণ থেকে বুঝা যায়, মক্কী জীবনের যে যুগে সূরা আয যারিয়াত নাযিল হয়েছিল এ সূরাটিও সে যুগে নাযিল হয়েছিল। সূরাটি পড়তে গিয়ে একথা অবশ্যই মনে হয় যে, এটি নাযিল হওয়ার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তবে তখনও চরম জুলুম–অত্যাচার শুরু হয়েছিল বলে মনে হয় না।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার প্রথম রুকূ'র বিষয়বস্তু আখেরাত। সূরা যারিয়াতে এর সম্ভাবনা, অবশ্যম্ভাবিতা এবং সংঘটিত হওয়ার প্রমাণাদি পেশ করা হয়েছিল। সে জন্য এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। তবে আখেরাত প্রমাণকারী কয়েকটি বাস্তব সত্য ও নিদর্শনের শপথ করে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, তা নিশ্চিতভাবেই সংঘটিত হবে এবং তার সংঘটন রোধ করতে পারে এ শক্তি কারো নেই। এরপর বলা হয়েছে তা সংঘটিত হলে তার অস্বীকারকারীদের পরিণাম কি হবে এবং তা বিশ্বাস করে তাকওয়ার নীতি অবলম্বনকারীগণ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত দ্বারা কিভাবে পুরস্কৃত হবেন।

এরপর কুরাইশ নেতারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে নীতি অনুসরণ করে চলছিল দ্বিতীয় রুকূ'তে তার সমালোচনা করা হয়েছে। কখনো তারা নবীকে (সা) গণক, কখনো পাগল এবং কখনো কবি বলে আখ্যায়িত করে সাধারণ মানুষকে তাঁর বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করতো যাতে মানুষ তাঁর আনীত বাণীর প্রতি ধীর ও সুস্থ মস্তিষ্কে মনোযোগ না দেয়। নবীকে (সা) তারা নিজেদের জন্য একটি মহা বিপদ বলে মনে করতো এবং প্রকাশ্যেই বলতো, তার ওপর কোন বিপদ আপতিত হলে আমরা তার হাত থেকে বেঁচে যেতাম। তারা তাঁর বিরুদ্ধে এ বলে অভিযোগ করতো যে, এ কুরআন তিনি নিজেই রচনা করছেন এবং আল্লাহর নামে পেশ করছেন। তাই তিনি যা করছেন তা ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা বার বার উপহাস করে বলতো নবুওয়াত দানের জন্য আল্লাহ তা'আলা এ ব্যক্তিকে ছাড়া আর মানুষ

খুঁজে পাননি। তারা তাঁর ইসলামী আন্দোলন ও তা প্রচারের বিরুদ্ধে এতই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতো যে, তিনি যেন কিছু চাওয়ার জন্য তাদের পিছু লেগে রয়েছেন আর তারা নিজেদের রক্ষা করার জন্য তাঁর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা নিজেরা বসে বসে চিন্তা করতো, তাঁর বিরুদ্ধে কি চক্রান্ত করলে তাঁর এ আন্দোলন ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এসব করতে গিয়ে তারা কি ধরনের জাহেলী ও কুসংস্কারমূলক আকীদা–বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছে যার গভীর অন্ধকার থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণ নিস্বার্থভাবে নিজের জীবনপাত করছেন সে সম্পর্কে কোন অনুভূতিই তাদের ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ আচরণের সমালোচনা করে পরপর কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন। এসব প্রশ্নের প্রতিটি হয় তাদের কোন অভিযোগের জবাব, নয়তো তাদের কোন মূর্খতা বা কুসংস্কারের সমালোচনা। এরপর বলা হয়েছে, ঐ লোকদেরকে আপনার নবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাসী বানানোর জন্য কোন মু'জিযা দেখানো একেবারেই অর্থহীন। কারণ, এরা এমন একগুঁয়ে যে, তাদেরকে যাই দেখানো হোক না কেন এরা তার অন্য কোন ব্যাখ্যা করে পাশ কাটিয়ে যাবে এবং ঈমান গ্রহণ করবে না।

এ রুকূ'র শুরুতেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এসব বিরোধী শক্তি ও শত্রুদের অভিযোগ ও সমালোচনার তোয়াক্কা না করে তিনি যেন নিজের আন্দোলন ও উপদেশ–নসীহতের কাজ ক্রমাগত চালিয়ে যেতে থাকেন। রুকূ'র শেষাংশে তাঁকে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, তিনি যেন অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে আল্লাহর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত এসব বিরোধিতার মোকাবিলা করতে থাকেন। এর সাথে সাথে তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, তাঁর প্রভু তাঁকে শত্রুদের মোকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে অসহায় ছেড়ে দেননি। বরং সবসময় তিনি তাঁর তদারক ও তত্ত্বাবধান করছেন। তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সময় না আসা পর্যন্ত আপনি সবকিছু বরদাশত করতে থাকুন এবং নিজ প্রভুর 'হামদ ও তাসবীহ' অর্থাৎ প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে সেই শক্তি অর্জন করুন যা এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহর কাজ করার জন্য দরকার হয়।

সূরা আত্ তূর–মক্কী

আয়াত ৪৯ রুকূ' ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالطُّوْرِ ﴿১﴾ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ﴿২﴾ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ﴿৩﴾ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ﴿৪﴾ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ﴿৫﴾ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ﴿৬﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿৭﴾ مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ﴿৮﴾ يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ﴿৯﴾ وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ﴿১০﴾

তূরের[১] শপথ এবং এমন একখানা খোলা গ্রন্থের শপথ যা সূক্ষ্ম চামড়ার ওপর লিখিত।[২] আর শপথ আবাদ ঘরের,[৩] সুউচ্চ ছাদের[৪] এবং তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের।[৫] তোমার রবের আযাব অবশ্যই আপতিত হবে যার রোধকারী কেউ নেই।[৬] তা ঘটবে সেদিন, যেদিন আসমান প্রচণ্ডভাবে দুলিত হবে[৭] এবং পাহাড় শূন্যে উড়তে থাকবে।[৮]

১. তূর শব্দের প্রকৃত অর্থ পাহাড়। আর الطور শব্দের অর্থ সেই বিশেষ পাহাড় যার ওপরে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসাকে নবুওয়াত দানে সম্মানিত করেছিলেন।

২. প্রাচীন কালে যেসব গ্রন্থ ও লিখিত বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সংরক্ষিত রাখার প্রয়োজন হতো সেগুলোকে কাগজের পরিবর্তে হরিণের চামড়ায় লেখা হতো। বিশেষত এসব চামড়া লেখার জন্য পাতলা অথবা ঝিল্লির আকারে তৈরী করা হতো এবং পরিভাষায় একেই رق বলা হতো। আহলে কিতাবগণ সাধারণত এই رق এর ওপরেই তাওরাত, যাবুর, ইনযীল এবং নবীদের সহীফাসমূহ লিখে রাখতো যাতে তা দীর্ঘ দিনের জন্য সংরক্ষিত থাকতে পারে। এখানে খোলা গ্রন্থ অর্থ আহলে কিতাবের কাছে বর্তমান পবিত্র গ্রন্থসমূহের এ সমষ্টি। একে উন্মুক্ত কিতাব বলার কারণ হচ্ছে তা দুষ্প্রাপ্য ছিল না, বরং পাঠ করা হতো এবং তাতে কি লিপিবদ্ধ ছিল তা সহজেই অবহিত হওয়া যেতো।

৩. হযরত হাসান বাসরীর মতে 'আবাদ ঘর' অর্থ খানায়ে কা'বা যা কোন সময়ই হজ্জ, উমরা এবং তাওয়াফ ও যিয়ারতকারী থেকে শূন্য থাকে না। কিন্তু হযরত আলী, ইবনে আব্বাস, ইকরিমা, মুজাহিদ, কাতাদা, দাহ্হাক, ইবনে যায়েদ ও অন্য সব মুফাস্সিরদের মতে এর অর্থ বায়তুল মা'মূর যার উল্লেখ মি'রাজের প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহ

আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন এবং যার দেয়াল গাত্রে তিনি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সাল্লামকে হেলান দিয়ে থাকতে দেখেছিলেন। মুজাহিদ, কাতাদা ও ইবনে যায়েদ বলেন, পৃথিবীবাসীদের জন্য খানায়ে কা'বা যেমন আল্লাহ পরস্তদের কেন্দ্র তেমনি প্রত্যেক আসমানে তার বাসিন্দাদের জন্য একটি করে কা'বা আছে যা আল্লাহর ইবাদাতকারীদের জন্য অনুরূপ কেন্দ্রের মর্যাদা রাখে। মি'রাজের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সব কা'বার একটির দেয়ালে হযরত ইবরাহীমকে হেলান দিয়ে থাকতে দেখেছিলেন। এর সাথে হযরত ইবরহীমের সম্পর্ক থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। কারণ তিনিই ছিলেন পৃথিবীর কা'বার প্রতিষ্ঠাতা। এ ব্যাখ্যাটি সামনে রেখে বিবেচনা করলে তা হযরত হাসান বাসরীর ব্যাখ্যার পরিপন্থী হবে না। বরং দু'টি ব্যাখ্যা মিলিয়ে আমরা এভাবে বুঝতে পারি যে, এখানে কেবল পৃথিবীর কা'বার শপথ করা হয়নি বরং বিশ্ব–জাহানে বর্তমান সমস্ত কা'বার শপথ এর মধ্যে অন্তরভুক্ত আছে।

৪. উঁচু ছাদ অর্থ আসমান, যা পৃথিবীকে একটি গম্বুজের মত আচ্ছাদিত করে আছে বলে মনে হয়। এখানে এ শব্দটি গোটা উর্ধ জগতকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ক্বাফ, টীকা ৭)

৫. মূল আয়াতে اَلْبَحْرُ الْمَسْجُوْرُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে কোন কোন মুফাস্সির একে 'আগুনে ভর্তি' অর্থে গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ একে শূন্য ও খালি অর্থে গ্রহণ করেন যার পানি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ একে আবদ্ধ বা আটকিয়ে রাখা অর্থে গ্রহণ করেন। তাদের মতে এর অর্থ হচ্ছে, সমুদ্রকে আটকিয়ে বা থামিয়ে রাখা হয়েছে যাতে তার পানি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হারিয়ে না যায় এবং স্থলভাগকে প্লাবিত করে না ফেলে এবং পৃথিবীর সব অধিবাসী তাতে ডুবে না মরে। কেউ কেউ একে মিশ্রিত অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। অর্থাৎ এর মধ্যে মিঠা ও লবণাক্ত পানি এবং গরম ও ঠাণ্ডা সব রকম পানি এসে মিশ্রিত হয়। আর কেউ কেউ একে কানায় কানায় ভরা ও তরংগ বিক্ষুব্ধ অর্থে গ্রহণ করেন। এসব অর্থের মধ্যে প্রথম দু'টি অর্থের পরিবেশ ও অবস্থার সাথে কোন মিল নেই। সমুদ্রের এ দু'টি অবস্থা, অর্থাৎ এর তলদেশ ফেটে সমস্ত পানি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং তা আগুনে পূর্ণ হয়ে যাবে—কিয়ামতের সময় প্রকাশ পাবে। যা সূরা তাকভীরের ৬ আয়াত এবং সূরা ইনফিতারের ৩ আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে। এ অবস্থা এখন বর্তমান নেই, ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে। তাই এ ঘটনার শপথ করে বর্তমান কালের লোকজনকে আখেরাত সংঘটিত হওয়ার কথা কি করে বিশ্বাস করানো যেতে পারে? তাই এ দু'টি অর্থ বাতিল করে اَلْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ অর্থ আবদ্ধ, মিশ্রিত, পূর্ণ ও তরংগ বিক্ষুব্ধ অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬. এটি সেই মহাসত্য যার জন্য এ পাঁচটি জিনিসের শপথ করা হয়েছে। রবের শাস্তি অর্থ আখেরাত। যেহেতু এখানে আখেরাত বিশ্বাসকারীদের সম্বোধন না করে আখেরাত অবিশ্বাসকারীদের সম্বোধন করা হয়েছে আর তাদের জন্য আখেরাত আসার অর্থই হচ্ছে আযাব আসা তাই তাকে কিয়ামত, আখেরাত কিংবা প্রতিফল দিবস বলার পরিবর্তে "রবের আযাব" বলা হয়েছে। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা বলে যে পাঁচটি জিনিসের

শপথ করা হয়েছে তা কিভাবে কিয়ামতের সংঘটিত হওয়া প্রতিপাদন করে এখন একটু গভীরভাবে তা ভেবে দেখুন।

তূর এমন একটি জায়গা যেখানে একটি অবদমিত ও নিষ্পেষিত জাতির উত্থান ঘটানো এবং একটি বিজয়ী ও জালেম জাতির পতন ঘটানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল। আর এ সিদ্ধান্ত প্রাকৃতিক বিধানের (Physical law) ভিত্তিতে ছিল না বরং নৈতিক বিধান (Moral law) ও প্রতিফল বিধানের ভিত্তিতে ছিল। তাই আখেরাতের পক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসেবে তূরকে একটি উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের মত একটি অসহায় জাতির উত্থান ঘটানো এবং ফেরাউনের মত এক জবরদস্ত শাসককে সেনাবাহিনীসহ ডুবিয়ে দেয়া—যার ফায়সালা এক নিঝুম রাতে তূর পর্বতে গৃহীত হয়েছিল—এ ব্যাপারে মানবেতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত যে বিশ্ব-জাহানের বিশাল সাম্রাজ্যের স্বভাবসুলভ দাবী এই যে, মানুষের মত একটি বুদ্ধিমান ও স্বাধীন সৃষ্টির নৈতিক জবাবদিহি ও কর্মফল বিধানের আওতায় থাকা উচিত। আর এ দাবীর পূর্ণতা সাধনের জন্যই এমন একটি হিসেবের দিন আবশ্যক যেদিন গোটা মানব জাতিকে একত্রিত করে তার হিসেব নেয়া হবে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা যারিয়াত টীকা ২১)

পবিত্র আসমানী গ্রন্থসমূহের শপথ করার কারণ হচ্ছে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ায় যত নবী-রসূল এসেছেন এবং তাঁরা যেসব কিতাব এনেছেন, প্রতি যুগে তাঁরা সেই একটি মাত্র খবরই দিয়েছেন যা আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিচ্ছেন। অর্থাৎ পূর্বের ও পরের সমস্ত মানুষকে জীবিত হয়ে একদিন আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে এবং নিজের কৃতকর্ম অনুসারে পুরস্কার বা শাস্তি পেতে হবে। এমন কোন আসমানী কিতাব কখনো আসেনি যাতে এ খবর দেয়া হয়নি। কিংবা উল্টা মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ দুনিয়ার জীবনই জীবন। মৃত্যুর পরে তো মানুষ মাটিতে পরিণত হবে। সুতরাং এ জীবনের পরে কোন হিসেব-নিকেশের বালাই নেই।

বায়তুল মা'মূরের শপথ করার কারণ হলো, সে যুগে বিশেষভাবে আরবের লোকদের জন্য কা'বা ঘরের ইমারত এমন একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল যা আল্লাহর নবী-রসূলদের সত্যবাদিতার স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করছিল এবং মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ হিকমত এবং চরম শক্তিমত্তা যে তাদের পৃষ্ঠপোষক সে সাক্ষও পেশ করছিল। এসব আয়াত নাযিলের আড়াই হাজার বছর পূর্বে উষর ও জনবসতিহীন পাহাড়সমূহের মধ্যে কোন লোক-লস্কর ও সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই এক ব্যক্তি আসেন এবং তাঁর স্ত্রী ও দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে সম্পূর্ণ অসহায়ভাবে রেখে চলে যান। কিছুদিন পর সে ব্যক্তি পুনরায় সেখানে আসেন। এই জনহীন স্থানটিতে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করেন এবং লোকজনের প্রতি এ বলে আহবান জানান, হে লোকজন, এখানে আস এবং এ ঘরে হজ্জ আদায় করো। এ নির্মাণ কাজ ও আহবান এমন বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, ঐ ঘরটিই সমগ্র আরববাসীর কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ আহবানে সাড়া দিয়ে মানুষ আরবের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে লাব্বায়কা লাব্বায়কা বলে ছুটে আসে। আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত এ ঘর এমন শান্তির আস্তানা হয়ে থাকে যে, এর চারদিকে গোটা দেশময় খুনখারাবি চলতে থাকলেও এ ঘরের সীমানায় এসে কারো গায়ে হাত তোলার দুঃসাহস কারো হয় না। তাছাড়া এ ঘরের

কল্যাণেই আরব ভূমি প্রতি বছর চার মাসের জন্য এমন নিরাপত্তা লাভ করে যে, কাফেলাসমূহ তখন নিঃশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ করে, ব্যবসা-বাণিজ্য জমে ওঠে এবং ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বাজার বসতে থাকে। তাছাড়া এ ঘরের এমন প্রভাব বজায় থাকে যে, পুরো এ সময়-কালে অতি বড় কোন জালেমও সেদিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। আর যে এরূপ দুঃসাহস করেছে সে আল্লাহ তা'আলার এমন গযবের শিকার হয়েছে যে শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। এসব আয়াত নাযিল হওয়ার মাত্র ৪৫ বছর পূর্বে লোকজন এ রকম একটি মজার ঘটনা নিজ চোখে দেখেছিল এবং তা দর্শনকারী বহু লোক সে সময় মক্কায় জীবিতও ছিল। এমন পরিস্থিতিতেই এ আয়াতগুলো তাদের শোনানো হচ্ছিলো। আল্লাহর নবী যে ফাঁকা বুলি আওড়ান না এর চেয়ে তার বড় প্রমাণ আর কি হতে পারতো? আল্লাহর নবীদের চোখ এমন কিছু দেখতে পান যা অন্যদের দৃষ্টিগোচর হয় না, তাদের মুখ থেকে এমন সব মহাসত্য বেরিয়ে আসে সাধারণ মানুষের বিবেক-বুদ্ধি যার ধারে কাছেও যেতে পারে না। তাঁরা বাহ্যত এমন অনেক কাজ করেন যা দেখে এক যুগের লোক পাগলামি মনে করে বসে। কিন্তু তা দেখেই শতশত বছরের পরের লোকজন তাদের দূর দৃষ্টিতে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে। এ ধরনের মহান ব্যক্তিগণ সর্বসম্মতভাবে প্রতি যুগেই যখন এ খবর দেন যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং 'হাশর নাশর' অনুষ্ঠিত হবে, তখন তাকে পাগলের প্রলাপ মনে করাটাই পাগলামি।

সুউচ্চ ছাদ (আসমান) এবং তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের শপথ করার কারণ হলো, এ দু'টি জিনিস আল্লাহর হিকমত এবং ক্ষমতার প্রতি ইংগিত করে। তাছাড়া এ হিকমত ও ক্ষমতা দ্বারাই আখেরাতের সম্ভাব্যতা, অনিবার্যতা ও সংঘটিত হওয়া প্রমাণিত হয়। আসমান কিভাবে এ বিষয়ে ইংগিত করে সে সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে সূরা ক্বাফের ব্যাখ্যায় ৭নং টীকায় আলোচনা করেছি। বাকী থাকে শুধু সমুদ্রের বিষয়টি। তবে যে ব্যক্তি মুক্ত মনে ও অস্বীকার করার আগাম হঠকারী সিদ্ধান্ত ছাড়া সমুদ্র সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে, তার মন সাক্ষ দিতে বাধ্য যে, পৃথিবীর বুকে পানির এত বড় ভাণ্ডারের ব্যবস্থা হয়ে যাওয়াটাই এমন এক কারিগরী যা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল হতে পারে না। তাছাড়া এর সাথে এত বেশী যৌক্তিক বিষয় তত্ত্ব সংশ্লিষ্ট আছে যে, আকস্মিকভাবে এরূপ জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিসংগত ব্যবস্থা চালু হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সমুদ্রে অসংখ্য জীবজন্তু সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর প্রত্যেকটি প্রজাতিকে সমুদ্রের যে গভীরতায় বসবাসের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার দৈহিক ব্যবস্থাপনাও সেই গভীরতার উপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। সমুদ্রের মধ্যে প্রতিদিন কোটি কোটি জীবজন্তু মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। এসব জীবজন্তুর দেহ যাতে পচে গলে না যায় সে জন্য এর পানি লবণাক্ত বানানো হয়েছে। সমুদ্রের পানি একটি নির্দিষ্ট সীমায় থামিয়ে রাখা হয়েছে। পৃথিবীর ফাটলের মধ্যে প্রবেশ করে তা তার অভ্যন্তরে নেমে যায় না কিংবা স্থলভাগে উঠে তা প্লাবিত করে দেয় না। লাখ লাখ ও কোটি কোটি বছর ধরে তা এ সীমার মধ্যেই থেমে আছে। পানির এ বিশাল ভাণ্ডার বহাল থাকার কারণেই পৃথিবীর স্থলভাগে বৃষ্টির ব্যবস্থা হয়। সূর্যের তাপ এবং বায়ু প্রবাহ সম্পূর্ণ নিয়মিতভাবে এ ব্যবস্থাকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। প্রাণীশূন্য না হওয়ার এবং এর মধ্যে নানা রকমের জীবজন্তু সৃষ্টি হওয়ার সুফল হয়েছে এই যে, মানুষ সমুদ্র থেকে ব্যাপক পরিমাণে তার খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় বহু জিনিস লাভ করছে। একটি নির্দিষ্ট সীমায় থেমে থাকার কারণে মহাদেশ ও দ্বীপগুলো টিকে আছে, যেখানে মানুষ বাস করছে।

فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١١ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ۝١٢ يَوْمَ يُدَعُّوْنَ إِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۝١٣ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۝١٤ أَفَسِحْرٌ هٰذَآ أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ۝١٥ إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا أَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝١٦

ধ্বংস রয়েছে সেদিন সেসব অস্বীকারকারীদের জন্য যারা আজ তামাসাচ্ছলে নিজেদের যুক্তি–প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যস্ত আছে।[৯] যেদিন তাদের ধাক্কা দিতে দিতে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে সেদিন তাদের বলা হবে এতো সেই আগুন যা তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে। এখন বলো, এটা কি যাদু না এখনো তোমরা উপলব্ধি করতে পারছো না?[১০] যাও, এখন এর মধ্যে ঢুকে দগ্ধ হতে থাকো। তোমরা ধৈর্য ধর আর না ধর, এখন উভয়টিই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যেমন কাজ করে এসেছো ঠিক তেমন প্রতিদানই তোমাদের দেয়া হচ্ছে।

তা কতকগুলো অলংঘনীয় নিয়ম মেনে চলার কারণে সেখানে মানুষের জাহাজ চালানো সম্ভব হয়েছে। একজন মহাজ্ঞানীর জ্ঞান ও মহাক্ষমতাধরের ক্ষমতা ছাড়া এ সুব্যবস্থাপনার কল্পনাও করা যেতে পারে না এবং এ ধারণাও পোষণ করা যায় না যে, মানুষ এবং পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টির কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত সমুদ্রের এ সুশৃংখল ব্যবস্থাপনার যে সম্পর্ক তা আকস্মিক ও এলোপাতাড়িভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এটা যদি এ বিষয়ের অনস্বীকার্য প্রমাণ হয় যে, এক মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিধর আল্লাহ পৃথিবীর বুকে মানুষকে আবাদ করার জন্য আরো অসংখ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে বিশাল এ লবণাক্ত সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন তাহলে সে ব্যক্তি হবে চরম আহমক, যে মহাজ্ঞানী সেই আল্লাহ থেকে এমন মূর্খতা প্রত্যাশা করে যে, তিনি এ সমুদ্র থেকে মানুষের শস্য ক্ষেতসমূহ সিক্ত করে তার মাধ্যমে মানুষকে রিযিক দানের ব্যবস্থা করে দিবেন কিন্তু কখনো তাকে জিজ্ঞেস করবেন না যে, তুমি আমার রিযিক খেয়ে কিভাবে তার হক আদায় করেছো? তাছাড়া তিনি এ সমুদ্রের বুকে মানুষকে জাহাজ চালানোর ক্ষমতা দেবেন কিন্তু একথা কখনো জিজ্ঞেস করবেন না যে, তুমি ন্যায় ও সত্যের আনুগত্য করে জাহাজ চালিয়েছো না তার সাহায্যে সারা বিশ্বে ডাকাতি করে বেড়িয়েছো? অনুরূপভাবে যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্ষমতার একটি নগণ্য বিস্ময়কর নমুনা এ বিশাল সমুদ্রের সৃষ্টি, যিনি মহাশূন্যে আবর্তনকারী ঝুলন্ত এ গ্রহ পৃষ্ঠে পানির এত বড় ভাণ্ডার ধরে রেখেছেন, যিনি তার মধ্যে এমন বিশাল পরিমাণ লবণ গুলিয়ে দিয়েছেন, যিনি এর মধ্যে নানা রকমের অসংখ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন এবং এর মধ্য থেকেই তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন, যিনি প্রতি বছর সেখান থেকে শত শত কোটি টন পানি উঠিয়ে বাতাসের কাঁধে তুলে নিয়ে যান এবং কোটি কোটি বর্গমাইল ব্যাপী শুষ্ক অঞ্চলে নিয়মিতভাবে বর্ষণ করে চলেছেন তাঁর

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَكِهِينَ بِمَا آتَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

মুত্তাকীরা[১১] সেখানে বাগান ও নিয়ামতসমূহের মধ্যে অবস্থান করবে এবং তাদের রব তাদের যা কিছু দান করবেন তা মজা করে উপভোগ করতে থাকবে। আর তাদের রব তাদেরকে দোযখের আযাব থেকে বাঁচিয়ে নেবেন।[১২] (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা যেসব কাজ করে এসেছো তার বিনিময়ে মজা করে পানাহার করো।[১৩]

সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করাও চরম মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয় যে, তিনি মানুষকে একবার সৃষ্টি করার পর এমন অক্ষম হয়ে যান যে, পুনরায় তাকে সৃষ্টি করতে চাইলেও করতে পারেন না।

৭. মূল আয়াতাংশ হলো تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا । আরবী ভাষায় مور আবর্তিত হওয়া, কেঁপে কেঁপে ওঠা, ঘুরপাক খাওয়া এবং বারবার সামনে ও পেছনে চলা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিয়ামতের দিন আসমানের যে অবস্থা হবে একথাটির মাধ্যমে তা বর্ণনা করে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে, সেদিন উর্ধজগতের সমস্ত ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কেউ যদি সেদিন আকাশের দিকে তাকায় তবে দেখবে যে, সেই সুশোভিত নকশা বিকৃত হয়ে গিয়েছে যা সবসময় একই রকম দেখা যেতো আর চারদিকে একটা অস্থিরতা বিরাজ করছে।

৮. অন্য কথায় ভূপৃষ্ঠের আকর্ষণ ও বন্ধন পাহাড়কে আটকে রেখেছিল তা শিথিল হয়ে যাবে এবং তা সমূলে উৎপাটিত হয়ে এমনভাবে শূন্যে উড়তে থাকবে যেন মেঘমালা ভেসে বেড়াচ্ছে।

৯. অর্থাৎ তারা নবীর কাছে কিয়ামত, আখেরাত, জান্নাত ও দোযখের কথা শুনে সেগুলোকে হাসির খোরাক বানাচ্ছে এবং এ বিষয়ে সুস্থ মস্তিষ্কে গভীরভাবে চিন্তা করার পরিবর্তে কেবল বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করছে। আখেরাত নিয়ে তাদের বিতর্কের উদ্দেশ্য এর তাৎপর্য বুঝার প্রচেষ্টা নয়, বরং তা একটি খেলা যা দিয়ে তারা মনোরঞ্জন করে থাকে। কিন্তু এটা তাদের কোন্ পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে সে ব্যাপারে আদৌ কোন উপলব্ধি নেই।

১০. অর্থাৎ দুনিয়াতে রসূল যখন তোমাদেরকে এ জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে সাবধান করতেন তখন তোমরা বলতে, এটা কেবল কথার যাদুগিরি। আমাদেরকে এভাবে বোকা বানানো হচ্ছে। এখন বলো তোমাদের সামনে বিদ্যমান এ জাহান্নাম কি সেই যাদুর খেলা, নাকি এখনো বুঝে উঠতে পারনি, যে জাহান্নামের খবর তোমাদের দেয়া হতো তোমরা সে জাহান্নামের মুখোমুখি হয়েছো?

مُتَّكِـِٔيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۗ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾ وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢٢﴾

তারা সামনাসামনি রাখা সুসজ্জিত আসনসমূহে হেলান দিয়ে বসবে এবং আমি সুনয়না হুরদের তাদের সাথে বিয়ে দেব।[১৪] যারা ঈমান গ্রহণ করেছে এবং তাদের সন্তানরাও ঈমানসহ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে আমি তাদের সেসব সন্তানকেও তাদের সাথে (জান্নাতে) একত্রিত করে দেব। আর তাদের আমলের কোন ঘাটতি আমি তাদেরকে দেব না।[১৫] প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জিত কর্মের হাতে জিম্মী রয়েছে।[১৬] আমি তাদেরকে সব রকমের ফল, গোশত[১৭] এবং তাদের মন যা চাইবে তাই প্রচুর পরিমাণে দিতে থাকবো।

১১. অর্থাৎ যারা নবী–রসূলদের দেয়া খবরের ওপর ঈমান এনে দুনিয়ায় থাকতেই নিজেদের বাঁচানোর ব্যবস্থা করেছে এবং যেসব ধ্যান–ধারণা ও কাজ–কর্মের কারণে মানুষ জাহান্নামের উপযুক্ত হয়। তা থেকে দূরে অবস্থান করেছে।

১২. কোন ব্যক্তির জান্নাতে প্রবেশের কথা বলার পর তাকে দোযখ থেকে বাঁচিয়ে নেয়ার কথা বলার বাহ্যত কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু কুরআন মজীদের কয়েকটি জায়গায় এ দু'টি কথা আলাদা করে বলার কারণ হলো. কোন ব্যক্তির দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে যাওয়াটাই একটা বিরাট নিয়ামত। "আল্লাহ তাকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করেছেন" এ বাণীটি মূলত একটি মহাসত্যের প্রতি ইংগিত। মহাসত্যটি হলো, কোন ব্যক্তির দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়ে যাওয়া কেবল আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীতে সম্ভব। অন্যথায় মানবিক দুর্বলতা প্রত্যেক ব্যক্তির আমলে এমন সব অপূর্ণতার সৃষ্টি করে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁর মহানুভবতা দিয়ে তা উপেক্ষা না করেন এবং মুহাসাবা বা হিসেব–নিকেশ নিতে শুরু করেন তাহলে কেউ–ই পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারে না। তাই জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাওয়া আল্লাহর যত বড় নিয়ামত, দোযখ থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করে নেয়া তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

১৩. এখানে "মজা করে" কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থ বহন করে। মানুষ জান্নাতে যা লাভ করবে কোন প্রকার কষ্ট বা পরিশ্রম ছাড়াই তা লাভ করবে। তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়া বা ঘাটতি পড়ার আদৌ কোন সম্ভাবনা সেখানে থাকবে না। সে জন্য মানুষকে কোন খরচও করতে হবে না। তা হুবহু তার আকাংখা ও মনের পছন্দ মত হবে। যত চাইবে এবং যখনই চাইবে সামনে এনে হাজির করা হবে। সেখানে সে মেহমান হিসেবে অবস্থান

করবেন না যে, কিছু চাইতে লজ্জাবোধ করবে। সে যা কিছু লাভ করবে তা তার অতীত কাজের প্রতিদান হিসেবে এবং নিজের বিগত দিনের উপার্জনের ফল হিসেবে লাভ করবে। ঐ সব বস্তু পানাহারের কারণে কোন রকম রোগের আশংকা থাকবে না। ক্ষুধা নিবারণ এবং জীবন ধারণের জন্য ঐ সব নিয়ামত হবে না, বরং শুধু স্বাদ ও আনন্দ লাভের জন্য হবে। ব্যক্তি তা থেকে যত মজা ও স্বাদ লাভ করতে চাইবে ততই করতে পারবে; তাতে কোন প্রকার বদহজম হবে না। তাছাড়া ঐ সব খাদ্য কোন প্রকার নোংরা বর্জ্য সৃষ্টি করবে না। সুতরাং পৃথিবীতে মজা করে পানাহার করা যে অর্থ বহন করে জান্নাতে মজা করে পানাহার করা তা থেকে অনেক বেশী ব্যাপক ও উন্নত অর্থ বহন করে।

১৪. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফ্‌ফাত, টীকা ২৬–২৯; আদ্ দুখান, টীকা ৪২।

১৫. এ বিষয়টি ইতিপূর্বে সূরা রা'দের ২৩ আয়াত এবং সূরা মু'মিনের ৮ আয়াতেও উল্লেখিত হয়েছে। তবে এখানে পূর্বে দু'টি জায়গায় উল্লেখিত সুখবরের চেয়ে অতিরিক্ত একটি বড় সুখবর শোনানো হয়েছে। সূরা রা'দের আয়াতে শুধু এতটুকু বলা হয়েছিল যে, জান্নাতবাসীদের পিতা–মাতা–সন্তান–সন্ততি এবং স্ত্রীদের মধ্যে যেসব ব্যক্তি নেককার, তারা সবাই তার সাথে জান্নাতে যাবে। আর সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতারা ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে এ বলে দোয়া করে যে, তাদের সন্তান, স্ত্রী এবং বাপ–দাদার মধ্যে যারা নেক্‌কার তাদেরকেও জান্নাতে তাদের সাথে একত্রিত করে দাও। ঐ দু'টি আয়াতের বক্তব্যের চেয়ে অধিক যে কথাটি এখানে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে, সন্তান যদি কোন না কোন পর্যায়ের ঈমানসহ তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাহলে সে ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ঈমান ও আমলের কারণে তার পিতা যে মর্যাদা লাভ করেছে, আমলের দিক দিয়ে ঐ মর্যাদার উপযুক্ত না হলেও সন্তানদেরকে পিতার সাথে একত্রিত করা হবে। এই একত্র হওয়া মাঝে মাঝে গিয়ে সাক্ষাত করার মত হবে না। এ জন্য أَلْحَقْنَا بِهِمْ কথা ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ হলো জান্নাতে তাদেরকে পিতা–মাতার সাথেই রাখা হবে। এ ছাড়া আরো সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, সন্তানদের সাথে একত্রিত করার জন্য পিতা–মাতাদের মর্যাদা হ্রাস করে পদাবনতি করা হবে না। বরং পিতা–মাতাদের সাথে একত্রিত করার জন্য সন্তানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে তাদের পদোন্নতি দিয়ে ওপরে উঠানো হবে।

এখানে একথাটিও বুঝে নিতে হবে যে, নিজ ইচ্ছায় ও সংকল্পে ঈমান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং নেক্‌কার মুরুব্বীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে এ বাণী তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু কোন ঈমানদার ব্যক্তির সন্তান যদি ভাল মন্দ উপলব্ধি করার মত বয়সে উপনীত হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করে তবে তাদের ব্যাপারে কুফরী ও ঈমান এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাদের তো এমনিতেই জান্নাতে যাওয়ার কথা এবং তাদের পিতা–মাতার চোখ জুড়ানোর জন্য তাদের সাথে একত্রে রাখার কথা।

১৬. এখানে "জিম্মী বা বন্ধক" শব্দটির রূপক ব্যবহার অত্যন্ত অর্থবহ। কোন ব্যক্তি যদি কাউকে কিছু ঋণ দেয় এবং ঋণদাতা তার পাওনা আদায়ের নিশ্চয়তা হিসেবে ঋণ গ্রহীতার কোন জিনিস নিজের কাছে বন্ধক রাখে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঋণ পরিশোধ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধকী বস্তু মুক্ত হবে না। তাছাড়া নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার

পরও যদি বন্ধকী বস্তু মুক্ত না করে তাহলে বন্ধকী বস্তুটি বাজেয়াপ্ত বা হাতছাড়া হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলাও মানুষের মধ্যকার লেনদেনের বিষয়টিকে এখানে বন্ধকী লেনদেনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষকে যে সাজ–সরঞ্জাম, যেসব শক্তি, যেসব যোগ্যতা এবং যেসব ইখতিয়ার দিয়েছেন তা যেন মালিক তার বান্দাকে ঋণ দিয়েছেন। এ ঋণের জামানত হিসেবে বান্দা নিজেই আল্লাহর কাছে বন্ধক বা জিম্মী হয়ে রয়েছে। বান্দা যদি এসব সাজ–সরঞ্জাম, শক্তি এবং ইখতিয়ার সঠিকভাবে ব্যবহার করে নেকী অর্জন করে—যে নেকী দ্বারা এসব ঋণ পরিশোধ হবে, তাহলে সে বন্ধকী মাল অর্থাৎ নিজেকে মুক্ত করে নেবে। অন্যথায় তা বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হবে। পূর্ববর্তী আয়াতের পরপরই একথা বলার কারণ হচ্ছে, সৎকর্মশীল ঈমানদারগণ যত বড় মর্যাদা সম্পন্নই হোক না কেন তাদের সন্তানরা নিজেদের কর্ম দ্বারা নিজেদের সত্তাকে মুক্ত না করলে তাদের বন্ধক মুক্তি হতে পারে না। বাপ–দাদার কর্ম সন্তানদের মুক্ত করতে পারে না। তবে সন্তানরা যদি যে কোন মাত্রার ঈমান ও সৎকর্মশীলদের আনুগত্য দ্বারা নিজেরা নিজেদের মুক্ত করতে পারে তাহলে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাদেরকে নিম্ন মর্যাদা থেকে উচ্চ মর্যাদা দিয়ে বাপ–দাদার সাথে একত্রিত করে দেবেন। এটা নিছক আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানী ও দয়া। সন্তানরা বাপ–দাদার সৎকাজের এ সুফলটুকু অন্তত লাভ করতে পারে। তবে তারা যদি নিজেদের কর্মদ্বারা নিজেরাই নিজেদেরকে দোযখের উপযোগী বানায় তাহলে এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয় যে, বাপ–দাদার কারণে তাদেরকে জান্নাতে পৌছিয়ে দেয়া হবে। সাথে সাথে এ আয়াত থেকে একথাও বুঝা যায় যে, নিম্ন মর্যাদার নেক সন্তানদের নিয়ে উচ্চ মর্যাদার নেক পিতা–মাতার সাথে একত্রিত করে দেয়া প্রকৃতপক্ষে সেসব সন্তানের কর্মের ফল নয়, বরং তা ঐসব পিতা–মাতার কর্মের ফল। তারা নিজেদের আমল দ্বারা এ মর্যাদা লাভের উপযুক্ত হবে। তাই তাদের মন খুশী করার জন্য সন্তানদেরকেও তাদের সাথে একত্রিত করা হবে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মর্যাদা হ্রাস করে তাদেরকে তাদের সন্তানদের কাছে নিয়ে যাবেন না। বরং সন্তানদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে তাদের কাছে নিয়ে যাবেন; যাতে নিজ সন্তানদের থেকে দূরে অবস্থানের কারণে মনকষ্ট না হয় এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিয়ামতসমূহ পূর্ণ করে দেয়ার ক্ষেত্রে এ কমতিটুকু না থেকে যায়।

১৭. এ আয়াতটিতে জান্নাতবাসীদেরকে সব রকমের গোশত সরবরাহ করার কথা উল্লেখ আছে। আর সূরা ওয়াকিয়ার ২১ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে পাখীর গোশত দিয়ে আপ্যায়ন করা হবে। এ গোশত কি প্রকৃতির হবে তা আমরা সঠিক জানি না। কিন্তু কুরআনের কোন কোন আয়াতে এবং কোন কোন হাদীসে জান্নাতের দুধ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তা জীব–জন্তুর পালান থেকে নির্গত হবে না। জান্নাতের মধু সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা মৌমাছির মধু হবে না। আর জান্নাতের শরাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা ফল পচিয়ে তার নির্যাসে তৈরী হবে না। আল্লাহর কুদরতে এগুলো ঝর্ণাসমূহ থেকে নির্গত হবে এবং নদীতে প্রবাহিত হবে। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, জান্নাতের গোশতও জবাইকৃত জীব–জন্তুর গোশত হবে না, বরং কুদরতি পন্থায় তৈরী হবে। যে আল্লাহ মাটির উপাদানসমূহ থেকে সরাসরি দুধ, মধু ও শরাব তৈরী করতে সক্ষম, তিনি এসব উপাদান দিয়েই জীব–জন্তুর গোশতের চেয়েও অধিক সুস্বাদ গোশত তৈরী করে দিতে পারেন। এটা

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٤﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

তারা সেখানে পরস্পরের নিকট থেকে ক্ষিপ্রতার সাথে শরাব পাত্র গ্রহণ করতে থাকবে। কিন্তু সেখানে কোন অপ্রয়োজনীয় কথা থাকবে না এবং থাকবে না কোন চরিত্রহীনতা।[১৮] তাদের সেবার জন্য সেসব বালকেরা ছুটাছুটি করতে থাকবে যারা কেবল তাদের জন্য নির্দিষ্ট হবে[১৯] তারা এমন সুদর্শন যেন সযত্নে লুকিয়ে রাখা মোতি। তারা একে অপরকে (পৃথিবীতে অতিবাহিত) অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। তারা বলবে আমরা প্রথমে নিজের পরিবারের লোকদের মধ্যে ভয়ে ভয়ে জীবন যাপন করতাম।[২০] পরিশেষে আল্লাহ আমাদের ওপর মেহেরবানী করেছেন এবং দগ্ধকারী[২১] আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন। অতীত জীবনে আমরা তাঁর কাছেই দোয়া করতাম সত্যিই তিনি অতি বড় উপকারী ও দয়াবান।

তাঁর ক্ষমতার অসাধ্য নয়। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফ্ফাত টীকা ২৫; সূরা মুহাম্মাদ, টীকা ২১ থেকে ২৩)।

১৮. অর্থাৎ সেই শরাব নেশা সৃষ্টিকারী হবে না। তাই তা পান করে কেউ মাতাল হয়ে বেহুদা ও আবোলতাবোল বকবে না, গালি–গালাজ করবে না, চড় থাপ্পড় দেবে না কিংবা দুনিয়ার শরাব পানকারীদের মত অশ্লীল ও অশালীন আচরণ করবে না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফ্ফাত, টীকা ২৭)।

১৯. এ সূক্ষ্ম বিষয়টি বিশেষ লক্ষণীয় যে, غِلْمَانُهُمْ বলা হয়নি, বরং غِلْمَانٌ لَّهُمْ বলা হয়েছে। যদি غِلْمَانُهُمْ বলা হতো তাহলে তা থেকে এ ধারণা করা যেতে পারতো যে, দুনিয়ায় যারা তাদের খাদেম ছিল জান্নাতেও তাদেরকেই তাদের খাদেম বানিয়ে দেয়া হবে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে দুনিয়ার যে ব্যক্তিই জান্নাতে যাবে সে তার উপযুক্ত পাত্র হিসেবেই যাবে এবং দুনিয়ায় সে যে প্রভুর খেদমত করতো বেহেশতেও তাকে সেই প্রভুর খাদেম বানিয়ে দেয়া হবে তার কোন কারণ নেই। বরং এমনও হতে পারে যে, কোন খাদেম তার নেক আমলের কারণে জান্নাতে প্রভুর চেয়েও উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। সুতরাং غِلْمَانٌ لَّهُمْ বলে এ ধারণা পোষণের কোন অবকাশই রাখা হয়নি। এ শব্দটি

فَذَكِّرْ فَمَآ أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ﴿٢٩﴾ أَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ﴿٣٠﴾ قُلْ تَرَبَّصُوْا فَإِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ﴿٣١﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ إِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٣٤﴾

২ রুকূ’

তাই হে নবী (সা), তুমি উপদেশ দিতে থাক। আল্লাহর মেহেরবাণীতে তুমি গণকও নও, পাগলও নও।[২২]

এসব লোক কি বলে যে, এ ব্যক্তি কবি, যার ব্যাপারে আমরা কালের আবর্তনের অপেক্ষা করছি।[২৩] *তাদেরকে বলো, ঠিক আছে অপেক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।*[২৪] *তাদের বিবেক–বুদ্ধি কি তাদেরকে এসব কথা বলতে প্ররোচিত করে, না কি প্রকৃতপক্ষে তারা শত্রুতায় সীমালংঘনকারী লোক?*[২৫]

তারা কি বলে যে, এ ব্যক্তি নিজেই কুরআন রচনা করে নিয়েছে? প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে তারা ঈমান গ্রহণ করতে চায় না।[২৬] *তাদের একথার ব্যাপারে তারা যদি সত্যবাদী হয় তাহলে এ বাণীর মত একটি বাণী তৈরী করে আনুক।*[২৭]

এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয় যে, এরা হবে সেই সব বালক যাদেরকে জান্নাতে তাদের খেদমতের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফ্ফাত, টীকা ২৬)।

২০. অর্থাৎ আমরা সেখানে বিলাসিতায় ডুবে এবং আপন ভূবনে মগ্ন থেকে গাফলতির জীবন যাপন করিনি। সেখানে সবসময়ই আমাদের আশংকা থাকতো যে, কখন যেন আমাদের দ্বারা এমন কোন কাজ হয়ে যায়, যে কারণে আল্লাহ আমাদের পাকড়াও করবেন। এখানে বিশেষ করে নিজের পরিবারের লোকদের মধ্যে ভয়ে ভয়ে জীবন যাপন করার উল্লেখ করার কারণ এই যে, মানুষ বেশীর ভাগ যে জন্য গোনাহে লিপ্ত হয় তা হচ্ছে তার সন্তান–সন্ততির আরাম–আয়েসের ব্যবস্থা করা এবং তাদের দুনিয়া নির্মাণের চিন্তা। এ জন্য সে হারাম উপার্জন করে, অন্যদের অধিকার লুণ্ঠন করে এবং নানা রকম অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। এ কারণে জান্নাতের বাসিন্দারা পরস্পর বলবে বিশেষভাবে যে জিনিসটি

আমাদেরকে মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করেছে তা হচ্ছে, নিজের সন্তান–সন্ততিদের মধ্যে জীবন যাপন করতে গিয়ে তাদের আরাম–আয়েশে রাখার এবং তাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করার ততটা চিন্তা ছিল না যতটা চিন্তা ছিল এ ব্যাপারে যে, তাদের জন্য আমরা যেন এমন পন্থা অবলম্বন করে না বসি, যার দ্বারা আমাদের আখেরাত বরবাদ হয়ে যাবে, আর নিজের সন্তানদেরকেও আমরা এমন পথে নিয়ে যাবো যা তাদেরকে আল্লাহর আযাবের উপযোগী বানিয়ে দেবে।

২১. মূল আয়াত سَمُوم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ চরম উষ্ণ হাওয়া। অর্থাৎ দোযখ থেকে উত্থিত উত্তপ্ত হাওয়ার ঝাপটা।

২২. মক্কার কাফেররা জুলুম ও হঠকারিতার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মোকাবিলা করছিল। ওপরে আখেরাতের চিত্র পেশ করার পর এখন বক্তব্যের মোড় এখানে তাদের জুলুম ও হঠকারিতার দিকে ঘুরে যাচ্ছে। এখানে বাহ্যতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তার মাধ্যমে মক্কার কাফেরদেরকেই এসব কথা শুনানো হচ্ছে। তিনি যখন তাদের সামনে কিয়ামত, হাশর–নাশর, হিসেব–নিকেশ, শাস্তি ও পুরস্কার এবং জান্নাত ও জাহান্নামের কথা বলতেন আর এসব বিষয় সম্বলিত কুরআন মজীদের আয়াত শুনিয়ে দাবী করতেন, এসব খবর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে এসেছে, এ হচ্ছে আল্লাহর বাণী, আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে এ বাণী নাযিল করেছেন তখন তাদের নেতৃবৃন্দ, ধর্মীয় পুরোহিত গোষ্ঠী এবং তাদের বখাটে লোকেরা তাঁর এ বক্তব্য যেমন কখনো সুস্থ মস্তিষ্কে ভেবে–চিন্তে দেখতো না, তেমনি এও চাইতো না যে, জনসাধারণ তাঁর বক্তব্যের প্রতি মনোযোগ দিক। তাই তারা কখনো বলতো তিনি গণক, কখনো বলতো তিনি পাগল, কখনো বলতো তিনি কবি, আবার কখনো বলতো তিনি নিজেই এসব অদ্ভূত কথা রচনা করেন এবং নিজের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর নাযিলকৃত অহী বলে পেশ করেন। তাদের ধারণা ছিল, এভাবে অপবাদ আরোপ করে মানুষের মনে তাঁর ব্যাপারে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে দিতে পারবে এবং তাঁর সব কথা ব্যর্থ হয়ে যাবে। সূতরাং এখানে বলা হচ্ছে, হে নবী, বাস্তব অবস্থা তো তাই যা সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এসব কারণে এসব লোক যদি তোমাকে গণক এবং পাগল বলে তাহলে তার পরোয়া করো না। আল্লাহর বান্দাদেরকে তাদের গাফলতি সম্পর্কে সতর্ক এবং প্রকৃত সত্য সম্পর্কে সাবধান করার কাজ করতে থাকো। কারণ, আল্লাহর মেহেরবানীতে তুমি গণকও নও, পাগলও নও।

আরবী ভাষায় كَاهِن শব্দটি জোতিষী, ভবিষ্যৎ বক্তা ও জ্ঞানবান অর্থে ব্যবহৃত হয়। জাহেলী যুগে এটি একটি স্বতন্ত্র পেশা ছিল। গণকরা দাবী করতো এবং দুর্বল আকীদার লোকেরা মনে করতো যে, তারা নক্ষত্র বিশারদ বা আত্মা, শয়তান ও জিনদের সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক আছে, যার মাধ্যমে তারা গায়েবী খবর জানতে পারে। কোন জিনিস হারিয়ে গেলে তা কোথায় পড়ে আছে তা তারা বলে দিতে পারে। কারো বাড়ীতে চুরি হলে কে চোর তা তারা বলে দিতে পারে। কেউ তার ভাগ্য সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা বলে দিতে পারে তার ভাগ্যে কি লেখা আছে। মানুষ এসব উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের কাছে যেতো। তারা কিছু নযর–নিয়াজ নিয়ে তাদেরকে গায়েবী কথা বলে দিতো। মানুষ যাতে তাদের

কাছে আসে এ উদ্দেশ্যে তারা নিজেরাও অনেক সময় বস্তিতে গিয়ে হাঁক ছেড়ে বেড়াতো। তাদের একটা বিশেষ ঢং হতো, যা দিয়ে তাদের চেনা যেতো। তাদের কথাবার্তাও সাধারণ বোলচাল থেকে ভিন্ন হতো। তারা বিশেষ ভংগীতে কিছুটা গানের সুরে ছন্দবদ্ধ কথা বলতো এবং সাধারণত এমন হেঁয়ালিপূর্ণ কথা বলতো যা থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি তার মনের কথার সন্ধান করে নিতে পারে। জনসাধারণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য কুরাইশ নেতারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তারা গণক হওয়ার অপবাদ আরোপ করেছিল। আর তা করেছিল শুধু এ কারণে যে, তিনি এমন সব বিষয়ে কথা বলতেন যা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে ছিল, তাছাড়া তিনি দাবী করতেন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা এসে তাঁর কাছে অহী নাযিল করে এবং আল্লাহর যে বাণী তিনি পেশ করেন তাও ছিল ছন্দায়িত। কিন্তু তাদের এ অপবাদের কারণে আরবের কোন মানুষই প্রতারিত হয়নি। কারণ গণকদের পেশা, তাদের চালচলন, তাদের কথাবার্তা এবং তাদের কারবার কারোই অজানা ছিল না। সবাই জানতো, তারা কি কাজ করে, কি উদ্দেশ্যে লোকজন তাদের কাছে যায়, কি কি কথা তারা তাদেরকে বলে, তাদের ছন্দবদ্ধ কথাগুলো কেমন হয় এবং তার বিষয়বস্তু কি থাকে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এটা আদৌ কোন গণকের কাজ হতে পারে না যে, জাতির মধ্যে তৎকালে প্রচলিত আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী আকীদা-বিশ্বাস সে তুলে ধরবে, দিনরাত তার প্রচার প্রসারে জীবনপাত করবে এবং সে জন্য গোটা জাতির শত্রুতার ঝুঁকি নেবে। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গণক হওয়ার এ অপবাদের নাম মাত্র সামঞ্জস্যও ছিল না। তাই নবীর (সা) ওপর এ অপবাদ আরোপ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সুতরাং আরবের কোন নিরেট বোকা লোকও এতে প্রতারিত হয়নি।

অনুরূপভাবে মক্কার কাফেররা নিছক তাদের মনের সান্ত্বনার জন্য নবীকে (সা) পাগল হওয়ার অপবাদ দিতো। যেমন বর্তমান যুগের কোন কোন বেশরম পাশ্চাত্য লেখক ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের হিংসা চরিতার্থ করার জন্য দাবী করে যে, নবীর (সা) ওপর মৃগি রোগের (Epilepsy) আক্রমণ হতো এবং আক্রান্ত অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে যেসব কথা বের হতো লোকে তাকেই অহী মনে করতো। সে যুগের কোন জ্ঞানী লোকও এসব বেহুদা অপবাদকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেনি, এ যুগের কোন মানুষও কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে সাধিত বিস্ময়কর কীর্তিসমূহ দেখে একথা বিশ্বাস করতে পারে না যে, এসব কিছু মৃগী রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফল।

২৩. অর্থাৎ এ ব্যক্তির ওপর কোন আকস্মিক বিপদ আপতিত হোক এবং আমরা তার জ্বালাতন থেকে রক্ষা পাই, এ জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। সম্ভবত তাদের ধারণা ছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু আমাদের উপাস্যদের বিরোধিতা এবং তাদের অলৌকিক কর্মকাণ্ড অবিশ্বাস করেন, তাই হয় তাঁর ওপরে আমাদের কোন উপাস্য দেব-দেবীর কোপানল পড়বে অথবা কোন দুঃসাহসী বীর তার এসব কথা শুনে ধৈর্য হারিয়ে ফেলবে এবং তাকে হত্যা করবে।

২৪. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, আমিও দেখছি তোমাদের এ আকাংখা পূরণ হয় কিনা। অপর অর্থটি হচ্ছে, দুর্ভাগ্য আমার আসে না তোমাদের আসে, তা দেখার জন্য আমিও অপেক্ষা করছি।

২৫. এ দু'টি বাক্যে বিরোধীদের সমস্ত অপপ্রচার খণ্ডন করে দিয়ে তাদের মুখোশ সম্পূর্ণরূপে খুলে দেয়া হয়েছে। যুক্তির সারকথা হলো, কুরাইশদের এসব নেতা ও প্রবীণ ব্যক্তি বড় বড় জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান সেজে বসে আছে। কিন্তু তাদের জ্ঞানবুদ্ধি কি বলে, যে ব্যক্তি কবি নয় তাকে কবি বলো, গোটা জাতির লোক যাকে একজন জ্ঞানী বলে জানে তাকে পাগল বলো এবং গণনা বিদ্যার সাথে যার দূরতম সম্পর্কও নেই তাকে অযথা গণক বলে আখ্যায়িত করো। এরপরও যদি তারা জ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতেই এ সিদ্ধান্ত নিতো তাহলে যে কোন একটি কথাই বলতো। অনেকগুলো পরস্পর বিরোধী উপাধি তো কাউকে একসাথে দেয়া যায় না। এক ব্যক্তি কবি, পাগল ও গণক একই সাথে কিভাবে হতে পারে? সে যদি পাগল হয়ে থাকে তাহলে গণক বা কবি হতে পারে না। গণক হলে কবি হতে পারে না এবং কবি হলে গণক হতে পারে না। কেননা, কবিতার ভাষা ও আলোচ্য বিষয় যা গণক বা জোতিষীদের ভাষা ও বিষয়বস্তু তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একই কথাকে যুগপৎ কাব্য ও গণকদের গণনা বলে আখ্যায়িত করা এমন কোন ব্যক্তির কাজ হতে পারে না, যে কাব্য ও গণনা বিদ্যার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত। অতএব, এটা অত্যন্ত পরিষ্কার কথা যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে পরস্পর বিরোধী কথা ও মন্তব্য জ্ঞান–বুদ্ধির ভিত্তিতে নয়, বরং সরাসরি জিদ ও হঠকারিতার ভিত্তিতে করা হচ্ছে। জাতির এসব বড় বড় নেতা শুধু শত্রুতার আতিশয্যে অন্ধ হয়ে এমন সব ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপ করছে যা কোন সুস্থ ও স্থির মস্তিষ্কের মানুষ গ্রহণযোগ্য মনে করতে পারে না। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আ'রাফ, টীকা ১০৪; ইউনুস, টীকা ৩; বানী ইসরাঈল, টীকা ৫৩, ৫৪; আশ শু'আরা, টীকা ১৩০, ১৩১, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪)

২৬. অন্য কথায় এ উক্তির তাৎপর্য হচ্ছে, কুরাইশদের মধ্যে যেসব লোক বলতো, কুরআন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচিত বাণী তারাও জানতো যে, এটা তাঁর বাণী হতে পারে না। তাছাড়া অন্য যেসব লোকের ভাষা আরবী, তারা এ বাণী শোনা মাত্র পরিষ্কার বুঝে ফেলতো যে, এটা মানুষের কথার চেয়ে অনেক উর্ধের জিনিসই শুধু নয়, বরং তাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানতো সে কখনো ধারণাই করতে পারতো না যে, এটা সত্যিই তাঁর নিজের কথা। অতএব, পরিষ্কার ও সোজা কথা হলো, কুরআনকে তাঁর নিজের রচনা বলে আখ্যা দানকারীরা আসলে ঈমান আনতে চায় না। তাই তারা নানা রকমের মিথ্যা বাহানা খাড়া করছে। আর এটি সেসব বাহানারই একটি। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, ইউনুস, টীকা ২১; আল ফুরকান, টীকা ১২; আল কাসাস, টীকা ৬৪; আল আনকাবূত, টীকা ৮৮–৮৯; আস সাজদা, টীকা ১ থেকে ৪; হা–মীম আস সাজদা, টীকা ৫৪; আল আহকাফ, টীকা ৮ থেকে ১০)

২৭. অর্থাৎ কথা শুধু এ টুকু নয় যে, এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী নয়, বরং এটা আদৌ মানুষের কথা নয়। এ রকম বাণী রচনা করাও মানুষের সাধ্যাতীত। তোমরা যদি একে মানুষের কথা বলতে চাও তাহলে মানুষের রচিত এ মানের কোন কথা এনে প্রমাণ করো। শুধু কুরাইশদেরকে নয়, সারা দুনিয়ার মানুষকে এ আয়াতের মাধ্যমে সর্বপ্রথম এ চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল। এরপর পুনরায় মক্কায়

তিনবার এবং মদীনায় শেষ বারের মত এ চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। (দেখুন ইউনুস, আয়াত ৩৮; হূদ, ১৩; বনী ইসরাঈল, ৮৮; আল বাকারা, ২৩)। কিন্তু সে সময়ও কেউ এর জবাব দেয়ার সাহস দেখাতে পারেনি। তার পরেও আজ পর্যন্ত কেউ কুরআনের মোকাবিলায় মানুষের রচিত কোন কিছু পেশ করার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। কেউ কেউ এ চ্যালেঞ্জের প্রকৃত ধরন না বুঝার কারণে বলে থাকে, শুধু কুরআন কেন, কোন একক ব্যক্তির নিজস্ব রীতিতেও অন্য কেউ গদ্য বা কবিতা লিখতে সমর্থ হয় না। হোমার, রুমী, সেক্সপিয়ার, গেটে, গালিব, ঠাকুর, ইকবাল সবাই এদিক দিয়ে অনুপম যে তাদের অনুকরণ করে তাদের মত কথা রচনা করার সাধ্য কারোই নেই। কুরআনের চ্যালেঞ্জের এ জবাবদাতারা প্রকৃতপক্ষে এ বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছে যে, فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ আয়াতাংশের অর্থ হুবহু কুরআনের মতই কোন গ্রন্থ রচনা করে দেয়া। অথচ এর অর্থ বাকরীতির দিক দিয়ে সমমান নয়। এর অর্থ সামগ্রিকভাবে এর গুরুত্ব ও মর্যাদার সমপর্যায়ের কোন গ্রন্থ নিয়ে এসো। যেসব বৈশিষ্টের কারণে কুরআন একটি মু'জিযা ঐ গ্রন্থও সে একই রকম বৈশিষ্ট মণ্ডিত সমপর্যায়ের হতে হবে। যেসব বড় বড় বৈশিষ্টের কারণে কুরআন পূর্বেও মু'জিযা ছিল এবং এখনো মু'জিযা তার কয়েকটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ যে ভাষায় কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে তা সে ভাষার সাহিত্যের উচ্চতম ও পূর্ণাঙ্গ নমুনা। গোটা গ্রন্থের একটি শব্দ বা একটি বাক্যও মানের নিচে নয়। যে বিষয়টিই ব্যক্ত করা হয়েছে সেটিই উপযুক্ত শব্দ ও উপযুক্ত বাচনভংগীতে বর্ণনা করা হয়েছে। একই বিষয় বার বার বর্ণিত হয়েছে এবং প্রতিবারই বর্ণনার নতুন ভংগী গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু সেজন্য পৌনপুনিকতার দৃষ্টিকটূতা ও শ্রুতিকটূতা কোথাও সৃষ্টি হয়নি। গোটা গ্রন্থে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শব্দের গাঁথুনি এমন যেন আংটির মূল্যবান পাথরগুলো ছেঁটে ছেঁটে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। কথা এতটা মর্মস্পর্শী যে, তা শুনে ভাষাভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিই মাথা নিচু না করে থাকতে পারে না। এমন কি অমান্যকারী এবং বিরোধী ব্যক্তির মনপ্রাণ ও ভাবাবেগ পর্যন্ত উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। ১৪ শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আজ অবধি এ গ্রন্থ তার ভাষায় সাহিত্যের সবচেয়ে উন্নত নমুনা। এর সমপর্যায়ের তো দূরের কথা সাহিত্যিক মর্যাদা ও মূল্যমানে আরবী ভাষার কোন গ্রন্থ আজ পর্যন্ত এর ধারে কাছেও পৌছেনি। শুধু তাই নয়, এ গ্রন্থ আরবী ভাষাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে বসেছে যে, ১৪ শত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এ ভাষার বিশুদ্ধতার মান তাই আছে যা এ গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল। অথচ এ সময়ের মধ্যে ভাষাসমূহ পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। পৃথিবীতে আর কোন ভাষা এমন নেই যা এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত লিখন পদ্ধতি, রচনা রীতি, বাচনভংগী, ভাষার নিয়ম-কানুন এবং শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে একই রূপ নিয়ে টিকে আছে। কিন্তু এটা শুধু কুরআনের শক্তি যা আরবী ভাষাকে স্থানচ্যুত হতে দেয়নি। আজ পর্যন্ত এর একটি শব্দও পরিত্যক্ত হয়নি। এর প্রতিটি বাকরীতি অদ্যাবধি আরবী ভাষায় প্রচলিত আছে। এর সাহিত্যমান আজ পর্যন্ত আরবী ভাষার উচ্চ মানের সাহিত্য। ১৪ শত বছর আগে কুরআনে যে বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল বক্তৃতা ও লেখায় আজও সেটাই বিশুদ্ধ ভাষা বলে মানা হচ্ছে। দুনিয়ার কোন ভাষায় মানুষের রচিত কোন গ্রন্থ কি এ মর্যাদা লাভ করেছে!

দুই ঃ এটা পৃথিবীর একমাত্র গ্রন্থ যা মানব জাতির ধ্যান–ধারণা, স্বভাব–চরিত্র, সভ্যতা–সংস্কৃতি এবং জীবন প্রণালীর ওপর এমন ব্যাপক, এমন গভীর এবং এমন সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছে যে, পৃথিবীতে তার কোন নজির পাওয়া যায় না। এর প্রভাব প্রথমে একটি জাতির মধ্যে পরিবর্তন আনলো। অতপর সেই জাতি তৎপর হয়ে পৃথিবীর একটি বিশাল অংশে পরিবর্তন আনলো। দ্বিতীয় আর কোন গ্রন্থ নেই যা এতটা বিপ্লবাত্মক প্রমাণিত হয়েছে। এ গ্রন্থ কেবলমাত্র কাগজের পৃষ্ঠাসমূহেই লিপিবদ্ধ থাকেনি বরং তার এক একটি শব্দ ধ্যান–ধারণাকে বাস্তবে রূপদান করেছে এবং একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা নির্মাণ করেছে। ১৪ শত বছর ধরে তার এ প্রভাব চলে আসছে এবং দিনে দিনে তা আরো বিস্তৃত হচ্ছে।

তিন ঃ এ গ্রন্থ যে বিষয়ে আলোচনা করে তা একটি ব্যাপকতর বিষয়। এর পরিধি আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত গোটা বিশ্ব–জাহানকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। এ গ্রন্থ বিশ্ব–জাহানের তাৎপর্য তার শুরু ও শেষ এবং তার নিয়ম–শৃংখলা সম্পর্কে বক্তব্য ও মত পেশ করে। এ গ্রন্থ বলে দেয় এ বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা, শৃংখলাবিধানকারী এবং পরিচালক কে? কি তাঁর গুণাবলী, কি তাঁর ইখতিয়ার ও ক্ষমতা এবং কি সেই মূল ও আসল বিষয় যার ভিত্তিতে তিনি এ গোটা বিশ্ব ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে এ পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করে বলে দেয় যে, এটা তার স্বাভাবিক অবস্থান এবং এটা তার জন্মগত মর্যাদা। সে এ অবস্থান ও মর্যাদা পাল্টে দিতে সক্ষম নয়। এ অবস্থান ও মর্যাদার দিক দিয়ে মানুষের জন্য সত্য ও বাস্তবতার সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল সঠিক পথ কি এবং সত্য ও বাস্তবের সাথে সংঘাতপূর্ণ ভ্রান্ত পথ কি তা সে বলে দেয়। সঠিক পথের সঠিক হওয়া এবং ভ্রান্ত পথের ভ্রান্ত হওয়া প্রমাণের জন্য সে যমীন ও আসমানের এক একটি বস্তু থেকে, মহাবিশ্ব ব্যবস্থার এক একটি প্রান্ত থেকে মানুষের নিজের আত্মা ও সত্তা থেকে এবং মানুষেরই নিজের ইতিহাস থেকে অসংখ্য যুক্তি–প্রমাণ পেশ করে। এর সাথে সে বলে দেয় মানুষ কিভাবে ও কি কি কারণে ভ্রান্ত পথে চলেছে এবং প্রতি যুগে তাকে কিভাবে সঠিক পথ বাতলে দেয়া হয়েছে যা সবসময় একই ছিল এবং একই থাকবে। সে কেবল সঠিক পথ দেখিয়েই ক্ষান্ত হয় না। বরং সে পথে চলার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার চিত্র পেশ করে যার মধ্যে আকায়েদ, আখলাক, আত্মার পরিশুদ্ধি, ইবাদাত–বন্দেগী, সামাজিকতা, তাহযীব, তামাদ্দুন, অর্থনীতি, রাজনীতি ন্যায়বিচার, আইন–কানুন—এক কথায় মানব জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে অত্যন্ত সুসংবদ্ধ বিধি–বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া এ সঠিক পথ অনুসরণ করার এবং ভ্রান্ত পথসমূহে চলার কি কি ফলাফল এ দুনিয়ায় দেখা দেবে এবং দুনিয়ার বর্তমান ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ার পর অন্য আরেকটি জগতে দেখা দেবে তাও সে বিস্তারিত বলে দেয়। সে এ দুনিয়ার পরিসমাপ্তি এবং আরেকটি দুনিয়া প্রতিষ্ঠার অবস্থা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে; এ পরিবর্তনের সমস্ত স্তর এক এক করে বলে দেয়, দৃষ্টির সামনে পরজগতের পূর্ণ চিত্র অংকন করে এবং সেখানে মানুষ কিভাবে আরেকটি জীবন লাভ করবে তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করে, কিভাবে তার পার্থিব জীবনের কার্যাবলীর হিসেব–নিকেশ হবে, কোন্ কোন্ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, কেন অনস্বীকার্য রূপে তার সামনে তার আমলনামা পেশ করা হবে। সেসব কাজের প্রমাণ স্বরূপ কি ধরনের অকাট্য সাক্ষসমূহ পেশ করা হবে, পুরস্কার ও শাস্তিলাভকারী কেন পুরস্কার ও শাস্তিলাভ

করবে। পুরস্কার লাভকারীরা কি ধরনের পুরস্কারলাভ করবে এবং শাস্তি প্রাপ্তরা কি কি ভাবে তাদের কার্যাবলীর মন্দফল ভোগ করবে, এ ব্যাপক বিষয়ে যে বক্তব্য এ গ্রন্থে পেশ করা হয়েছে তার মর্যাদা এমন নয় যে, তার রচয়িতা তর্ক শাস্ত্রের কিছু যুক্তিতর্ক একত্রিত করে কতকগুলো অনুমানের প্রাসাদ নির্মাণ করছেন, বরং এর রচয়িতা প্রকৃত সত্য সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান রাখেন, তাঁর দৃষ্টি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু দেখছে। সমস্ত সত্য তাঁর কাছে উন্মুক্ত। মহাবিশ্বের গোটাটাই তাঁর কাছে একখানা উন্মুক্ত গ্রন্থের মত। মানব জাতির শুরু থেকে শেষ পর্যন্তই শুধু নয়। লয় প্রাপ্তির পর তার অপর জীবনও তিনি যুগপৎ এক দৃষ্টিতে দেখছেন এবং শুধু অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে নয়, জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষকে পথপ্রদর্শন করছেন। এ গ্রন্থ যেসব সত্যকে তাত্ত্বিকভাবে পেশ করে থাকে আজ পর্যন্ত তার কোন একটিকে ভুল বা মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায়নি। বিশ্ব–জাহান ও মানুষ সম্পর্কে সে যে ধারণা পেশ করে তা সমস্ত দৃশ্যমান বস্তু ও ঘটনাবলীর পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা পেশ করে এবং জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় গবেষণার ভিত্তি রচনা করে। দর্শন বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞানের সমস্ত সাম্প্রতিকতম প্রশ্নের জবাব তার বাণীতে বর্তমান এবং এসবের মধ্যে এমন একটা যৌক্তিক সম্পর্ক বিদ্যমান যে, ঐগুলোকে ভিত্তি করে একটি পূর্ণাংগ সুসংবদ্ধ ও ব্যাপক চিন্তাপদ্ধতি গড়ে ওঠে। তাছাড়া জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে সে মানুষকে যে বাস্তব পথনির্দেশনা দিয়েছে তা শুধু যে, সর্বোচ্চ মানের যুক্তিগ্রাহ্য ও অত্যন্ত পবিত্র তাই নয়। বরং ১৪ শত বছর ধরে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন আনাচে কানাচে অসংখ্য মানুষ কার্যত তার অনুসরণ করছে। আর অভিজ্ঞতা তাকে সর্বোত্তম ব্যবস্থা বলে প্রমাণিত করেছে। এরূপ মর্যাদার মানব রচিত কোন গ্রন্থ কি দুনিয়ায় আছে কিংবা কোন সময় ছিল, যা এ গ্রন্থের মোকাবিলায় এনে দাঁড় করানো যেতে পারে?

চার ঃ এ গ্রন্থ পুরোটা একবারে লিখে দুনিয়ার সামনে পেশ করা হয়নি। বরং কতগুলো প্রাথমিক নির্দেশনা নিয়ে একটি সংস্কার আন্দোলন শুরু করা হয়েছিল। এরপর ২৩ বছর পর্যন্ত উক্ত আন্দোলন যেসব স্তর অতিক্রম করেছে তার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে ঐ আন্দোলনের নেতার মুখ দিয়ে এর বিভিন্ন অংশ কখনো দীর্ঘ ভাষণ এবং কখনো সংক্ষিপ্ত বাক্যের আকারে উচ্চারিত হয়েছে। অতপর এ কার্যক্রম পূর্ণতালাভের পর বিভিন্ন সময়ে মুখ থেকে উচ্চারিত এসব অংশ পূর্ণাংগ গ্রন্থের আকারে সাজিয়ে দুনিয়ার সামনে পেশ করা হয়েছে যাকে 'কুরআন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আন্দোলনের নেতার বক্তব্য হলো, এসব ভাষণ ও বাক্য তাঁর রচিত নয়, বরং তা বিশ্ব–জাহানের রবের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে নাযিল হয়েছে। কেউ যদি একে ঐ নেতার নিজের রচিত বলে অভিহিত করে, তাহলে সে দুনিয়ার গোটা ইতিহাস থেকে এমন একটি নজির পেশ করুক যে, কোন মানুষ বছরের পর বছর নিজে একাধারে একটি বড় সংঘবদ্ধ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে কখনো একজন বক্তা এবং কখনো একজন নৈতিক শিক্ষক হিসেবে, কখনো একটি মজলুম দলের নেতা হিসেবে, কখনো একটি রাষ্ট্রের শাসক হিসেবে, কখনো একটি যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে, কখনো একজন বিজয়ী হিসেবে, কখনো আইন ও বিধান দাতা হিসেবে মোটকথা অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ–পরিস্থিতি ও সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকে ভিন্ন ভিন্ন যেসব বক্তব্য পেশ করেছেন, কিংবা কথা বলেছেন, তা একত্রিত হয়ে একটি পূর্ণাংগ, সুসংবদ্ধ ও সর্বাত্মক চিন্তা ও কর্মপ্রণালীতে পরিণত হয়েছে এবং তার মধ্যে কোথাও কোন বৈপরীত্য পাওয়া যায় না, তার মধ্যে প্রথম

থেকে শেষ পর্যন্ত একটিই মাত্র কেন্দ্রীয় ধারণা ও চিন্তার ধারাবাহিকতা সক্রিয় দেখা যায়। প্রথম দিন থেকে তিনি তাঁর আন্দোলনের যে ভিত্তি বর্ণনা করেছিলেন শেষ দিন পর্যন্ত সে ভিত্তি অনুসারে আকীদা–বিশ্বাস ও কার্যাবলীর এমন একটি ব্যাপক ও সার্বজনীন আদর্শ নির্মাণ করেছেন যার প্রতিটি অংশ অন্যান্য অংশের সাথে পূর্ণরূপে সামঞ্জস্য রাখে এবং এ সংকলন অধ্যয়নকারী কোন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিই একথা উপলব্ধি না করে পারবে না যে আন্দোলনের সূচনাকালে আন্দোলনকারীর সামনে আন্দোলনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত গোটা অন্দোলনের পূর্ণাংগ চিত্র বর্তমান ছিল। এমন কখনো হয়নি মধ্য পথে কোন স্থানে তাঁর মাথায় এমন কোন ধারণার উদ্ভব হয়েছে যা পূর্বে তাঁর কাছে পরিষ্কার ছিল না অথবা যা পরে পরিবর্তন করতে হয়েছে। মস্তিষ্কের সৃষ্টিশীলতার এমন চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে সক্ষম হয়েছে এমন কোন মানুষ যদি কোন সময় জন্মগ্রহণ করে থাকে তাহলে তা দেখিয়ে দেয়া হোক।

পাঁচ ঃ যে নেতার মুখ থেকে এসব ভাষণ ও বাণীসমূহ উচ্চারিত হয়েছে, তিনি হঠাৎ কোন গোপন আস্তানা থেকে শুধু এগুলো শোনানোর জন্য বেরিয়ে আসতেন না এবং শোনাবার পর আবার কোথাও চলে যেতেন না। এ আন্দোলন শুরু করার পূর্বেও তিনি মানব সমাজে জীবন যাপন করেছিলেন এবং পরেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সবসময় ঐ সমাজেই থাকতেন। মানুষ তার আলোচনা ও বক্তব্যের ভাষা এবং বাচনভংগীর সাথে ভালভাবে পরিচিত ছিল। হাদীসসমূহ তার একটি বড় অংশ এখনও সংরক্ষিত আছে। পরবর্তী সময়ের আরবী ভাষাভিজ্ঞ মানুষ যা পড়ে সহজেই দেখতে পারেন যে, সেই নেতার বাচনভংগী কেমন ছিল। তাঁর স্বভাষী মানুষ সে সময়ও পরিষ্কার উপলব্ধি করতো এবং আরবী ভাষা জানা মানুষ আজও উপলব্ধি করে যে, এ গ্রন্থের (কুরআন) ভাষা ও বাকরীতি সেই নেতার ভাষা ও বাকরীতি থেকে অনেক ভিন্ন। এমন কি তাঁর ভাষণের মধ্যে যেখানে এ গ্রন্থের কোন বাক্যের উদ্ধৃতি আসে তখন উভয়ের ভাষার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পৃথিবীতে কোন মানুষ কি কখনো দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্টাইলে বছরের পর বছর কথা বলার ভান করতে সক্ষম হয়েছে বা হতে পারে অথচ দু'টিই যে, একই ব্যক্তির স্টাইল, সে রহস্য কখনো প্রকাশ পায় না? এ ধরনের ভান বা অভিনয় করে আকস্মিক বা সাময়িকভাবে সফল হওয়া সম্ভব। কিন্তু একাধারে ২৩ বছর পর্যন্ত এমনটি হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয় যে, এক ব্যক্তি যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা অহী হিসেবে কথা বলে তখন তার ভাষা ও স্টাইল এক রকম হবে আবার যখন নিজের পক্ষ থেকে কথা বলে বা বক্তৃতা করে তখন তার ভাষা ও স্টাইল সম্পূর্ণ আরেক রকম হবে।

ছয় ঃ এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দান কালে সেই নেতা বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। কখনো তিনি বছরের পর বছর স্বদেশবাসী ও স্বগোত্রীয় লোকদের উপহাস, অবজ্ঞা ও চরম জুলুম–নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, কখনো তাঁর সংগী–সাথীদের ওপর এমন জুলুম করা হয়েছে যে, তারা দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কখনো শত্রুরা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে, কখনো তাঁর নিজেকেই স্বদেশভূমি ছেড়ে হিজরত করতে হয়েছে। কখনো তাঁকে চরম দারিদ্রকষ্ট সইতে এবং ভুখা জীবন কাটাতে হয়েছে। কখনো তাঁকে একের পর এক লাড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং তাতে বিজয় ও পরাজয়

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۝٣٥ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ۝٣٦ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ۝٣٧

কোন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এরা কি নিজেরাই সৃষ্টি হয়েছে? না কি এরা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা? না কি পৃথিবী ও আসমানকে এরাই সৃষ্টি করেছে? প্রকৃত ব্যাপার হলো, তারা বিশ্বাস পোষণ করে না।[২৮]

তোমার রবের ভাণ্ডারসমূহ কি এদের অধিকারে? নাকি ঐ সবের ওপর তাদের কর্তৃত্ব চলে?[২৯]

উভয়টিই এসেছে। কখনো তিনি দুশমনদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছেন এবং যেসব দুশমন তাঁর ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল তাদেরকেই তাঁর সামনে অধোবদন হতে হয়েছে। কখনো তিনি এমন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করেছেন যা খুব কম লোকের ভাগ্যেই জুটে থাকে। একথা স্পষ্ট যে, এ ধরনের নানা পরিস্থিতিতে কোন মানুষের আবেগ অনুভূতি এক রকম থাকতে পারে না। এসব রকমারি ক্ষেত্র ও পরিস্থিতিতে সেই নেতা যখনই তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে কথা বলেছেন তখনই তাঁর মধ্যে স্বভাবসুলভ মানবোচিত আবেগ অনুভূতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে যা এরূপ ক্ষেত্র ও পরিস্থিতিতে একজন মানুষের মনে সচরাচর সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু এসব পরিস্থিতিতে তাঁর মুখ হতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা অহী হিসেবে যেসব কথা শোনা গিয়েছে তা ছিল মানবিক আবেগ–অনুভূতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কোন একটি ক্ষেত্রেও কোন কট্টর সমালোচকও অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলতে পারবে না যে, এখানে মানবিক আবেগ–অনুভূতির প্রভাব পড়েছে বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সাত ঃ এ গ্রন্থে যে ব্যাপক ও পূর্ণাংগ জ্ঞান পাওয়া যায় তা সে যুগের আরববাসী, রোমান, গ্রীক ও ইরানবাসীদের কাছে তো দূরের কথা এ বিংশ শতাব্দীর বড় বড় পণ্ডিতদেরও কারো ঝুলিতে নেই। বর্তমানে অবস্থা এই যে, দর্শন, বিজ্ঞান এবং সমাজ বিদ্যার কোন একটি শাখার অধ্যয়নে গোটা জীবন কাটিয়ে দেয়ার পরই কেবল কোন ব্যক্তি জ্ঞানের সেই শাখার সর্বশেষ সমস্যাবলী জানতে পারে। তারপর যখন গভীর দৃষ্টি নিয়ে সে কুরআন অধ্যয়ন করে তখন জানতে পারে যে, এ গ্রন্থে সেসব সমস্যার একটি সুস্পষ্ট জবাব বিদ্যমান। এ অবস্থা জ্ঞানের কোন একটি শাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং যেসব জ্ঞান বিশ্ব–জাহান ও মানুষের সাথে কোনভাবে সম্পর্কিত তার সবগুলোর ক্ষেত্রেই সঠিক। কি করে বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, ১৪ শত বছর পূর্বে আরব–মরুর এক নিরক্ষর ব্যক্তি জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় এমন ব্যাপক দক্ষ ছিল এবং তিনি প্রতিটি মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করে সেগুলোর একটি পরিষ্কার ও চূড়ান্ত জওয়াব খুঁজে পেয়েছিলেন?

কুরআনের মু'জিযা হওয়ার যদিও আরো অনেক কারণ আছে। তবে কেউ যদি শুধু এ কয়টি কারণ নিয়ে চিন্তা করে তাহলে সে জানতে পারবে কুরআন নাযিল হওয়ার যুগে

কুরআনের মু'জিয়া হওয়া যতটা স্পষ্ট ছিল আজ তার চেয়ে অনেক গুণে বেশী স্পষ্ট এবং ইনশায়াল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত স্পষ্টতর হতে থাকবে।

২৮. ইতিপূর্বে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিলো তার উদ্দেশ্য ছিল মক্কার কাফেরদের বুঝানো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের দাবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য তারা যেসব কথা বলছে তা কতটা অযৌক্তিক। এ আয়াতে তাদের সামনে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দাওয়াত পেশ করছেন তার মধ্যে এমন কি আছে যে জন্য তোমরা ক্রোধান্বিত হচ্ছো? তিনি তো একথাই বলছেন যে, আল্লাহ তোমাদের স্রষ্টা এবং তোমাদের উচিত তাঁরই বন্দেগী করা। এতে তোমাদের ক্রোধান্বিত হওয়ার যুক্তিসংগত কি কারণ থাকতে পারে? তোমরা কি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছো, কোন স্রষ্টা তোমাদের সৃষ্টি করেননি? নাকি তোমরা নিজেরাই নিজেদের স্রষ্টা? কিংবা এ বিশাল মহাবিশ্ব তোমাদের তৈরী? এসব কথার কোনটিই যদি সত্য না হয়, আর তোমরা নিজেরাই স্বীকার করো যে তোমাদের স্রষ্টা আল্লাহ আর এই বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টাও তিনিই, তাহলে যে ব্যক্তি তোমাদের বলে, সেই আল্লাহই তোমাদের বন্দেগী ও উপাসনা পাওয়ার অধিকারী সেই ব্যক্তির প্রতি তোমরা এত ক্রোধান্বিত কেন? আসলে ক্রোধোদ্দীপক ব্যাপার তো যে স্রষ্টা নয় তার বন্দেগী করা এবং যিনি স্রষ্টা তার বন্দেগী না করা। তোমরা মুখে একথা অবশ্যই স্বীকার করো যে, বিশ্ব-জাহান ও তোমাদের স্রষ্টা আল্লাহ। কিন্তু সত্যিই যদি একথায় বিশ্বাস থাকতো তাহলে তাঁর বন্দেগীর প্রতি আহবানকারীর পেছনে এভাবে আদাপানি খেয়ে লাগতে না।

এটা ছিল এমন একটি তীক্ষ্ণ ছুঁচালো প্রশ্ন যা মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিমূলকেই কাঁপিয়ে দিয়েছে। বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসে আছে, বদর যুদ্ধের পর বন্দী কুরাইশদের মুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে জুবাইর ইবনে মুতয়িম মদীনায় আসে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিবের নামাযে ইমামতি করছিলেন। নামাযে তিনি সূরা তূর পড়ছিলেন। তার নিজের বর্ণনা হচ্ছে, নবী (সা) যখন সূরার এ আয়াত পড়ছিলেন তখন মনে হলো, আমার কলিজাটা বুঝি বক্ষ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সেদিন এ আয়াত শুনে তার মনে ইসলাম বদ্ধমূল হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এটি তার ইসলাম গ্রহণ করার একটি বড় কারণ হয়েছিল।

২৯. মক্কার কাফেরদের প্রশ্ন ছিল, শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই কেন রসূল বানানো হলো? এটি তাদের সে প্রশ্নের জবাব। এ জবাবের তাৎপর্য হচ্ছে, এসব লোককে গায়রুল্লাহর ইবাদাতের গোমরাহী থেকে মুক্ত করার জন্য কাউকে না কাউকে তো রসূল বানিয়ে পাঠাতেই হতো। এখন প্রশ্ন হলো, সে সিদ্ধান্ত কে গ্রহণ করবেন? আল্লাহ কাকে তাঁর রসূল মনোনীত করবেন আর কাকে করবেন না সে সিদ্ধান্ত কে গ্রহণ করবে? এরা যদি আল্লাহর মনোনীত রসূলকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে থাকে তাহলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, হয় তারা নিজেদেরকে আল্লাহর রাজ্যের মালিক মনে করে নিয়েছে। নয়তো তারা ধারণা করে বসে আছে যে, বিশ্ব জাহানের মালিক মনিব তো আল্লাহ তা'আলাই থাকবেন, তবে সেখানে বাস্তব কর্তৃত্ব চলবে তাদের।

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾

তাদের কাছে কি কোন সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা উর্ধজগতের কথা শুনে নেয়? এদের মধ্যে যে শুনেছে সে পেশ করুক কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহর জন্য কি কেবল কন্যা সন্তান আর তোমাদের জন্য যত পুত্র সন্তান?[৩০]

তুমি কি তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবী করছো যে, তাদের ওপর জোরপূর্বক চাপানো জরিমানার বোঝার নীচে তারা নিষ্পেষিত হচ্ছে?[৩১]

তাদের কাছে কি অদৃশ্য সত্যসমূহের জ্ঞান আছে যার ভিত্তিতে তারা লিখছে?[৩২]

তারা কি কোন চক্রান্ত আঁটতে চাচ্ছে?[৩৩] *(যদি তাই হয়) তাহলে কাফেররাই উল্টো নিজেদের ষড়যন্ত্রের জালে আটকা পড়বে।*[৩৪]

আল্লাহ ছাড়া কি তাদের আর কোন ইলাহ আছে? যে শির্ক তারা করছে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।[৩৫]

৩০. এ সংক্ষিপ্ত বাক্যসমূহে একটা বিরাট যুক্তি-তর্ক তুলে ধরা হয়েছে। এর বিস্তারিত রূপ হলো, তোমরা যদি রসূলের কথা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাও তাহলে সত্যকে জানার জন্য তোমাদের কাছে কি উপায় ও মাধ্যম আছে? তোমাদের কেউ কি উর্ধজগতে আরোহণ করে আল্লাহ তা'আলা কিংবা তাঁর ফেরেশতাদের নিকট থেকে সরাসরি একথা জেনে নিয়েছে যে, যেসব আকীদা-বিশ্বাসের ওপর তোমাদের বাতিল ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত তা পুরোপুরি বাস্তব সম্মত ও সত্য? কেউ যদি এ দাবী করতে চায় তাহলে সে সামনে আসুক এবং বলুক, সে কবে কিভাবে উর্ধজগতে আরোহণের অধিকার লাভ করেছে এবং সেখান থেকে কি জ্ঞান সে নিয়ে এসেছে? কিন্তু এটা যদি তোমাদের দাবী না হয়, তাহলে নিজেরাই ভেবে দেখো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর সন্তান আছে বলে তোমরা যে দাবী করছো তাও আবার কন্যা সন্তান—যাকে নিজের জন্য তোমরা লজ্জা ও অপমানের কারণ বলে মনে করো—এর চেয়ে অধিক হাস্যকর ধারণা আর কিছু হতে পারে কি? প্রকৃত জ্ঞান ছাড়াই তোমরা এ ধরনের স্পষ্ট মূর্খতার অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছো, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সামনে জ্ঞানের আলো পেশ করছে, তোমরা তার প্রাণের দুশমন হয়ে দাঁড়াচ্ছো।

৩১. প্রশ্নের মূল লক্ষ কাফেররা। অর্থাৎ তোমাদের কাছে রসূলের যদি কোন স্বার্থ থাকতো এবং নিজের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তিনি এসব তৎপরতা দেখাতেন তাহলে তাঁর নিকট থেকে সরে যাওয়ার একটা যুক্তিসংগত কারণ অন্তত তোমাদের থাকতো। কিন্তু তোমরা জান এ আন্দোলনের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নিস্বার্থ, শুধু তোমাদের কল্যাণের জন্যই তিনি জীবনপাত করছেন। এরপরও ধির স্থির মন–মেজাজ নিয়ে তাঁর কথা শোনার মত উদারতা তোমাদের না থাকার কি কারণ থাকতে পারে? এ প্রশ্নের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সমালোচনাও বিদ্যমান। সারা দুনিয়ার ভণ্ড ধর্মগুরুরা এবং ধর্মীয় আস্তানার সেবকদের মত আরবেও মুশরিকদের ধর্মীয় নেতা এবং পণ্ডিত পুরোহিতরা খোলাখুলি ধর্মীয় কারবার চালিয়ে যাচ্ছিল। তাই তাদের সামনে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, একদিকে আছে এসব ধর্ম ব্যবসায়ীরা যারা তোমাদের নিকট থেকে প্রকাশ্যে নজর–নিয়াজ এবং প্রতিটি ধর্মীয় কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য পারিশ্রমিক আদায় করছে। অপরদিকে এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিস্বার্থভাবে, বরং নিজের ব্যবসায়–বাণিজ্য ধ্বংস করে অত্যন্ত যুক্তিসংগত প্রমাণ দিয়ে তোমাদেরকে দীনের সোজা পথ দেখানোর চেষ্টা করছে অথচ তোমরা তার নিকট থেকে সরে যাচ্ছো এবং তাদের দিকে দৌড়ে অগ্রসর হচ্ছো এটা চরম নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কি?

৩২. অর্থাৎ রসূল তোমাদের সামনে যেসব সত্য পেশ করছেন তা মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য তোমাদের কাছে এমন কি প্রমাণ আছে যা পেশ করে দাবী করতে পারো দৃশ্যমান বস্তু ছাড়া চোখের আড়ালে যেসব সত্য লুকিয়ে আছে তোমরা সরাসরি তা জানো? তোমরা কি সত্যিই জানো যে, আল্লাহ এক নন এবং তোমরা যাদেরকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছো তারাও আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতা–ইখতিয়ারের অধিকারী? তোমরা কি সত্যিই ফেরেশতাদের দেখেছো; তারা যে মেয়ে তা জানতে পেরেছো এবং নাউযুবিল্লাহ আল্লাহর ঔরসেই তারা জন্ম নিয়েছে, তোমরা কি সত্যিই জানো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোন অহী আসেনি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বান্দার কাছে তা আসতেও পারে না? তোমরা কি সত্যিই একথা জানতে পেরেছো যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না, মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন হবে না, আখেরাত কায়েম হবে না যেখানে মানুষের হিসেব–নিকেশ করে তাকে শাস্তি ও পুরস্কার দেয়া হবে? তোমরা এ ধরনের কোন জ্ঞানের দাবী করলে একথা লিখে দিতে কি প্রস্তুত আছ যে, তোমরা এ সম্পর্কে রসূলের পেশকৃত বর্ণনা ও তথ্য যে অস্বীকার করছো তার কারণ হলো পরদার পেছনে উঁকি দিয়ে তোমরা দেখে নিয়েছো, রসূল যা বলছেন তা বাস্তব ও সত্য নয়। এখানে কেউ একথা বলে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন যে, এ জবাবে ঐ সব মানুষ যদি হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে তা লিখে দেয় তাহলে কি এসব যুক্তি অর্থহীন হয়ে পড়ে না? কিন্তু এরূপ সন্দেহ করা ভুল। কারণ, হঠকারিতা করে যদি তা লিখেও দেয় তাহলেও যে সমাজে জন সমক্ষে এ চ্যালেঞ্জ পেশ করা হয়েছিল সেখানে সাধারণ মানুষ অন্ধ ছিল না। প্রত্যেকেই জানতে পারতো, একথা নিছক হঠকারিতা করেই লিখে দেয়া হয়েছে এবং রসূলের বর্ণনাসমূহ এ জন্য অস্বীকার করা হচ্ছে না যে, তার অসত্য ও বাস্তবতা বিরোধী হওয়া সম্পর্কে কেউ প্রত্যক্ষ ও নির্ভুল জ্ঞান লাভ করেছে।

৩৩. মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়া ও তাঁকে হত্যা করার জন্য একত্রে বসে যে সলাপরামর্শ করতো ও ষড়যন্ত্র পাকাতো এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে।

وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾ فَذَرْهُمْ
حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ
كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٤٩﴾

এরা যদি আসমানের একটি অংশ পতিত হতে দেখে তাহলেও বলবে, এ তো ধাবমান মেঘরাশি।[৩৬] অতএব, হে নবী, তাদেরকে আপন অবস্থায় থাকতে দাও। যাতে তারা সে দিনটির সাক্ষাত পায় যেদিন তাদেরকে মেরে ভূপাতিত করা হবে। সেদিন না তাদের কোন চালাকি কাজে আসবে, না কেউ তাদেরকে সাহায্য করতে এগুবে। আর সেদিনটি আসার আগেও জালেমদের জন্য একটা আযাব আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।[৩৭]

হে নবী ! তোমার রবের ফায়সালা আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করো।[৩৮] তুমি আমার চোখে চোখেই আছ।[৩৯] তুমি যখন উঠবে তখন তোমার রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করো[৪০] তাছাড়া রাত্রিকালেও তার তাসবীহ পাঠ করো।[৪১] আর তারকারাজি যখন অস্তমিত হয় সে সময়ও।[৪২]

৩৪. এটি কুরআনের সুস্পষ্ট ভবিষ্যতবাণীসমূহের একটি। মক্কী যুগের প্রথম দিকে যখন মুষ্টিমেয় সহায় সম্বলহীন মুসলমান ছাড়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাহ্যত আর কোন শক্তি ছিল না। গোটা জাতিই তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল এবং প্রত্যেকেই ইসলাম ও কুফরী শক্তির নিতান্তই অসম মোকাবিলা প্রত্যক্ষ করছিল। কেউ–ই সে সময় ভাবতে পারেনি যে, কয়েক বছর পরই এখানে কুফরী শক্তির মূলোৎপাটিত হতে যাচ্ছে। স্থূল দৃষ্টির অধিকারীরা দেখতে পাচ্ছিলো, কুরাইশ ও গোটা আরবের বিরোধিতা শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলনকে উৎখাত করে ছাড়বে। এ পরিস্থিতিতেও কাফেরদেরকে চূড়ান্ত ও পরিষ্কার ভাষায় চ্যালেঞ্জ করে বলে দেয়া হয়েছে যে, এ আন্দোলনকে হেয় করার জন্য যত অপকৌশল ও ষড়যন্ত্র তোমরা করতে চাও তা করে দেখো। ঐ ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল উল্টো তোমাদের বিরুদ্ধেই যাবে। তোমরা কখনো এ আন্দোলনকে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে না।

৩৫. প্রকৃত ব্যাপার হলো, যাদেরকে তারা ইলাহ বানিয়ে রেখেছে প্রকৃতপক্ষে তারা ইলাহ নয় এবং শিরক আগাগোড়া একটি ভিত্তিহীন জিনিস। তাই যে ব্যক্তি তাওহীদের

আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর সাথে আছে সত্যের শক্তি। আর যারা শির্কের সহযোগিতা করছে, তারা একটি অবাস্তব ও অসত্য জিনিসের জন্য লড়াই করছে। এ লড়াইয়ে শির্ক কি করে বিজয় লাভ করবে?

৩৬. একথার উদ্দেশ্য এক দিকে কুরাইশ নেতাদের হঠকারিতার মুখোস খুলে দেয়া, অন্যদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সংগী–সাথীদের সান্ত্বনা দেয়া। নবী (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের মনে বারবার এ আকাংখা জাগতো যে, এসব লোককে আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোন মু'জিযা দেখানো হোক যার দ্বারা মুহাম্মাদের (সা) নবুওয়াতের সত্য বুঝতে পারবে। তাই বলা হয়েছে, এরা যদি নিজ চোখে কোন মু'জিযাও দেখে তবুও তার কোন না কোন অপব্যাখ্যা করে কুফরীর ওপর অবিচল থাকার অজুহাত খুঁজে নেবে। কারণ, তাদের মন ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত নয়। কুরআন মজীদের আরো কয়েকটি স্থানেও তাদের এ হঠকারিতার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা আনআমে বলা হয়েছে, আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাও পাঠাতাম, মৃত ব্যক্তিরা এদের সাথে কথা বলতো এবং এদের চোখের সামনে সারা দুনিয়ার সবকিছু এনে জড়ো করে দিতাম তবুও এরা ঈমান আনতো না। (আয়াত ১১) সূরা হিজরে বলা হয়েছে, আমি যদি তাদের জন্য আসমানের কোন দরজা খুলেও দিতাম আর এরা প্রকাশ্য দিবালোকে সে দিকে উঠতে থাকতো তারপরও একথাই বলতো, আমাদের চোখ প্রতারিত হচ্ছে, আমাদেরকে যাদু করা হয়েছে। (আয়াত ১৫)

৩৭. এটি সূরা আস সাজ্দার ২১ আয়াতের বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি। সেখানে বলা হয়েছে "সেই বড় আযাবের পূর্বে আমি দুনিয়াতেই তাদেরকে কোন না কোন ছোট আযাবের স্বাদ ভোগ করাতে থাকবো। হয়তো এরা তাদের বিদ্রোহাত্মক আচরণ থেকে বিরত হবে।" অর্থাৎ দুনিয়াতে মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত ও জাতিগত পর্যায়ে আযাব নাযিল করে আমি তাদের একথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবো যে, ওপরে কোন এক উচ্চতর শক্তি তাদের ভাগ্যের ফায়সালা করছে। তাঁর ফায়সালা পরিবর্তন করার শক্তি কেউ রাখে না। তবে যারা জাহেলিয়াতের মধ্যে ডুবে আছে তারা এ ঘটনাবলী থেকে পূর্বেও কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি এবং ভবিষ্যতেও কখনো করবে না। দুনিয়াতে যেসব বিপর্যয় আসে তারা তার অর্থ বুঝে না। তাই তারা এসব বিপর্যয়ের এমন এমন সব ব্যাখ্যা করে যা তাদেরকে সত্য উপলব্ধি করা থেকে আরো দূরে নিয়ে যায়। নিজেদের নাস্তিকতা বা শির্কের ত্রুটি ধরা পড়ে তাদের মেধা ও মস্তিষ্ক এমন ব্যাখ্যার দিকে কখনো আকৃষ্ট হয় না। একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এ বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

ان المنافق اذا مرض ثم اعفى كان كالبعير عقله اهله ثم ارسلوه

فلم يدر لم عقلوه ولم يدر لم ارسلوه (ابو داؤد ، كتاب الجنائز)

"মুনাফিক যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পরে যখন সুস্থ হয়ে যায় তখন তার অবস্থা হয় সেই উটের মত যাকে-তার মালিক বেঁধে রাখলো কিন্তু সে বুঝলো না তাকে কেন বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং তারপর আবার যখন খুলে দিল তখনও সে কিছু বুঝলো না তাকে কেন ছেড়ে দেয়া হলো।" (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আম্বিয়া, টীকা ৪৫; আন নাম্‌ল, টীকা ৬৬; আল আনকাবূত, টীকা ৭২ ও ৭৩)।

৩৮. আরেকটি অর্থ হতে পারে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে আপন প্রভুর নির্দেশ পালন করতে বদ্ধপরিকর থাকো।

৩৯. অর্থাৎ আমি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করছি। তোমাদেরকে তোমাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেইনি।

৪০. একথাটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং এখানে সবগুলো অর্থ গ্রহণীয় হওয়া অসম্ভব নয়।

একটি অর্থ হচ্ছে, তুমি যখনই কোন মজলিস থেকে উঠবে আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ করে উঠবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এ নির্দেশ পালন করতেন এবং মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তারা যেন কোন মজলিস থেকে উঠার সময় আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ করে। এভাবে সেই মজলিসে যেসব কথাবার্তা হয়েছে তার কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী এবং হাকেম হযরত আবু হুরাইরার (রা) মাধ্যমে নবীর (সা) এ বাণী উদ্ধৃত করেছেন, যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসলো এবং সেখানে অনেক বাকবিতণ্ডা করলো সে যদি উঠে যাওয়ার সময় বলে ঃ

سبحانك اللهم وبحمدك ، اشهد ان لا اله الا انت ، استغفرك واتوب اليك –

"হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসাসহ তাসবীহ করছি। আমি সাক্ষ দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তোমার কাছে তাওবা করছি।"

তাহলে সেখানে যেসব ভুল-ক্রটি হবে আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন।

এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, যখন তোমরা ঘুম থেকে জেগে বিছানা ছাড়বে তখন তাসবীহসহ তোমার রবের প্রশংসা করো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিও নিজে আমল করতেন এবং ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর একথাগুলো বলার জন্য সাহাবীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন ঃ

لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله – (مسند احمد ، بخارىٔ بروايت عباده بن الصامت)

এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, তোমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে তখন আল্লাহর হামদ ও তাসবীহ দ্বারা তার সূচনা করো। এ হুকুম পালনের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকবীর তাহরীমার পর নামায শুরু করবে একথা বলে ঃ

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

এর চতুর্থ অর্থ হচ্ছে, যখন তোমরা আল্লাহর পথে আহবান জানানোর জন্য প্রস্তুত হবে তখন আল্লাহর প্রশংসা ও তাসবীহ দ্বারা তার সূচনা করো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নির্দেশটিও স্থায়ীভাবে পালন করতেন। তিনি সবসময় আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা তার খুতবা শুরু করতেন।

তাফসীর বিশারদ ইবনে জারীর এর আরো একটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। সে অর্থটি হচ্ছে, তোমরা যখন দুপুরের আরামের পর উঠবে তখন নামায পড়বে। অর্থাৎ যোহরের নামায।

৪১. এর অর্থ মাগরিব, ইশা এবং তাহাজ্জুদের নামায। সাথে সাথে এর দ্বারা কুরআন তিলাওয়াত এবং আল্লাহর যিকরও বুঝানো হয়েছে।

৪২. তারকারাজির অস্তমিত হওয়ার অর্থ রাতের শেষভাগে এগুলোর অস্তমিত হওয়া এবং ভোরের আলো দেখা দেয়ায় তার আলো নিষ্প্রভ হয়ে যাওয়া। এটা ফজরের নামাযের সময়।